ভূতের গল্পের বই

BanglaBook.org

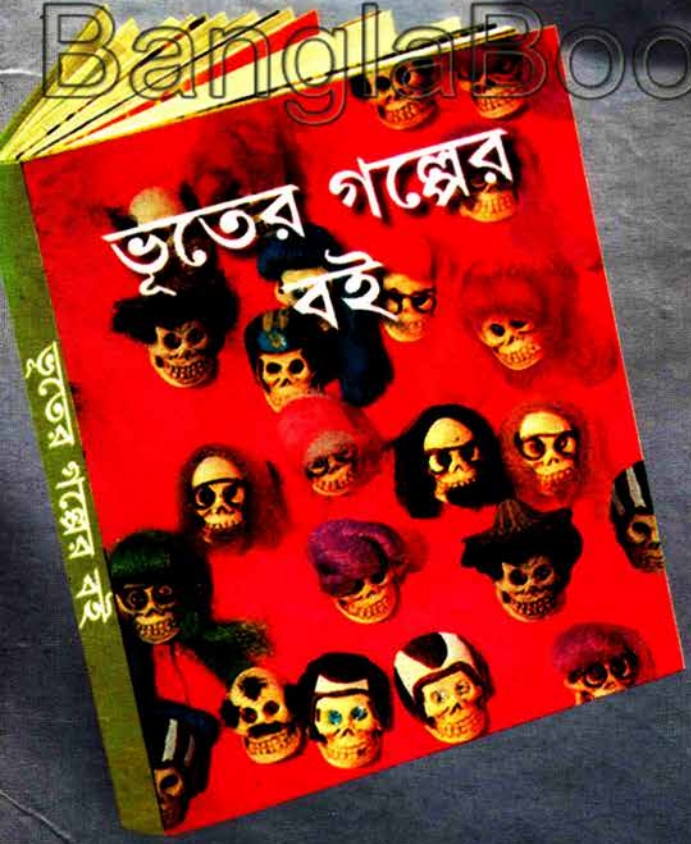

ভূতের গল্পের বই

সম্পাদনা : আহমাদ মাযহার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একমাত্র পরিবেশক
সময় প্রকাশন

অধুনা ১৬
প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ১৯৯৯

প্রকাশক
নূরুন নাহার
অধুনা প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স
নয়াবাজার ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ

মূল্য : ১২০.০০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গল্পের সূচি

পিঠে পার্বণে চীনে ভূত/
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৯
মণিহারা/
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬
ভূতের গল্প/
প্রমথ চৌধুরী ২৭
মহেশের মহাযাত্রা/
পরশুরাম ৩১
ভূতের রাজা/
হেমেন্দ্রকুমার রায় ৪০/
গঙ্গাধরের বিপদ/
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭
ভূতের গল্প/
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫১
ভুলোর ছলনা/
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭
কামিনী/
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬
অবর্তমান/
বনফুল ৭১
বউমা/
মনোজ বসু ৭৭
বন্ধু/
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৮১
মাঝরাতের কল/
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৮৭
দুই বন্ধু/
বুদ্ধদেব বসু ৯২
ছবির ভূত/
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪
চেতলার কাছে/
লীলা মজুমদার ১১০
আয়না/
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১১৪
ভূত মানে ভূত/
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১২১
ভূতো/
সত্যজিৎ রায় ১২৪
শতাব্দীর ওপার/
সমরেশ বসু ১৩৩
ছক্কা মিয়ার টমটম/
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৪৪
পানিমুড়ার কবলে/
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৫১
টেলিফোনে/
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৫৭
দেখতে মানা ভূতের ছানা/
শওকত আলী ১৬১
ভূতে বিশ্বাস নেই/
হাসান আজিজুল হক ১৬৪
চোর তাড়াতে ভূত/
শেখর বসু ১৬৭
এক্কা গাড়ি ও লক্ষ্মীছায়া/
বুলবুল চৌধুরী ১৭১
ভয়/
হুমায়ূন আহমেদ ১৭৬
নিশাচরের বাড়ি/
শাহরিয়ার কবির ১৮৯
রহমত চাচার এক রাত/
মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৯৬
কমলা রঙের ভূত/
ইমদাদুল হক মিলন ২০২
ভূতের থাকা না-থাকা/
মঈনুল আহসান সাবের ২০৬

ভূমিকা

আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতার যুগে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা নিশ্চয়ই হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূতের অস্তিত্ব আমরা নানাভাবে অনুভব করি। মানুষের মনে ভূতের অস্তিত্ব আছে বলেই মন নিয়ে যাদের কারবার তারা কখনো কখনো ভূতকে সাহিত্যের উপজীব্য করেন; তারই ফলে সৃষ্টি হয় ভূতের গল্প বা ভূত বিষয়ের গল্প। ভূত হচ্ছে কল্পনা জগতের বাস্তব। কল্পনার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। তাই বিজ্ঞান-চেতনার যুগেও সাহিত্যে ভূত অস্তিত্বশীল। সুতরাং বিজ্ঞান চেতনার যুগে এই সংকলনভুক্ত গল্পগুলো অবলম্বনে সাহিত্যে এই অসত্য বিষয়টির অনুপ্রবেশের উৎস নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখা উচিত।

মানুষের জীবন-বাস্তবতার স্তর আসলে দুটি। একটি জীবনের বহির্জগতের বাস্তব যা চর্মচক্ষে দেখা যায়, অর্থাৎ ব্যাখ্যেয়; অন্যটি কল্পনা জগতের বাস্তব যার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব নেই; অর্থাৎ অব্যাখ্যেয়। ভূতের অস্তিত্ব রয়েছে দ্বিতীয় স্তরে। শাদাচোখে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তাতে ভূতের অস্তিত্ব নেই। শাদা চোখে এমন অনেক দৃশ্য দেখি যা মনে হয় সত্য কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যায় যে যা আমরা শাদাচোখে দেখছি তা আসলে ঘটছে না, ঘটছে অন্য কিছু, আর তা ঘটছে চোখের আড়ালে। এই চোখের আড়ালের জগতই ভূতের জগত অর্থাৎ অব্যাখ্যেয় জগত। ব্যাখ্যা জানা হয়ে গেলেই ভূত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ সব সময় চায় আড়ালের ঘটনাকে উন্মোচন করতে। তাই বিজ্ঞানমনস্কতার বিজয় দেখানো আধুনিক ভূতের গল্পের একটা জনপ্রিয় সূত্র। বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ছবির* ভূত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূত *মানে* ভূত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *পানিমুড়ার কবলে,* হাসান আজিজুল হকের ভূতে *বিশ্বাস নেই,* মঈনুল আহসান সাবেরের ভূতের *থাকা না থাকা* এই সূত্রেরই গল্প।

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ভূতে বিশ্বাস করতে পারে না, করে না। কিন্তু তারাও ভূতের ভয় পায়। ভূতের গল্পের এ-ও এক জনপ্রিয় সূত্র। প্রমথ চৌধুরীর ভূতের *গল্প* এই রকম একটি গল্প। বাংলায় এই সূত্রের গল্পের নমুনাও দুর্নিরীক্ষ নয়। হুমায়ূন আহমেদের ভয়ও এই সূত্রেরই গল্প।

ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনোরকম সংশয় প্রকাশ না-করে রচিত হয় একধরনের ভূতের গল্প। অনেক সময় গা-শিরশিরে বর্ণনা থাকে এইসব গল্পে। কোথাও কারো অপঘাতে মৃত্যু হলে মৃত মানুষের অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারে বা কোনো নির্জন স্থানে সেই অতৃপ্ত অশরীরী আত্মা এসে হাজির হয় তার জীবৎকালের অতৃপ্তি চরিতার্থ করতে। ভূতের গল্পের এটা একটা জনপ্রিয় সূত্র। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের *পিঠে পার্বনে চীনে* ভূত অনেকটা এই সূত্রের গল্প। কিছু কিছু ভূতের গল্পের প্রিয় উপজীব্য হচ্ছে পড়োবাড়ির রহস্যময় ঘটনা। সামন্ত যুগের শেষের দিকে এই ধরনের গল্প বেশি লেখা হয়েছে বাংলায়। অত্যাচারী জমিদারদের ধ্বংসের পরও তাদের অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পড়ো বাড়ির অত্যাচারিতদের আর্তনাদ শোনা যায়। সমরেশ বসুর *বহুযুগের ওপার হতে* এবং শাহরিয়ার কবিরের *নিশাচরের বাড়ি* গল্পকে এই ধারার গল্প বলে চিহ্নিত করা যায়।

কখনো কখনো এ-ধরনের গল্পে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মৃত মানুষকে তাদের অতৃপ্তি মোচন করতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ প্রেমেন্দ্র মিত্রের *মাঝরাতের কল* গল্পটির কথাই ধরা যাক। মধ্যরাতে অন্ধকার পথে ডাক্তারের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে সেখান থেকে এক কল-এ যেতে হল ডাক্তারকে। রোগীর শেষ আকাঙ্ক্ষা শোনার পর ডাক্তার রোগীর নাড়ি দেখতে গিয়ে টের পেলেন রোগীর মৃত্যু ঘটেছে অনেক আগে। ভীত ডাক্তারের আকস্মিকভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া গাড়িটি আকস্মিকভাবেই ঠিক হয়ে গেল এবং ডাক্তার নিরাপদে ফিরে এলেন। পরদিন দিনের বেলায় রোগীর বাড়ি গিয়ে রোগীর অন্তিম ইচ্ছে মতো কার্যাদি সম্পাদন করার ব্যবস্থা নিলেন তিনি। বুলবুল চৌধুরীর *এক্কাগাড়ি ও লক্ষ্মীছায়াও* এই সূত্রেরই ভূতের গল্প।

এক ধরনের গল্প আছে যাকে ঠিক প্রচলিত অর্থে ভূতের গল্প বলা যায় না। গল্পের ঘটনাবলিকে বড়জোর ভূতুড়ে বলতে পারি আমরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মণিহারা*, বুদ্ধদেব বসুর *দুই বন্ধু*, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের *আয়না* এই ধারার গল্প। অনেক সময় মানুষের চেতনার জগতে লোভ-লালসা বা ঈর্ষা অস্বাভাবিক বেশি হয়ে ওঠে। যে-সব বোধের দ্বারা এইসব বোধের ভারসাম্য রক্ষিত হয় কখনো কখনো কারো কারো মধ্যে সে-সব বোধের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এর ফলেই অস্বাভাবিকতা মানবিক স্তরকে অতিক্রম করে যায়। শক্তিমান কথাসাহিত্যিকেরা এই অতিমানবিক ব্যাপারগুলোকে চমকপ্রদভাবে ফুটিয়ে তোলার সময় যে আবহ সৃষ্টি করেন তাকে অনায়াসে ভূতুড়ে বলা চলে।

গল্পের মজার খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে ভূত আছে এবং ভূতেরাই অনেক অদ্ভুত ঘটনার কলকাঠি নাড়ে; ভূতের গল্পের এও এক জনপ্রিয় সূত্র। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের *ভূতের রাজা*, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গঙ্গাধরের বিপদ*, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *ছক্কামিয়ার টমটম*, বনফুলের *অবর্তমান*, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কামিনী*, মুহম্মদ জাফর ইকবালের *রহমত চাচার একরাত*, শেখর বসুর *চোর তাড়াতে* ভূত গল্পগুলো এইসব অনুষঙ্গ নিয়েই লেখা।

পরিবেশের প্রভাব পড়ে মানুষের মনে। মানুষের মনে স্বর্গচেতনের গভীরের আকাঙ্ক্ষা, পাপ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা মানুষকে আত্মবিস্মৃত করে। এই আত্মবিস্মৃতিও এক ধরনের ভূত। তারাশঙ্করের *ভুলোর ছলনা* এই অর্থে ভূতের গল্প।

বহুকাল আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনরুজ্জীবন দেখানো হয় এক ধরনের ভূতের গল্পে। মনোজ বসুর *বউমা*, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর *বন্ধু* সমরেশ বসুর *শতাব্দীর ওপার হতে* এই ধরনের গল্প।

BanglaBook.org

ফ্যান্টাসি শিশুদের জগৎ। ভূতও আসলে ফ্যান্টাসির জগতেরই বাশিন্দা। ভূতকে নিয়ে ফ্যান্টাসি সৃষ্টি করাও ভূতের গল্পের একটা সূত্র। শওকত আলীর *দেখতে মানা ভূতের ছানা*, ইমদাদুল হক মিলনের *কমলা রঙের ভূত* এই সূত্রের গল্প।

পরশুরামের *মহেশের মহাযাত্রা*, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *ভূতের গল্প*, সত্যজিৎ রায়ের *ভূতো* গল্পকে ঠিক সূত্রে মেলানো যায় না। পরশুরামের গল্প হিউমারে, ধুর্জটি প্রসাদের গল্প কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধির দীপ্তিতে, সত্যজিৎ রায়ের গল্প সংহত ভাষ্যে ও কল্পনাশক্তিতে অসামান্য।

ভূতের গল্পের বই সম্পাদনা করতে গিয়ে উপলব্ধ হয়েছে যে বাংলাদেশের লেখকেরা ভূতের গল্প লেখার দিকে তেমন একটা মনোনিবেশ করেন নি। এমনকি শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়েও নয়। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত ষাটের দশকে শিশুসাহিত্যিকদের প্রবল একটা অংশ সুস্পষ্টভাবে ভূতের গল্প লেখা প্রগতি-বিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করেছিলেন, দ্বিতীয়ত ভূতের গল্পের আবহ সৃষ্টি হয় যে-সব শব্দানুষঙ্গে তা মূলত হিন্দুধর্মীয় সাংস্কৃতিক আবহ থেকে আসে। সাম্প্রদায়িকতার বিস্তৃতির ফলে বিপুলভাবে হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণে এই আবহ এখন আমাদের সমাজ থেকে বিদূরিতপ্রায়। ফলে ভূতের গল্পের স্বতঃস্ফূর্ততা নির্বাসিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবশ্য ভূতের গল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই একাধিক সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে এই জাতের। কারণ শিশুদের কল্পনাজগতের সঙ্গেই আছে ভূতেদের উপস্থিতি। ভূতের গল্প পাঠ করলেই একটা শিশুর বিজ্ঞান-মনস্কতা চলে যাবে—এই আশঙ্কা নেই। স্বাভাবিক হারে ভূতের গল্প পাঠ করতে করতেই শিশু-কিশোররা অনুভব করতে পারবে ভূতের অস্তিত্বহীনতার কথা। বিজ্ঞানমনস্কতার নামে কল্পনাশক্তিকে রুদ্ধ করে দেয়ার কোনো মানে নেই। বরং ভূতের গল্প, রূপকথার গল্প পড়ে পড়েই শিশুদের মনে মানবিকতা ও কল্পনাপ্রতিভার জাগৃতি ঘটে থাকে।

ভূতের গল্প মানেই ভয়ের গল্প এমন বিবেচনা করে এই সংকলনের গল্প নির্বাচিত হয় নি; চেষ্টা করা হয়েছে গল্পে ভূতের উপস্থিতির বৈচিত্র্যকে ধরতে। সংকলনভুক্ত গল্পগুলো পাঠকদের পরিতৃপ্তির কারণ ঘটবে।

আহমাদ মাযহার

১০/১ নিউ ইস্কাটন
ঢাকা ১২১৭

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

পিঠে পার্বণে চীনে ভূত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

রাধামাধব গুপ্ত তাঁহার মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মাতুল ব্রহ্মদেশে কোনো স্থানের ডাক্তার ছিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। বৃদ্ধ-বয়সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি দেশে আসিয়াছেন। দেশে আসিয়া প্রথমে তিনি তীর্থদর্শন করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। এখন কলিকাতায় আসিয়া রাসা করিয়াছেন। রাধামাধব সেই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

রাধামাধব নিজেও পাস করা ডাক্তার। কলিকাতায় নহে, অন্য স্থানে তিনি ডাক্তারি করেন। মাতুল-মাতুলানীকে তিনি প্রণাম করিলেন। দেখিলেন যে, মাতুল-মাতুলানী দুইজনেরই শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখে যেন কালি মারিয়া দিয়াছে। দুইজনেই সর্বদা অতি বিমর্ষভাবে থাকেন। মনে মনে যেন সর্বদাই কিরূপ একটা ভয়—কিরূপ একটা দুশ্চিন্তা।

রাধামাধব আরও দেখিলেন যে, তাঁহার মাতুলের মস্তকটি মুণ্ডিত, মাথায় চুল নাই।

তিনি মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বর্মায় আপনি যে স্থানে ছিলেন সে স্থানের জলবায়ু কি ভালো ছিল না? আপনারা দুইজনেই অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে বোধহয়, যেন আপনাদের শরীরে কোনো একটা রোগ আছে।'

মাতুল উত্তর করিলেন—'না আমাদের শরীরে কোনো রোগ নাই।' তিনি কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন।

পরদিন মামা জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাধামাধব, তুমি যে স্থানে ডাক্তারি কর, সে স্থানে দু-পয়সা হয় তো?'

রাধামাধব উত্তর দিলেন—'প্রথম প্রথম বেশ দু-পয়সা হইত। তারপর কোথা হইতে সে স্থানে এক অবতার উপস্থিত হইল, সে অবধি আমার আর বড় কিছু হয় না।'

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন—'অবতার কিরূপ?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'গেরুয়া কাপড় পরা একটা লোক।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৭ ১৯১৯ জন্ম চব্বিশ পরগণার বাহুতা গ্রামে। পেশা বিচিত্র; প্রথমে স্কুল শিক্ষক, পরে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর। উড়িয়া ভাষা শিখে সে-ভাষায় মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বেঙ্গল গেজেটিয়ার অফিসের কারণিক ছিলেন কিছুকাল। পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের কারণিক। এ-ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্বে কর্মরত। জীবনের শেষ পর্যায়ে কলকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর। হাস্যরসের গল্প ও ভূতের গল্পের লেখক হিসাবে বাংলাসাহিত্যে খ্যাতিমান। *কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগম্বর, মুক্তামালা, ময়না কোথায়, মজার গল্প, পাপের পরিণাম, ডমরু চরিত* তাঁর রচিত গল্প উপন্যাস।

সেও চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। রোগীকে কখনও ডাক্তারি, কখনও হোমিওপ্যাথি, কখনও কবিরাজি, কখনও হাকিমি, কখনও স্বপ্নলব্ধ ভৌতিক ঔষধ প্রদান করে। রোগীর নিকট ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ি, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি নানা বিষয়ে গল্প করিয়া সে বলে যে—"আমি ভূত নামাইতে পারি, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ডাকিতে পারি।" যে পর্যন্ত এই অবতারটি সে স্থানে আসিয়াছে, সেই অবধি আমার পসার প্রতিপত্তি একেবারে গিয়াছে।'

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে লোকটা ভূত-প্রেত সম্বন্ধে যে-সমুদয় গল্প করে, তাহা কি মিথ্যা?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'সমুদয় মিথ্যা। ভূত আবার কোথায়? ভূত বলিয়া জগতে কোনোরূপ বস্তু নাই।'

মাতুল বলিলেন—'বটে! যদি দেখিতে পাও?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'ভূত দেখিবার নিমিত্ত রাত্রিকালে একলা শ্মশানে মশানে অনেক ঘুরিয়াছি। একদিন দুইদিন নয়, তিন বৎসর কাল এরূপ চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ভূতের চিহ্নমাত্রও আমি দেখিতে পাই নাই। ভূতের গল্প সব অলীক। ভূত বলিয়া জগতে কিছুই নাই।'

মাতুল বলিলেন—'যদি প্রত্যক্ষ তোমাকে দেখাইতে পারি?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'তাহা হইলে আপনার নিকট আমি চিরঋণী হইয়া থাকিব। পরকালের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই। যদি ভূত দেখিতে পাই, তাহা হইলে পরকাল সম্বন্ধে আমার মনের সন্দেহ দূর হয়।'

মাতুল বলিলেন—'না তুমি ছেলেমানুষ, তাই ওরূপ কথা বলিতেছ! কাজ নাই, শেষে একটি বিপদ ঘটিবে।'

রাধামাধব মাতুলকে জোর করিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন—'যদি যথার্থই আপনি আমাকে ভূত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে দেখাইতেই হইবে। আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না। আপনার কোনো ভয় নাই। আমার মন বিচলিত হইবে না।'

মামা ভাগিনেয়তে যখন এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মাতুল যখন দেখিলেন যে, রাধামাধব তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, তখন তিনি বলিলেন—'তবে আমার সঙ্গে এস।'

রাধামাধবকে লইয়া মাতুল বড় একটা ঘরের দ্বারে গিয়া তালা খুলিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাধামাধব দেখিলেন যে দেয়ালের গায়ে দুই দিকে কাঠের আলমারি আছে। আলমারিতে দুই-স্তর কাঠের শেলফ, আর তাহার উপর অনেকগুলি ছোট-বড় শিশি রহিয়াছে। কোনো শিশিতে মানুষের পা, কোনোটিতে চক্ষু, কোনোটিতে পাথুরী, কোনোটিতে অস্থি, মনুষ্যদেহের নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে।

মাতুল বলিলেন—'এ আমার বাই। আমি নিজহাতে যত কিছু কাটিয়াছি কুটিয়াছি, তাহা স্পিরিটে রাখিয়া দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল। আমার বাড়িতে একবার আগুন লাগিয়া তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

ঘরে একখানি কোচ ছিল। মাতুল বলিলেন—'এই কোচের উপর তোমায় আমি বিছানা করিয়া দিতেছি। এই ঘরে একলা শুইতে পারিবে? একটি ল্যাম্প আনিয়া দিতেছি। ল্যাম্প জ্বলিতে থাকুক, অন্ধকারে থাকিয়া কাজ নাই।'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'স্বচ্ছন্দে আমি এই ঘরে একলা শুইয়া থাকিব।'

মাতুল বলিলেন—'বেশ কথা! তুমি কিছু দেখিবে, কি না-দেখিবে, সে কথা এখন তোমাকে বলিব না।'

BanglaBook.org

মাতুল নিজ হাতে কোচের উপর বিছানা করিয়া দিয়া বলিলেন—'রাধামাধব, এখন আমি চলিলাম, পাশের ঘরেই আমি শয়ন করি। আবশ্যক হইলে আমাকে ডাকিবে।'

মাতুল প্রস্থান করিলে, রাধামাধব ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর, ঘরের অন্যান্য দ্বার-জানালা ভালোরূপ বন্ধ আছে কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অবশেষে ল্যাম্পের আলো কমাইয়া দিলেন। ল্যাম্প মিটমিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের সকল বস্তু স্পষ্ট-ভাবে দেখা যাইতে লাগিল।

কোচের উপর রাধামাধব শয়ন করিলেন ও একঘণ্টা পরই তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের ভিতর ঠকঠক শব্দ হইতেছিল। সেইদিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে, আলমারির ধারে ধারে একজন পুরুষমানুষ বেড়াইতেছে। নিজহাতে রাধামাধব ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়াছিলেন। বাহির হইতে ঘরের ভিতর লোক আসিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

'এ মানুষ নহে, এ ভূত'—রাধামাধবের মনে নিশ্চয় এইরূপ বিশ্বাস হইল। ভয়ে প্রাণের ভিতর তাহার গুরগুর করিয়া উঠিল ! চিৎকার করিয়া ফেলেন আর কি !—এমন সময় মনকে দৃঢ় করিয়া ভাবতে লাগিলেন—পৃথিবীতে ভূত নাই, থাকিলেও তাকে আমি ভয় করি না। চিরকাল লোকের নিকট আমি এইরূপ মুখে শাপট করিয়াছি। আজ যদি ভয়-বিহ্বল হইয়া চিৎকার করিয়া ফেলি তাহা হইলে সকলের নিকট আমি হাস্যাস্পদ হইব। অতএব প্রাণ থাকে আর যায়, কিছুতেই আমি চিৎকার করিব না।

রাধামাধব এইরূপ মনকে আশ্বাস দিয়া, ভূত কী করে, চুপ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আলমারির উপর যে-সমুদয় শিশি সাজানো ছিল, ভূত একে একে সেই সমুদয় শিশি অতি মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। ঘরের অপর পার্শ্ব হইতে শিশি দেখিতে দেখিতে ভূত রাধামাধবের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাধামাধব দেখিলেন যে, ভূতটির মাথা নেড়া। তাহার পশ্চাৎ দিকে লম্বা বেণী ঝুলিতেছে। বিনুনি দেখিয়া রাধামাধব ভাবিলেন—এটা দেশী ভূত নহে, চীনে ভূত।

আলমারির ধারে ধারে ঘরের দুইদিক ঘুরিয়া ভূত একে একে সমস্ত শিশিগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। যখন সমুদয় শিশি দেখা হইয়া গেল, তখন সে ঘোর দুঃখসূচক এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; তাহার মুখ বিষণ্ন হইল; তাহার চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। তাহার পর কোচের নিকট আসিয়া রাধামাধবের সম্মুখে দাঁড়াইল ও অতিশয় ক্ষুণ্নমনে আপনার হাত দুইটি তুলিয়া যেন কী দেখাইল। হাত দুইটি নহে, দেড়টি হাত। রাধামাধব দেখিলেন যে, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানি আছে। জামার আস্তিন কেবল কনুই পর্যন্ত উঠিল। অবশিষ্ট ভাগ ঝুলিয়া পড়িল; কারণ তাহার ভিতর হাত ছিল না। ভয়ে রাধামাধব অচেতনপ্রায় হইলেন। তাঁহার সর্ব শরীর ঘর্মে সিক্ত হইয়া গেল। চিৎকার করিয়া ফেলেন আর কি !—এমন সময় ভূত অদৃশ্য হইয়া গেল।

সে রাত্রিতে আর কোনো উপদ্রব হইল না।

প্রভাত হইলে মাতুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাতুল বলিলেন—'রাত্রিতে তুমি যে কিছু দেখিয়াছ, তোমার মুখ দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। ইহার সবিশেষ বিবরণ আজ দিনের বেলা তোমাকে আমি প্রদান করিব।'

সেইদিন আহারের পর মামা ভাগিনেয় একস্থানে বসিয়া গল্পগাছা করিতে লাগিলেন। মাতুল বলিলেন—'বর্মায় যে স্থানে আমি কাজ করিতাম, সে স্থানের হাসপাতাল আমার অধীনে ছিল। নিম্নপদস্থ ডাক্তারগণ বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্র-চিকিৎসা করিতে বড় সুবিধা পান না, কিন্তু এই হাসপাতালে আমার সে সুবিধা ছিল। অনেক বড় বড় অস্ত্র-চিকিৎসা আমি করিয়াছি। কোনো

BanglaBook.org

কের অঙ্গচ্ছেদন করিয়া, সেই কর্তিত অঙ্গটি স্পিরিটপূর্ণ শিশির ভিতর রাখা আমার বাই ।। যে ঘরে গত রাত্রিতে তুমি শয়ন করিয়াছিলে, সেই ঘরে সেইরূপ অনেকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। বর্মা, চীনের নিকট; চীনদেশের অনেক লোক এদেশে বাস করিয়াছে। একদিন একজন চীনেম্যান আমার হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম যে তাহার দক্ষিণ হাতটির কনুই পর্যন্ত পচিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম যে—হাতটি কাটিয়া না ফেলিলে কিছুতেই তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না। প্রথম সে সে সম্মত হইল না। তাহার পর যখন দেখিল যে হাত না কাটিলে তাহার প্রাণ কিছুতেই না, তখন সে অগত্যা সম্মত হইল। অজ্ঞান করিয়া কনুই পর্যন্ত আমি তাহার হাত কাটিয়া ফেলিলাম। তাহার পর সেই হাত যথারীতি সুরাপূর্ণ শিশিতে রাখিলাম। জ্ঞান হইবামাত্র চীনে রোগী আপনার কাটা হাত দেখিতে চাহিল। কাটা হাত দেখিবার জন্য সে এত কাতর হইল যে, তাহাকে না-দেখাইয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। শিশিটি বাম হাত দিয়া সে অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাখিয়া দিল। সেইদিন হইতে শিশিটি সে চক্ষুর আড়াল করিতে দিত না। আর দিনের মধ্যে অনেকবার তাহাকে খাটের উপর তুলিয়া অতি স্নেহের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিত। কিছুদিন পরে সে আরোগ্য লাভ করিল। হাসপাতাল হইতে যাইবার পূর্বে আমি তামাশা ছলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ডাক্তারকে বিদায় করিবে না?'

চীনে উত্তর করিল—'আমি দুঃখী লোক। আমি আপনাকে কী দিতে পারি?'

আমি বলিলাম—'তোমার হাতটি আমাকে প্রদান কর।'

তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল। সে বলিল—'মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন। হাতটি আমি আপনাকে দিতে পারিব না। আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন দেহের সহিত এই হাতটিরও কবর দিতে হইবে। আমি এই হাতটিকে নুন দিয়া রাখিব। তাহা করিলে পচিয়া যাইবে না। আমার মৃত্যু হইলে আমার আত্মীয়-স্বজন ইহাকেও দেহের সহিত গোর দিবেন।'

পুনরায় তামাশা ছলে আমি বলিলাম—'তোমার নিকট অপেক্ষা আমার নিকট হাতটি আরও ভালো অবস্থায় থাকিবে। কারণ, এরূপ বস্তু ভালোরূপে রাখিবার নিমিত্ত আমার নিকট মশলা আছে। আর কিরূপে রাখিতে হয়, তাহাও আমি জানি। তোমার নিকট থাকিলে হাতটি নিশ্চয়ই পচিয়া যাইবে। পচা হাত লইয়া শেষে কি পরলোক যাইবে?'

আমার কথাগুলি লোকটির মনে লাগিল। উৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল—'আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আসিয়া হাতটি প্রার্থনা করিলে যদি ইহা ফিরাইয়া দিতে আপনি প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতে পারি।'

আমার কুবুদ্ধি! আমি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। একবার নহে, লোকটি বার বার আমাকে তিন সত্য করাইল। তাহার পর শিশিটি আমার হাতে দিয়া সে প্রস্থান করিল। অন্যান্য শিশির সঙ্গে আমি সে শিশিটিও রাখিয়া দিলাম।

আমি যে-বাড়িতে বাস করিতাম, তাহা কাষ্ঠ-নির্মিত ছিল। কিছুদিন পরে আমার বাড়িতে আগুন লাগিল। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে, অনেকগুলি শিশিও নষ্ট হইয়া গেল। তাহার মধ্যে চীনেম্যানের হাত-সম্বলিত শিশিটিও ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, চীনের কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম! তাহার হাতের কথা, অথবা আমার প্রতিজ্ঞার কথা,—একবারও আমার মনে উদয় হয় নাই।

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে দুইজন চীনেম্যান আসিয়া আমাকে বলিল—মোঙ নামক যে চীনের হাত আপনি কাটিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আপনার নিকট হইতে সেই হাতটি লইয়া কবরে দিতে সে বার বার অনুরোধ করিয়াছে। সেই হাতের

নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি।'

আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল! হাতটি [illegible] তে আমি বার বার তিন [illegible] করিয়াছিলাম। সেই সত্য হইতে আজ আমি ভ্রষ্ট হই[illegible] ার করিব? দৈবক্রমে হাতটি ন[illegible] হইয়া গিয়াছে, আমি সেই কথা তাহাদিগকে বলিলাম [illegible] নে তাহারা চলিয়া গেল।

সেইদিন রাত্রিতে ঘরে শয়ন করিয়া, আমি নিদ্রা [illegible]। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ঘরে অল্প অল্প আলো জ্বলিতেছে। সহসা [illegible] রিয়া শয্যা হইতে আমাকে তুলিয়া বসাইল! আমি চাহিয়া দেখিলাম যে, একজন চীনে আমার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আরও দেখিলাম যে, সে আর কেহ নহে, সে সেই মোঙ,—যাহার হাত আমি কাটিয়াছিলাম। ভয়ে বিহ্বল হইয়া আমি কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। কেবল গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ আমার খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চীনে কুপিত কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া ঘোরতর ভর্ৎসনাসূচক ভঙ্গি করিয়া, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানা অর্থাৎ কেবল বাহুটি আমাকে তুলিয়া দেখাইল। তাহার পর, ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। পরে যে-ঘরে শিশি থাকে, সেই ঘরে খুটখাট শব্দ হইতে লাগিল। পরে অবগত হইয়াছি যে, প্রত্যেক শিশি নিরীক্ষণ করিয়া সে আপনার হাতের অনুসন্ধান করে। শিশিতে আপনার হাত দেখিতে না পাইয়া বাড়ির অন্যান্য ঘর সে পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করে। আজ কয় বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রিতে এইরূপ করিতেছে। প্রথমে শয্যা হইতে সে আমাকে উত্তোলন করে, তাহার পর কুপিত ও ভর্ৎসনা ভাবে সে আমাকে তাহার হাতের আধখানি দেখায়, তাহার পর শিশিগুলোকে দেখিয়া বেড়ায়, তাহার পর আন্যান্য ঘর অনুসন্ধান করে। রাত্রিকালে সহসা মাথার চুল ধরিয়া তুলিলে আমার বড় কষ্ট হয়। সেইজন্য মাথাটি আমি নেড়া করিয়াছি। এখন সে হাত ধরিয়া আমাকে উত্তোলন করে। যাহা হউক, তোমার মামি ও আমি এই রোগে আজ কয় বৎসর ভুগিতেছি। এই রোগের জন্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, দেশে আসিয়াছি। কিন্তু চীনে ভূত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত আমি না করিয়াছি—এমন কাজ নাই। তন্ত্র, মন্ত্র, জড়ি, বড়ি, কবচ, মাদুলি, ঝাড়ান, কাড়ান, ভূত নামানো, চণ্ডু নামানো, যাহা কিছু আছে সব করিয়াছি। দেশে আসিয়া চীনের নামে শ্রাদ্ধ করিয়াছি, গয়াতে পিণ্ড দিয়াছি, গরিব দুঃখীকে দান করিয়াছি, এক তীর্থস্থান হইতে অন্য তীর্থস্থানে পলায়ন করিয়া বাস করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যেখানে যাই না কেন, চীনে ভূত সেখানেই আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়। আর একটি আশ্চর্য কথা এই যে, শিশিগুলো যদি আমি সঙ্গে না লইয়া যাই, তাহা হইলে উপদ্রবের আর পরিসীমা থাকে না। রাত্রিতে আমাকে শয্যা হইতে তুলিবার পর যদি সে শিশি দেখিতে না পায়, তখন ঘোরতর কুপিত হইয়া সে আমার ঘরের দ্রব্যাদি ভাঙিতে থাকে। বাড়িতে ইঁট পাটকেল বৃষ্টি করিতে থাকে। সেজন্য যেখানে যাই না কেন, শিশিগুলি আমাকে সঙ্গে রাখিতে হয়। আর কোনো উপায় নাই। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। এখন মৃত্যু হইলেই আমি যেন বাঁচি।'

রাধামাধব মাতুলের কথাগুলি শুনিলেন। মাতুলকে নানারূপ আশ্বাস প্রদান করা ব্যতীত তখন তিনি আর কিছু বলিলেন না। তাহার পর রাত্রিকালে শয়ন করিয়া স্থির করিলেন—'এই ভূতটাকে আমি ঠকাইতে চেষ্টা করিব।'

পরদিন রাধামাধব মাতুলকে বলিলেন,—'এ ঘোর বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি একটা উপায় ভাবিয়াছি। যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে কিছুদিন এই স্থানে থাকিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি।'

মাতুল সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

BanglaBook.org

যাঁহারা কলিকাতার হাসপাতালে কাজ করেন, সেইরূপ ডাক্তারের সহিত রাধামাধব একসঙ্গে

পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি একটি মড়ার হাত চাহিয়া লইলেন। হাতটি শিশিতে করিয়া মাতুলের অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া দিলেন। কী হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সে-রাত্রিতে পুনরায় সেই কোচের উপর তিনি শয়ন করিলেন। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মাতুলের ঘরে তিনি ভূতের শব্দ পাইলেন। তাহার পর, চীনে ভূত যথারীতি সেই শিশির ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি একে একে সমুদয় শিশিগুলি সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। যে শিশির ভিতর রাধামাধব সেই হাতটি রাখিয়াছিলেন, ভূত আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শিশির ভিতর হাত দেখিয়া আনন্দে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল। শিশিটি সে বাম হাতে তুলিয়া মনোযোগপূর্বক দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিয়া রাগে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। রাগে সে শিশিটি দূরে ভূমির উপর নিক্ষেপ করিল। শিশিটি ভাঙিয়া গেল। ভূত অদৃশ্য হইল।

রাধামাধবের চেষ্টা বিফল হইল। ভূত প্রতারিত হইল না। কেন এরূপ হইল, রাধামাধব তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, বাঙালি অথবা হিন্দুস্থানীয় হস্ত দ্বারা ভূতকে ভুলাইতে পারা যাইবে না। আসল চীনেম্যানের হাত চাই। কিন্তু হাসপাতালে চীনেম্যানের হাত সহজে পাওয়া যায় না। তথাপি রাধামাধব নিরাশ হইলেন না। এইরূপ একটি হাতের জন্য বন্ধুদিগকে তিনি বলিয়া রাখিলেন। দৈবক্রমে এই সময় একজন চীনে শ্রমিকের তেতলার ভারা হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। সে একেবারে মরে নাই। তাহার একটি হাত চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই হাতটি ছেদন করা হইল। রাধামাধব সেই হাতটি পাইলেন। পূর্বের মতো হাতটি শিশিতে রাখিয়া পুনরায় তিনি কোচের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর ভূত যথারীতি উপস্থিত হইয়া শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। হস্ত-সম্বলিত শিশি দেখিয়া আজও প্রথম তাহার মনে আনন্দ হইল। কিন্তু আজও সে পূর্বের ন্যায় কুপিত হইয়া শিশিটি আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। শিশিটি ভাঙিয়া গেল।

রাধামাধবের চেষ্টা এবারও বিফল হইল। কেন এমন হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে মাতুল ও তিনি হাতটি ভূমি হইতে তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া মাতুল বলিলেন,—'ওহ্ বুঝিয়াছি! এটা বাম হাতে। চীনে ভূতের দক্ষিণ হাত গিয়াছে। বাম হাত দেখিয়া সে জানিতে পারিয়াছে যে, এটা জাল হাত, তাহার নিজের হাত নহে। সেইজন্য সে রাগ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।'

রাধামাধব বুঝিলেন যে ইহাই প্রকৃত কারণ বটে। সেই দিন হইতে চীনেম্যানের দক্ষিণ হাতের জন্য তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক মাস গত হইয়া গেল তথাপি এরূপ হাতের জোগাড় করিতে পারিলেন না। এমন সময় চীনের লড়াই আরম্ভ হইল, কলিকাতা হইতে যে সমুদয় জাহাজ চীনদেশে গমন করে সেইরূপ জাহাজের একজন খালাসির সহিত রাধামাধব আলাপ করিয়া তাহাকে বলিলেন—'আরকপূর্ণ একটি শিশি তোমাকে দিতেছি। অস্ত্রাঘাতে হত হইয়াছে, এরূপ চীনে পুরুষমানুষের দক্ষিণ হাত যদি তুমি এই শিশির ভিতর করিয়া আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি একশত টাকা পুরস্কার দিব।'

খালাসি সম্মত হইল। অস্ত্রাঘাতে সে-সময় অনেক চীনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ একটি হাতের জোগাড় করিতে খালাসিকে অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। দুই মাস পরে সেই আরকপূর্ণ শিশি করিয়া একজন চীনেম্যানের দক্ষিণ হস্ত সে রাধামাধবকে আনিয়া দিল।

শিশিটি রাধামাধব অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া পূর্বের ন্যায় সেই ঘরে শয়ন করিয়া রহিলেন। পূর্বের ন্যায় যথাসময়ে ভূত আসিয়া একে একে শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। পূর্বের ন্যায় আজও সে হস্ত-সম্বলিত শিশিটি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে

লাগিল; কিন্তু আজ তাহার মুখে ক্রোধের লক্ষণ উদয় হইল না; আজ সে ক্রোধে শিশিটি আছড়াইয়া ফেলিল না। আনন্দের উপর আনন্দে আজ তাহার মুখশ্রী প্রফুল্ল হইতে প্রফুল্লতর হইতে লাগিল। অবশেষে শিশিটি হাতে লইয়া আনন্দে সে ঘরের ভিতর দুপ দাপ ধুপ ধাপ নৃত্য করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে সে 'ফিং ফাং ফোঁং, পিং পাং পোঁ' বলিয়া গান করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে গাহিতে শিশিটি হাতে করিয়া ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। রাধামাধব তাড়াতাড়ি মাতুলকে ডাকিয়া এই সুসমাচার প্রদান করিলেন। কিন্তু চীনে ভূত তখনও বাটি হইতে যায় নাই। মাঝের একটি ঘরে তখন সে একপ্রকার চপর চপর শব্দ করিতেছিল। মাতুল, মাতুলানী ও রাধামাধব সেই ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। সে ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দ্বারের ফাঁক দিয়া সকলে দেখিলেন যে, ঘরের মাঝখানে বসিয়া চীনে ভুত—থালা ও অনেকগুলি বাটি হইতে কী সব আহার করিতেছে। মাতুলানী তখন হাসিয়া বলিলেন—'আজ পৌষ সংক্রান্তি। আজ আমি নানারূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। তাই মনে করিলাম যে—আহা ! এই চীনে ভূতটি প্রতিদিন আমাদের বাটিতে আসে; তাহাকে কিছু দিব না ! তাই থালা ও বাটিতে নানারূপ পিঠে ও পরমান্ন তাহার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। মনের আনন্দে বসিয়া বসিয়া সে তাই খাইতেছে।'

পিষ্টকাদি আহার করিয়া চীনে ভূত পরম পরিতোষ লাভ করিল। তাহার পর সে চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে মাতুলের বাটিতে ভূতের উপদ্রব নাই। মাতুল ও মাতুলানীর শরীর ও মন সুস্থ হইল, পরম সুখে তাঁহারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

মাতুল এখন মাথায় চুল রাখিয়াছেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মণিহারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৬১—১৯৪১
জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু বিচিত্র বিষয়ে গভীর অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও মনীষাকে প্রদীপ্ত করেছিল। মাত্র ১৮ বছর বয়সে প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই *কবিকাহিনী*র মাধ্যমে সাহিত্য জীবনের সূচনা। *গল্প-উপন্যাস, ব্যঙ্গকৌতুক, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী, ধর্মোপদেশ, শিক্ষা, রাজনীতি, শব্দ, ছন্দ, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নাটক, গদ্য কবিতা, প্রহসন, রূপক নাটক, কবিতা,* গান প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তাঁর লেখনি সমৃদ্ধ করেছে বাংলা ভাষাকে। সাহিত্যের কনিষ্ঠতম মাধ্যম ছোটগল্পের প্রবর্তন তাঁর হাতেই ঘটেছিল। গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্বে মর্যাদায় আসীন করেন। বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা তাঁর হাতেই মুক্তি পায়।

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকে হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থমূল-বিদারিত ঘাটের উপর ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম, ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকরের যেমন একরকম বহুকাল-জীর্ণসংস্কারবিহীন চেহারা, ইঁহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম-খোলা চাপকান ; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে-সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে-সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, "আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যাবসা করিয়া থাকি।"

"কী ব্যাবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যাবসা।"

"কী নাম।"

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, "এখানে কী করিতে আগমন।"

আমি কহিলাম, "বায়ুপরিবর্তন।"

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয় আজ প্রায় ছয়বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই। আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে, রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।"

তিনি কহিলেন "আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।"

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, "এই বাড়িতে।"

বোধকরি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে-ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়ো বড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু, তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমনকি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে-স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসর শান-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয়, তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল—ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা, বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল ; সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বুঝিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত ; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এইখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু, ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না ; ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনও তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই ; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশবৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দবৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ, তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে-কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না ; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না ; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী-যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশঘণ্টা অনুভব

BanglaBook.org

করার নাম ঘরকর্‌নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা—ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই তাহাদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমতো পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসামান-যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রণাশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে-পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভবিবাহের পূর্বে, পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন! একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়—এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোট কথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর, মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপরটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে

BanglaBook.org

বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে, আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্‌পট্‌ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে, ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে ; যে-ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে-ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুন্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যান্ডনোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয় ; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না, তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এইরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন? তাহার কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না, ইহা তাহাকে শোভা পায়?

যাহা হউক আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে ; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে।

BanglaBook.org

ইহারা এক রকমের। ইহারা মেয়েমানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে অর্থাৎ কেহবা বর্বর, কেহবা নির্বোধ, কেহবা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমতো স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল ; জিজ্ঞাসা করিল, "এখন পরামর্শ কী।"

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল; অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, "বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।"

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সংগত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই ; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মানিক, যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার—সেই অনেকদিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, "কী করা যায়।"

মধুসূদন কহিল, "গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চল"। গহনার কিছু অংশ, এমনকি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ-প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, "গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।" মণি কহিল, "সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।"

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হু হু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে-বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু, গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে-গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না, মোটা চাদরের নিচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই ! মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে, কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের ; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দন্ত-সকে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে এ কথাটা ঠিকমতোই

BanglaBook.org

প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, "আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।"

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, "এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।" আরো শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবী যুগের ফণিভূষণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে, শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনও সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য-কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই।

স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল। মনে হইল, সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্যব্যাবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, "চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কর্ত্রীঠাকুরুন খবর লওয়া চাই তো।" এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ-পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল—কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে।

BanglaBook.org

মুষলধারায় বৃষ্টিপাতশব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল—বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্ট্‌স্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবার মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যান্টার, শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমনকি শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতিক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষমুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন, এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারিদিকের এই সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো; এই সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন একসময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্‌ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে তাহার মনে হইতেছিল, যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে, এই অতি কঠিন নিকষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল, শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল— স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুত হস্তে আরো একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, রুদ্ধ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই

BanglaBook.org

সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নিচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা, এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনও ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দারোয়ান কহিল, "মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না।" ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, "তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।" ফণিভূষণ কহিল, "সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।" দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনে-একটি অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চিৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেক রাত্রে একসময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ উঠিল। কিন্তু, ফণিভূষণ সেদিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্ত দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দরমহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্‌খট্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "মণি !" অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চিৎকারে ঘরের শার্সিগুলা পর্যন্ত ধ্বনিত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

BanglaBook.org

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেইদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্তদিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসব-জাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল ; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত ! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে ; বলিতেছে, সংসারোহয়মতীববিচিত্রঃ !

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্রসামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢলঢল্ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি।

BanglaBook.org

আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের শাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল; দেখিয়া তাহার সর্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না ; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল ; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্ ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিতে করিতে নিচে উত্তীর্ণ হইল। নিচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল। অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইঁটের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়্‌কড়্ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না ; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে-ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারম্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।"

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।"

আমি কহিলাম, "নৃত্যকালী।"

BanglaBook.org

ভূতের গল্প

প্রমথ চৌধুরী

আমি কখনো ভূত দেখিনি, আর যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কী যে দেখেছেন তা বলতে পারেন না। তাঁদের কথা প্রায়ই অস্পষ্ট, তার কারণ ভূত হচ্ছে অন্ধকারের জীব, তার কোনো কাটা-ছাটা রূপ নেই।

আমি একটি ভদ্রলোকের মুখে দিনদুপুরে রেলগাড়িতে যে অদ্ভুত গল্প শুনেছি, তার প্রধান গুণ এই যে, ব্যাপার যা ঘটেছিল, তার একটা স্পষ্টরূপ আছে।

আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে রেলরাস্তায় কন্ট্রাক্টরি কাজে ভর্তি হই। ঐ ছিল আমার পৈতৃক ব্যবসা। আমি একবার পারলাকিমেড়ি যাচ্ছিলুম। পারলাকিমেড়ি কোথায় জানেন? গঞ্জাম জেলায়, বিএনআর-এর বড় লাইন থেকে পারলাকিমেড়ি পর্যন্ত যে ফেঁকড়া লাইন বেরিয়েছে সে লাইন তৈরির কনট্রাক্ট আমরাই নিই, আর তারই হিসেব-নিকেশ করতে সেখানকার রাজার ওখানে যাই।

গাড়ি যখন বিরহামপুর স্টেশনে পৌঁছল তখন বেলা প্রায় এগারোটা, ঐ এগারোটা বেলাতেই মাথার উপরে আর চারপাশে রোদ এমনি খাঁ-খাঁ করছিল যে কলকাতায় বেলা দুটো-তিনটেতেও অমন চোখ-ঝলসানো রোদ দেখা যায় না। সে তো আলো নয়, আগুন, এ-রকম আলোয় পৃথিবীতে অন্ধকার বলেও যে একটা জিনিস আছে, তা ভুলে যেতে হয়।

গাড়ি স্টেশনে পৌঁছতেই একটি হৃষ্টপুষ্ট বেঁটেখাটো সাহেব এসে কামরায় ঢুকলেন। তিনি যে একজন বড় সাহেব তা বুঝলুম তাঁর উর্দি-পরা চাপরাসিদের দেখে। দুটি-একটি বাবুও সঙ্গে ছিলেন, মাদ্রাজি কি উড়ে চিনতে পারলুম না; কিন্তু তাঁদের ধরন-ধারণ দেখে বুঝলুম যে, তাঁরা হচ্ছেন সাহেবের আফিসের কেরানি, কারণ তাঁরা সাহেবের জিনিসপত্র সব গাড়িতে উঠল কি না দেখতে প্ল্যাটফরমময় ছুটোছুটি করছিলেন আর মধ্যে মধ্যে কুলিদের পিঠে ও মাথায় চড়টা চাপড়টা লাগাচ্ছিলেন। অবশেষে গাড়ি ছাড়ল। প্রথমে সঙ্গীটিকে দেখে আমার একটু অসোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। কারণ

প্রমথ চৌধুরী
১৮৬৮—১৯৪৬
জন্ম যশোরে। পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার পরিবারের সন্তান। দর্শন শাস্ত্রে বি এ অনার্স এবং ইংরেজি সাহিত্যে এম এ ডিগ্রি পান প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান নিয়ে। ইংল্যান্ড থেকে বার এট ল ডিগ্রি পান। কলকাতা হাইকোর্ট-এ স্বল্পকাল আইন ব্যবসা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল আইনের অধ্যাপক ছিলেন। সাহিত্য পত্রিকা সবুজপত্র সম্পাদনার জন্য খ্যাতি লাভ। তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্র পত্রিকার মাধ্যমেই চলিত বাংলা ভাষায় কথাসাহিত্য ও মননশীল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। মননশীল প্রাবন্ধিক হিসাবে তিনি ব্যাপক খ্যাতিমান। বাংলা কাব্যজগতে ইতালীয় সনেট-এর প্রবর্তক। *তেল নুন লাকড়ি*, *বীরবলের হালখাতা*, *নানা কথা*, *রায়তের কথা*, *আমাদের শিক্ষা*, *চারইয়ারী কথা*, *নীললোহিত*, *সনেট পঞ্চাশৎ* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

তারা চেহারাটা ঠিক বুলডগের মতো—তার ওপর তাঁর মুখটি ছিল আগাগোড়া সিঁদুরে লেপা। আমি ভাবলুম, রোদে তেতে মুখ এ-রকম লাল হয়েছে।

পাঁচ মিনিট পরেই হুইস্কির বোতল খুলে একটি গ্লাসে প্রায় আট আউন্স ঢেলে তার সঙ্গে নামমাত্র সোডা সংযোগ করে এক চুমুকে তা গলাধঃকরণ করলেন।

তারপর ঠোঁট চেটে আমাকে সম্বোধন করে বললেন যে, 'will you have some?' আমি বললুম, 'No, thank you.' এ-কথা শুনে তিনি বললেন, 'There is not a drop of headache in a Jallan of that. It is pucca Perth my native place.' আমিও হুইস্কি এত নিরীহ শুনেও যখন তার অমৃতে ভাগ বসাতে রাজি হলুম না, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'Don't you drink?'

আমি বললুম, 'I do, but I drink, brandy.' এ মিথ্যে কথা না বললে, আমাকে তার এক গেলাশের ইয়ার হতে হত। আমার উত্তর শুনে তিনি বললেন, 'Damned Constipating stuff, bad for one's liver. However, don't drink too much.'

এরপর তিনি আমাকে Pucca Perth-এর রসাস্বাদ করতে আর পীড়াপীড়ি করেন নি, নিজেই তাঁর মেজাজ ঝালিয়ে নিতে যখন টুকটাক আরম্ভ করলেন, আমি যখন বেলা দুটোয় গাড়ি থেকে নেমে যাই তখন তিনিও তাঁর খালি বোতল গাড়ির জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন, আর একটি নতুন বোতলের মাথার রাঙতার পাগড়ি খুলতে বসে গেলেন।

লোকটা দেখলুম বেজায় মদ খায় বটে, কিন্তু বে-এক্তিয়ার হয় না। হুইস্কির প্রসাদেই হোক, আর যে-কারণেই হোক তিনি ক্রমে মহা বাচাল হয়ে উঠলেন ও আমার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন অর্থাৎ সে-গল্পের আমি হলুম শ্রোতা-মাত্র, আর তিনি হলেন বক্তা।

আমার পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন যে, তিনিও এ অঞ্চলের একজন বড় সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। আর কার্যসূত্রে তিনি ওদেশে কী কী দেখেছেন আর তাঁর জীবনে কী কী অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে নানারকম খাপছাড়া ও এলোমেলো বক্তৃতা করলেন। দেখলুম লোকটা শুধু মধুরসের নয়, মধুররসেরও রসিক।

গঞ্জাম ছাড়িয়েই মাদ্রাজ। আর মাদ্রাজে নাকি দেদার অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আছে, যদিও পথেঘাটে যাদের দেখা যায় তারা সব যেমন কালো, তেমনই কুৎসিত। তবে যারা A.I সুন্দরী তারা সব অসূর্যম্পশ্যা। আর এইসব গুপ্তরত্নদের সন্ধান দিতে পারে আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে শুধু P.W.D.-র বড় বড় মাদ্রাজি কন্ট্রাক্টররা। সেই সঙ্গে তিনি বললেন যে, তুমি যখন একজন বাঙালি কন্ট্রাক্টর তখন তুমি যদি এদেশে প্রেম করতে চাও তো তোমার তা করতে হবে ঐসব কালো কুলি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে—সে প্রেমের ভিতর কোনো রোমান্স নেই, আর আছে নানারকম বিপদ। তারপর তাঁর অনেক প্রেমের কাহিনী শুনলুম। দেখলুম ভদ্রলোকের জীবনে যা-যা ঘটেছে, সবই রোমান্টিক। কিন্তু তার বর্ণনা বিষম 'rialistic'। সেইসব মাদ্রাজি হেলেন-ক্লিওপেট্রাদের কথা সত্য কিম্বা সাহেবের সুরাস্বপ্ন, তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু তার একটি গল্প সত্য বলেই মনে হল, আর সেইটেই আজ বলব। গল্প সাহেব বলেছিলেন ইংরেজিতে আর আমি বলব বাঙলায়। আমি তো আর কিপলিং নই যে মাতালের মুখের ভূতের গল্প দা-কাটা ইংরেজিতে আপনাদের কাছে বলতে পারব। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা :

আমি যখন বিলেত থেকে চাকরি পেয়ে প্রথম এদেশে আসি তখন এ অঞ্চলের একটি জঙ্গুলে জায়গা হল আমার প্রথম কর্মস্থল।

কাজ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি পাকা রাস্তা তৈরি করা, আর সেই সঙ্গে আমার পূর্বে যিনি

BanglaBook.org

এ-কাজে ছিলেন অর্থাৎ মি. রোজার্স, তাঁর কবরের উপর একটি স্মৃতিমন্দির খাড়া করা। এখানে চাকরি করতে এসে নাকি অনেক ইঞ্জিনিয়ার আর বাড়ি ফেরে নি—কবরের ভিতর চলে গেছে।

আমি কতক হেঁটে কতক ঘোড়ায় বহু কষ্টে কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি চারপাশে শুধু ঘোর জঙ্গল আর মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট নেড়া পাহাড়। আর যেখানে একটু সমান জমি আছে সেখানেই দু-চার ঘর লোকের বসতি। আর এইসব স্থানীয় লোকেরাই জঙ্গল কাটে, মাটি খোঁড়ে, রাস্তার কাঁকর ফেলে আর দুরমুস দিয়ে পিটিয়ে তা দুরস্ত করে।

একটি দু-শ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর ছিল একটি P.W.D. বাংলো, সে বাংলোটির তিনকাল গেছে আর এক কাল আছে। শুনলাম সেখানেই আমাকে থাকতে হবে। সঙ্গে থাকবে আমার আদি দ্রাবিড় চাকর-বাকর আর দুজন স্থানীয় চৌকিদার। আমার বাসস্থান দেখে মন দমে গেল, কোথায় Parth আর কোথায় এই ভূতপ্রেতের শ্মশান।

সে যাই হোক, ঘরে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রাত্তিরে ডিনারের পর শুতে যাচ্ছি এমন সময় একজন চৌকিদার এসে বললে যে, 'শোবার আগে নাবার ঘরের দুয়োরটা ভালো করে বন্ধ করবেন ও ঘরে একটি বাতি রাখবেন। এখানে কত কিছুর ভয় আছে। আর রাত্তিরে কেউ যদি আপনার ঘরে ঢোকে তো আমাদের ডাকবেন, আমার এই বারান্দাতেই শুয়ে থাকব।'

শোবার ঘরে ঢোকবার আগে এমনিতেই আমরা গা ছমছম করছিল তার ওপর চৌকিদারের কথা শুনে গা আরও ভারী হয়ে উঠল। পা যেন আর চলে না। শেষটায় ঘরে ঢুকে দুয়োর বন্ধ করলুম, তারপর বিছানার পাশে টেবিলের উপর একটি ছোট্ট ল্যাম্প ও রিভলভার রেখে শুয়ে পড়লুম।

রাত দুটো পর্যন্ত ঘুম হল না, নানারকম ভাবনাচিন্তায়—যে ভাবনাচিন্তার কোনোরূপ মাথামুণ্ডু নেই। তারপর যেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছি অমনি একটা খটখট আওয়াজ শুনে জেগে উঠলুম।

প্রথমে মনে হল নাবার ঘরের কবাট হয় বাতাসে নড়ছে, নয় ইঁদুরে ঠেলছে। এদেশে এক-একটা ইঁদুর এক-একটা বেড়ালের মতো।

তারপর যখন দেখলুম শব্দ আর থামে না, তখন বিছানা থেকে উঠে রিভলভার হাতে নিয়ে নাবার ঘরের দরজা খুলে দিলুম।

খুলেই দেখি, একটি স্ত্রীলোক। চমৎকার দেখতে, একেবারে নীলপাথরের ভেনাস। তার গলায় ছিল লাল রঙের পুঁতির মালা, দু কানে দুটি বড় বড় প্রবাল গোঁজা, আর ডান হাতের কব্জায় একটি পুরু শাঁখের বালা। মাথার বাঁ দিকে চুড়ো বাঁধা ছিল, আর পরনে এক হাত চওড়া লাল পাড়ের শাদা শাড়ি। এ মূর্তি দেখে আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সে আমাকে দেখে হেসে বললে, 'তোমার ও পিস্তল দেখে আমি ভয় পাইনে, গুলি আমার গায়ে লাগবে না। আমি কেন এখানে এসেছি জান? তুমি যার বদলি এসেছ, আমি ছিলুম সেই রাজাসাহেবের রাজরানী। এই হচ্ছে আমার ঘর, এই হচ্ছে আমার বাড়ি। আমি ঐ খাটে শুতুম, আর ঐ চৌকিতে বসে কাচের গেলাশে বিলেতি আরক খেতুম। এক কথায় আমি রানীর হালে ছিলুম। তারপর রাজাসাহেব একবার ছুটি নিয়ে বিলেত গেল, আর ফিরে এল মোমের পুতুলের মতো একটি বিলেতি মেম নিয়ে, আর আমাকে দিলে সরিয়ে। সাহেব কিন্তু আমাকে মাস মাস খরচার টাকা পাঠিয়ে দিত।

'তার মাসখানেক পর সে মেমটি একদিন হঠাৎ মারা গেল, অথচ তার কোনোরকম ব্যারাম হয় নি। রাজাসাহেব তাঁর স্ত্রী কিসে মারা গেল, ভেবে পেলেন না। তার পর তাঁর চৌকিদার তাঁর কানে কী মন্তর দিলে। তাতেই ঘটল সর্বনাশ। ও বেটা ছিল আমার দুশমন।

'মেমটি মারা যাবার কিছুদিন পরে যখন দেখলুম সাহেব আর আমাকে ডেকে পাঠালে না, তখন আমি মনে করলুম, সাহেবের কাছে নিজেই ফিরে যাই। সে আমাকে আবার নিশ্চয়ই ফিরে

BanglaBook.org

নেবে। রাজাসাহেবকে আর কেউ জানুক আর না-জানুক আমি তো জানতুম। দিনটে কুলি-মজুর নিয়ে কাটাতে পারলেও রাত্তিরে আমাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

'যে রাত্তিরে ফিরে এলুম এই নাবার ঘর দিয়ে রাজাসাহেব তোমারই মতো পিস্তল হাতে করে এসে আমাকে দেখবামাত্রই গুলি করলে, আর ঐ দু-বেটা চৌকিদার আমার লাশ জঙ্গলে ফেলে দিলে।'

এই কথা বলে সে ঘরের ভিতর তাকিয়ে বললে, 'ঐ দেখ রাজাসাহেব আসছে।' আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, খাটের পাশে ছ-ফুট লম্বা একটি ইংরেজ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। মরা মানুষের মতো তার ফ্যাকাশে রঙ, আর শরীরে আছে শুধু হাড় আর চামড়া। আর খাটে ধবধবে কাপড়ের মতো শাদা একটি ইংরেজ মেয়ে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে।

ইংরেজ ভদ্রলোকটি আমাকে দেখে বললে, ও পিশাচী এখনো মরে নি। ও এখনো বেঁচে আছে। ওই আমার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। নতুন সাহেব এসেছে শুনে এখানে এসেছে আবার তার স্কন্ধে ভর করতে। আর ভর ও নির্ঘাত করবে; কারণ ও জাদু জানে। ওর হুইস্কির চাইতেও শাদা চামড়ার ওপর টান বেশি, আর তুমি যদি ওর রূপের আগুনে পুড়ে মরতে না চাও—যেমন আমি মরেছি—তবে এখনিই ওকে গুলি করো।'

এ-কথা শুনে ব্লু-ভেনাস উত্তর করলে, 'মিথ্যা কথা। আমি ওর স্ত্রীকে মারি নি। ও-ই আমাকে মেরেছে, তারপর নিজে মদ খেয়ে মরেছে।'

সাহেবটি আমাকে বললেন, 'আমার কথা শোনো, ছোড়ো তোমার রিভলভার—আর দেরি নয়।'

এইসব দেখেশুনে ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল, আর আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলুম। তাই আমি না ভেবেচিন্তে রিভলভার ছুড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে হুইস্কির বোতল মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল, আর বাতিও নিভে গেল।

গোলমাল শুনে চৌকিদাররা লণ্ঠন হাতে করে হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। আমি তাদের বললুম যে, 'ঘরে চোর ঢুকেছিল, তাই আমি পিস্তল ছুড়েছি।' তারা একটু হাসলে তারপর সমস্ত বাড়ি আর তার চারপাশে খুঁজে কাউকেও দেখতে পেলে না। তারপর থেকেই আমি আর একা শুতে পারিনে, শুলেই ঐ ব্লু-ভেনাস চোখের সুমুখে এসে খাড়া হয়, আর আমি অমনি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাই। অবশ্য এখন আর সে আসে না, কিন্তু তার স্মৃতিই আসে তার রূপ ধরে।

এরপর সাহেব এই বলে তাঁর বলা শেষ করলেন যে—'শেষটায় যাতে একা শুতে না হয় তার জন্য বিয়ে করলুম। আমার স্ত্রী Pucca Perth, ঘোর খ্রিস্টান ও সম্পূর্ণ নির্ভীক। সে ভূতে বিশ্বাস করে না, করে শুধু ভগবানে। আর আমি ভগবানে বিশ্বাস করিনে, কিন্তু ভূতে করি। আমরা ইঞ্জিনিয়াররা সব Scientific men, ধর্মের রূপকথা হেসে উড়িয়ে দিই, আর শুধু তাই বিশ্বাস করি যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। এইসব কারণে এ গল্প আমি মুখ ফুটে আমার স্ত্রীর কাছে বলতে পারি নি এই ভয়ে যে, আমার কথা সে হেসে উড়িয়ে দেবে।'

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের গল্প শুনে আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে তুমি যা দেখেছ তা হচ্ছে love devil D.T.-র প্রসাদে।—কিন্তু তার মুখে ভীষণ আতঙ্কের চেহারা দেখে চুপ করে রইলুম। তারপরেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম।

আমি অবশ্য এই শাদা-কালো ভূতের মারাত্মক প্রণয়-কলহের রোমান্টিক কাহিনী বিশ্বাস করি নি, কিন্তু সে রাত্তিরে পারলাকিমেড়ির ডাকবাংলোর চৌকিদারকে আমার ঘরে শুইয়ে ছিলুম।

BanglaBook.org

মহেশের মহাযাত্রা

প র শু রা ম

কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেতনি—এঁরাও আছেন। বেম্মদত্যি, কব্ধকাটা—এঁয়ারাও আছেন।'

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁহার শালা নগেন বলিল,—'আচ্ছা বিনোদদা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

বিনোদ বলিলেন—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস করব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারি না।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড চার্চিল আর বলডুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হার মানছি চাটুজ্যেমশায়।'

'আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার-তার কম্ম? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যেমশায়?'

'জ্যাঠামি করিস নি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে—কেউ কেরানি, কেউ দোকানি, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এইরকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।

'কে তিনি?'

'জান না? আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছু মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।'

পরশুরাম

১৮৮০—১৯৬০

প্রকৃত নাম রাজশেখর বসু। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার বামনপাড়া গ্রামে। রাসায়ন শাস্ত্র বিষয়ে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস কোম্পানিতে রাসায়নিকের চাকরি নেন। পরে পরিচালক হন। পরশুরাম নামে ব্যঙ্গ ও রম্যরচনা লিখে বাংলাসাহিত্যে খ্যাতিমান। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মননশীল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং গভীর পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁর সৃষ্টির প্রাণ। মহাভারত ও রামায়ণ-এর সারানুবাদ তাঁর অসাধারণ সাহিত্যকীর্তি। তিনি গীতা এবং মেঘদূত-এরও অনুবাদক-এ। *গড্ডলিকা, হনুমানের স্বপ্ন, গল্পকল্প, ধুস্তুরী মায়া, কৃষ্ণকলি, নীলতারা, আনন্দীবাঈ* তাঁর গল্পগ্রন্থ। *লঘুগুরু, ভারতের খনিজ, কুটিরশিল্প, বিচিন্তা* তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। তাঁর সংকলিত নিত্য ব্যবহার্য বাংলা শব্দের অভিধান *চলন্তিকা* ছিল বাঙালির

সকলে একবাক্যে বলিলেন—'কী হয়েছিল বলুন না চাটুজ্যেমশায়।'
চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসরি করতেন। অঙ্কের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমনকি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেন নি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন—শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনও জাত বড় হতে পারে নি। মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরমবন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হলে কী হয়, দুজনে হরদম ঝগড়া হত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভূত মানতেন। তা ছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখে নি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা করে বন্ধুকে উদ্‌ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাঁদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকার হয় নি, দু-একটা পাস করতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত—বউ ভালোবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হোক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা শুরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতিমহাশয় দুঃখ করছিলেন—'ছোটলোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বললেন—'লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।' পণ্ডিতমশায় উত্তর দিলেন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মহেশবাবু পালটা জবাব দিলেন—'লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।'

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহকালের কটা শখই বা মিটবে, তাইতো পরকালের আশায় বসে আছি, আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন—'কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কী?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিতমশায়। খাসা জায়গা, না-গরম না-ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সবরকম ফ'লে আছে, ছেঁড়ো আর খাও। জন-কতক ছোকরা-দেবদূত গোলাপি উড়নি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে বসে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ওই হোথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।'

মহেশবাবু বলিলেন—'সমস্ত গাঁজা। পরলোক আত্মা ভূত ভগবান কিছুই নেই। ক্ষমতা

BanglaBook.org

থাকে প্রমাণ কর।'

তর্ক জমে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতমশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে বসে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল রফা করে বললেন—'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না।' মহেশ মিত্তির বললেন—'কেউ-উ নেই, আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।' হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন—'লেগে যাও।'

তারপর মহেশবাবু ফুলস্কাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন : ঈশ্বর = ০, আত্মা = ভূত = √০।

বাচস্পতি বললে—'বদ্ধ উন্মাদ।'

মহেশবাবু বললেন—'উন্মাদ বললেই হয় না। এ হল গিয়ে দস্তুরমতো ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলস। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।'

হরিনাথ বললেন—'অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতিমশায় যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।'

বাচস্পতি বললেন—'আমার বয়ে গেছে।'

মহেশবাবু বললেন—'বেশ তো হরিনাথ, তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজি আছি।'

হরিনাথবাবু বললেন—'এই কথা? আচ্ছা, আসছে হপ্তায় শিব-চতুর্দশী পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারোটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চলো, পষ্টাপষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোনও বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না।'

'যদি দেখাতে না পার?'

'আমার নাক কান কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটব।'

প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল বললেন—'কাটাকাটির দরকার কী, সত্যের নির্ণয় হলেই হল।'

শিব-চতুর্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল; রাস্তায় আলো নেই, দুধারে বাবলাগাছে আরও অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পৌঁছলেন। বছর দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল। হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন—তারা দেখতে কেমন, মেজাজ কেমন, কী খায়, কী পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদার প্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না-মানলেও বড় একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবিতে খাটো ব'লে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না-মানলে ঘাড় ধরে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন। এইসব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন—কোনো অশরীরী বেড়াল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কালো মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐরকম আরও দুটো।

BanglaBook.org

হরিনাথবাবু থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ, দেখছ কী, তুমিও বল না।'

আর একটু হলেই মহেশবাবু রাম নাম উচ্চারণ করে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনশেন্স বাধা দিয়ে বললে—'উহু, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না-হয় রামনাম করা যাবে।'

এঁরা একটা পাকুড় গাছের নিচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা-গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনে সেই কালো মূর্তিটা নাকি-সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?'

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলে থাকেন—আজ্ঞে হাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হল, ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন্ ক্লাস?'

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে—'সেকেন্ড ইয়ার সার!'

'রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'বলি সার?'

হরিনাথের মুখে 'রাম রাম' ভিন্ন কথা নেই। পেছনের দুটো ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ করে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারল।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর!'

হরিনাথও পালটা কিল মেরে বললেন—'আহম্মক!'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে দুই বন্ধু বাড়িমুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললেন—আজি রজনীতে হয় নি সময়।

পরদিন কলেজে হুলস্থূল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিনসিপাল ভয়ংকর রাগ করে বললেন—'অত্যন্ত শেমফুল কাণ্ড। দুজন নামজাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই?'

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন—'আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালোই ছিল। মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে করেই থাকি তাতে দোষটা কী—হাজার হোক আমার বন্ধু তো!'

মহেশবাবু গর্জন করে বললেন—'কে তোমার বন্ধু?'

প্রিনসিপাল বললেন—'মহেশ তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হোক, কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও, তোমায় সাসপেন্ড করলুম। আর মহেশ তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি—আমার কলেজে ভূতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।'

মহেশবাবু উত্তর দিলেন—'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।'

'তবে তোমাকেও সাসপেন্ড করলুম।'

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ করে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিনসিপালের হুকুম শুনে কোনও প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকলেই জানতেন যে তাঁদের কর্তার রাগ বেশিদিন থাকে না।

BanglaBook.org

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর প্রচণ্ড রাগ—হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়োচুরির দ্বারা! সে আবার ফিলসফি পড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশ কখনও পান নি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা তুচ্ছ কোঁচবকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু-ছত্র শ্লোক রচনা করে ফেলেন—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ ইত্যাদি। তার পর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না, কলেজের পোশাক না-ছেড়েই বড় একখানা আলজেব্‌রা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন—

হরিনাথ কুণ্ডু,
খাই তার মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বার বার ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে আদিকবি বাল্মীকির মতন ভাবলেন, হাঁ, উত্তম হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা বাধল। কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হন, আর রবীন্দ্রনাথই হন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডু মেলাতেই হবে—এ হল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন—

কুণ্ডু হরিনাথ
মুণ্ডু করি পাত।

হাঁ, এইবার মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী যদি একবার কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

হরিনাথ ওরে,
হবি তুই ম'রে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু স্থির করলেন—কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই প্রবন্ধ রচনা করবেন, তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তারপর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে দিয়ে ফের লিখলেন—

ওরে হরিনাথ,
তোরে করি কাত,
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে—'বাবু, চা হবে কী দিয়ে? দুধ তো ছিঁড়ে গেছে।'

মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'সেলাই করে নে।'

পিঠে মারি চড়,

BanglaBook.org

মুখে গুঁজি খড়।
জ্বেলে দেশলাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু আবার একী আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোনো লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে—

হরিনাথ ওরে
পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা
দেব মাটি চাপা।
সার হয়ে যাবি
ট্যাড়স ফলাবি।

মহেশবাবু আরও অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নাই। কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হালকা হল, তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিনদিন যেতে-না-যেতে প্রিনসিপাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বহাল হলেন, কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। সহকর্মীরা মিলনের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। হরিনাথ বরং একটু সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একেবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন।

কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হল—প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একতরফা বিচার করাটা ন্যায়সংগত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কী দিয়েছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশি বিলাতি বিস্তর বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরও প্রবল হল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কী বলেছেন আর কী দেখেছেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই, কারণ জন্তুর বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা করে মহেশবাবু বেজায় চটে উঠলেন। শেষটায় এমন হল যে ভূতের গুষ্ঠিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

পড়ে পড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাত্রে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূত তাঁকে ভেংচাচ্ছে। এমন স্বপ্ন দেখেন বলে নিজের ওপরও তাঁর রাগ হতে লাগল। ডাক্তার বললে—পড়াশুনা বন্ধ করুন, বিশেষ করে ঐ ভূতুড়ে বইগুলো—যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন? কিন্তু ঐসব বই পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগেতেই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা ঠিক নির্ণয় হল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত-আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তাঁর বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা বড় খারাপ। হরিনাথ তখনই হাতিবাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

BanglaBook.org

মহেশের আর দেরি নেই, মৃত্যুর ভয়ও নেই। বললেন—'হরিনাথ তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকেই অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার পাবে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ করো না। ফুলের মালা চন্দন-কাঠ ঘি এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে হাঁ, দু-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের সোরা আনানো আছে, তাও দিতে পার, চটপটে কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চললুম তা হলে।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। মহেশের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও বোধ হয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন। হরিনাথ মহাবিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেকে আনতে।

অনেকক্ষণ পরে দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে—'চুপ করে বসে আছেন যে বড়? সৎকারের ব্যবস্থা কী করলেন?'

হরিনাথ বললেন—'আমি একলা মানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।'

'ওই বেলাল্লা হতভাগার লাশ আমরা বইব? ইয়ারকি পেয়েছেন নাকি!' এই কথা বলেই তাঁরা সরে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে পড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠায় সাইনবোর্ড দেখেছেন—বৈতরণী সমিতি, ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্র শস্তায় সৎকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিনজন লোক জোগাড় হল! পনর টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন-সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হলে হরিনাথ আর তাঁর তিন সঙ্গী খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্নওয়ালিস স্ট্রিট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করছে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হতে লাগল, হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন। বৈতরণী সমিতির সর্দার ত্রিলোচন পাকড়াশী বুঝিয়ে দিলেন এমন হয়েই থাকে, মানুষ মরে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠল। খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়ছে, পা আর এগোয় না। পাকড়াশী বললেন,—ঢের ঢের বয়েছি মশাই, কিন্তু এমন জগদ্দল মড়া কখনও কাঁধে করি নি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি? পনর টাকায় হবে না মশায়, আরো পাঁচ টাকা চাই।'

হরিনাথ তাতেই রাজি, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হল। হরিনাথ ফুটপাতে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণীর তিন জন হাঁপাতে হাঁপাতে তামাক টানতে লাগল।

ওঠাবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজরে পড়ল কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছায়া তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কালো র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে—'এহ্ আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।'

BanglaBook.org

হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু-একবার আপত্তি জানালেন, কিন্তু শেষটায় রাজি হলেন। লোকটি কোন্ জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ মিত্তির ও-বিষয়ে চিরকাল সমদর্শী, এখন তো কথাই নেই। তা ছাড়া যে-লোক উপযাচক হয়ে শ্মশানযাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বললেন,—'কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখরা পাবে না, তা বলে রাখছি।'

আগন্তুক বললে—'বখরা চাই না।'

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হল না, তাঁর জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বললেন—'কুড়ি টাকার কাজ নয় বাবু, এ হল মোষের গাড়ির বোঝা, আরও পাঁচ টাকা চাই।'

এমন সময় আবার একজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কালো র‍্যাপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ দ্বিরুক্তি না করে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি।

মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু ঢোকে নি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন এসে হাজির, সেই কালো র‍্যাপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললেন, 'চল, চল।'

আবার যাত্রা, আরও একটু জোরে, তারপর ফের খাট নামাতে হল। এই যে, চতুর্থ বাহক এসে হাজির, সেই কালো র‍্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্যই এই তিন পহর রাতে পথে বেরিয়েছে। হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই, বললেন—'ওঠাও খাট, চল জলদি।'

চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ। আর বৈতরণী সমিতির তিনজন। এইবার গতি বাড়ছে, খাট হনহন করে চলছে। হরিনাথ আর তাঁর সঙ্গীদের ছুটতে হল। আরে অত তাড়াতাড়ি কেন, একটু আস্তে চল। কেই বা কথা শোনে!

ছুট-ছুট। 'আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, থাম থাম, বিড্ন স্ট্রিট ছাড়িয়ে গেলে যে। লোকগুলো কি শুনতে পায় না? ওহে পাকড়াশী, থামাও না ওদের?' কোথায় পাকড়শী? তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ করে সদলে পালিয়েছেন।

মহেশের খাট তখন তীরবেগে ছুটছে, হরিনাথ পাগলের মতন পিছুপিছু দৌড়াচ্ছেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, গোলদিঘি, বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ করে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নেই? রাস্তা কি ওপরে উঠেছে না নিচে নেমেছে? এ কি আলো না অন্ধকার? দূরে ও কী দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চিৎকার করছেন—'থাম, থাম।' ও কী! খাটের ওপর উঠে বসেছে কে? মহেশ? মহেশই তো। কী ভয়ানক! দাঁড়িয়েছে, ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছন ফিরে লেকচারের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কী বলছে?

দূর-দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—'হরিনাথ—ও হরিনাথ—ওহে হরিনাথ—'

'কি, কি? এই যে আমি।'

BanglaBook.org

'ও হরিনাথ—আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি—'

মহেশের খাট অগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'আছে আছে—'

হরিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটের পুলিশ তাঁকে দেখতে পেয়ে মাতাল বলে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি?'

'শুধু গয়ায়। পিণ্ডি দাদনখাঁ-এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি, পিণ্ডি ছিটকে ফিরে এল।'

'তার মানে?'

'মানে—মহেশ পিণ্ডি নিলেন না, কিংবা তাঁকে নিতে দিলে না।'

'আশ্চর্য!—মহেশ মিত্তিরের টাকাটা?'

'সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজ হয় নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোনো ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হোক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশফান্ডের নাম কেউ করে না।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভূতের রাজা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ক

সরকারি কাজে বিদেশে থাকি। ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি।

সাঁওতাল পরগনার যে-জায়গায় আমার কর্মস্থল ছিল, সেখান থেকে রেলস্টেশন যেতে হলে প্রায় ত্রিশ মাইলেরও উপর পথ পার হতে হবে। পাহাড় পথ—এক এক মাইল হচ্ছে দু-তিন মাইলের ধাক্কা। তার ওপরে রাতের বেলায় পথে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গেও আলাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। সকালবেলায় বেরুলেও মাঝপথে সন্ধ্যা হবেই। তখন একটা আশ্রয়ের দরকার।

মাঝপথের কাছাকাছি স্থানীয় রাজার একটি শিকার-কুঠি ছিল। রাজা বা তাঁর বন্ধুরা শিকারে বেরুলে এই কুঠি হত তাঁদের প্রধান আস্তানা। রাজার ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ ছিল। তাঁকে গিয়ে অনুরোধ জানালুম, শিকার-কুঠিতে একটা রাতের জন্যে আমাকে মাথা গোঁজবার জায়গা দিতে হবে। ম্যানেজার বললেন, এখন শিকারের সময় নয়, কুঠি খালি পড়ে আছে। আপনি এক রাত কেন, এক মাস থাকতে পারেন। এখানকার পুলিশ সুপারিনটেডেন্ট টেলর সাহেবও আজ রাতটা সেখানে বিশ্রাম করবেন। কুঠিতে আরো ঘর আছে, আপনারও থাকবার অসুবিধা হবে না। কিন্তু—'

—কিন্তু কী?

—কিন্তু আপনি সেখানে রাতে কাটাতে পারবেন কি?

—কেন পারব না?

—লোকের মুখে শুনি, কুঠিতে নাকি অপদেবতার ভয় আছে।

—অপদেবতা?

—হ্যাঁ, অপদেবতা ছাড়া আর কী বলব? কুঠির পাশেই শালবনের ভেতরে সাঁওতালিদের এক ভূতুড়ে দেবতা আছে। সেই দেবতা নাকি ভূতের রাজা। তার ভয়ে সাঁওতালিরা পর্যন্ত সন্ধ্যার পর ও-পাড়া মাড়ায় না। তারা

হেমেন্দ্রকুমার রায়
১৮৮৮—১৯৬
শিশুসাহিত্যিক হিসাবে বাংলাসাহিত্যে খ্যাতিমান; ছোটদের পত্রিকা রংমশাল-এর সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গল্প -উপন্যাসও লিখেছেন। বিশেষত ছোটদের জন্য রোমাঞ্চকার গল্প-উপন্যাসের লেখক হিসবে জনপ্রিয়। মাসিক পত্রিকা নাচঘর-এর সম্পাদক। তাঁর বিখ্যাত বই *যখের ধন*, *আবার যখের ধন*, *অমাবস্যার রাত*, *মায়াকান্না*, *যাঁদের দেখেছি*, *বাংলার রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার*। গীতিকার হিসাবেও খ্যাতি ছিল। শিশিকুমার ভাদুড়ির সীতা নাটকের নৃত্য পরিচালক।

বলে, তাদের দেবতা নাকি রাতের বেলায় কুঠির ভেতরে ঘুমোতে আসে।

আমি হো হো করে হেসে উঠে বললুম, 'বেশ তো, মানুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে রাত্রিবাস করব, এটা তো মস্ত পুণ্যের কথা! আমি রাজি!'

ম্যানেজার বললেন, 'আমি অবশ্য ওসব ছেলেমানুষি কথায় ততটা বিশ্বাস করি না। তবু বলা তো যায় না—'

যথাসময়ে ডুলিতে চড়ে রওনা হয়ে সন্ধ্যার কিছু আগেই শিকার-কুঠিতে পৌঁছলুম।

ডুলি-বেয়ারারা বলে গেল, মাইল তিনেক তফাতে একটা গাঁয়ে গিয়ে তারা আজকের রাতটা কাটাবে; কাল সকালে আবার ডুলি নিয়ে আসবে।

কুঠির বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ারে বসে টেলর সাহেব তামাকের পাইপ টানছিলেন। সাহেবের সঙ্গে আমারও বেশ পরিচয় ছিল।

আমাকে দেখে সাহেব বললেন, 'এই যে, গুপ্ত যে! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি। তুমি?

—আমি হোমে যাচ্ছি, তুমি কি আজ এখানে থাকবে?

—হ্যাঁ, সাহেব।

—বেশ, বেশ, দুজনে একসঙ্গে রাত কাটানো যাবে, এ ভালোই হল।

—দুজন কেন সাহেব, তিনজন।

—তিনজন আবার কে? তুমি কি আমার আর্দালির কথা বলছ? তাকে আমি মানুষের মধ্যে গণ্য করি না।

—না সাহেব, তোমার আর্দালির কথা বলছি না।

—তবে কি কুঠির দ্বারবানের কথা ভাবছ? না, সে রাত্রে এখানে থাকে না।

—না না, আমি দ্বারবানের কথা বলছি না। ....তুমি কি শোন নি সাহেব, সাঁওতালিদের এক দেবতা রাত্রে আমাদের সঙ্গী হতে পারেন?

টেলর সাহেব হেসে বললে, 'ও হো, শুনেছি বটে। তা সে-রূপকথার একবর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। তুমি কর না কি?'

—করলে একলা এখানে রাত কাটাতে আসি?

টেলর পাইপে তিন-চারটে টান মেরে বললে, দেখ গুপ্ত। সাঁওতালিদের এই দেবতাটিকে আমি দেখেছি। এমন বীভৎস দেবতা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তাকে দেখে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে।

—পছন্দ হয়েছে?

—হ্যাঁ। তাই ঠিক করেছি, কাল যাবার সময় তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ইংল্যান্ডে আমার বাড়ির বৈঠকখানায় তাকে সাজিয়ে রেখে দেব। আমার বন্ধুরা তাকে দেখলে তারিফ করবেন।

আমি হেসে বললুম, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে, কাল থেকে দেবতা আর কুঠির ভেতরে শুতে আসবেন না। তবে এই বেলা তাঁকে একবার দর্শন করে আসি।... তার আড্ডা কোথায়?'

টেলর আঙুল দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঐ যে, ঐখানে। মিনিট খানেকের পথ।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। কুঠির পাশেই অনেকগুলো শালগাছ দলবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ছায়ায় একটা পাথুরে ঢিপির উপরে মানুষের মতো উঁচু একটা মূর্তিকে দেখতে পেলুম।

মূর্তিটা রং-করা কাঠের। তার দেহ মাপে মানুষের মতো বটে, কিন্তু তার মুখ দানবের মতো প্রকাণ্ড। আর সে মুখের ভাব কী ভয়ঙ্কর! দেখলেই বুকের কাছটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে থাকে।

BanglaBook.org

মাথার চুলগুলো সাপের মতন ঝুলছে, কানদুটো হাতির মতন, মুখখানা খানিক সিংহ আর খানিক ভাল্লুকের মতন, দু-দুটো গোল গোল কাচের চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। হাঁ-করা বড় বড় দাঁতওলা মুখের ভিতর থেকে রাঙা টকটকে, লকলকে জিভের আধখানা বাইরে বেরিয়ে পড়ে ঝুলছে! কাঁধ ও মুখের মাঝখানে গলাটা দেখলে মনে হয়, কে যেন একখানা লিকলিকে সরু বাঁখারির উপরে মুখখানাকে বসিয়ে দিয়েছে। হাত দুখানা বাঘের থাবার মতো। কোমরের কাছ থেকে পা পর্যন্ত দেহের কোনো অঙ্গ দেখা যাচ্ছে না। কাঠকে খুদে আর কোনো অঙ্গই গড়া হয় নি। মূর্তির গায়ের রং আলকাতরার মতন কালো আর মুখের রং খানিক শাদা, খানিক তামাটে ও খানিক হলদে।

ভাবলুম, এ মূর্তি যদি সত্য সত্য রাত্রে কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসে, তাহলে আমাদের ঘুম এ জীবন আর ভাঙবে কি?

ধীরে ধীরে কুঠির দিকে ফিরে এলুম। টেলর পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিল। আমাকে দেখে সে বললে, 'গুপ্ত, খুব ঝড়-বৃষ্টি আসছে, ঐ দেখ!'

সত্য কথা। পশ্চিমের আকাশখানা আচম্বিতে ঠিক যেন কালো কষ্টিপাথর হয়ে গেছে। ঝড় উঠতে আর দেরি নেই!

খ

ঝড় এসে সমস্ত অরণ্যকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে।

অনেক রাত। টেলরের নিমন্ত্রণ নিয়ে, তার সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ আগে 'ডিনার' খেয়েছি। এখন টেলর তার ঘরে শুয়ে হয়তো দিব্য আরামে নিদ্রা দিচ্ছে; কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ভূত-টুৎ কিছু মানি না;—তবু কেন জানি না, মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করছে! রাজার সেই ম্যানেজারের কথাগুলো আর সাঁওতালি-দেবতার সেই ভয়ানক মুখখানা মনের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত আনাগোনা করছে। যত তাদের ভুলবার চেষ্টা করি, আজেবাজে নানান কথা ভেবে—তত তারা মনের ওপরে চেপে বসে নরম মাটির উপর ভারী পায়ের দাগের মতো।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝম্-ঝম্-ঝম্-ঝম্! মাঝে মাঝে ঝোড়ো, দমকা হাওয়া হা-হা-হা-হা করে উঠছে!—যেন কোনো আহত আত্মার কান্না! চারিদিক থেকে বনের গাছপালাগুলো মর্-মর্-মর্-মর্ করে যেন কোনো শত্রুকে অভিশাপ দিচ্ছে! তারই ভিতর থেকে একবার শুনলাম হায়েনার অট্টহাসি, একবার শুনলাম শৃগাল দলের মড়াকান্না, একবার শুনলাম বাঘের গর্জন!

হঠাৎ আমার ঘরের দরজার উপর দুম্-দুম্ করে আঘাত হল! ধড়মড় করে আমি বিছানার উপরে উঠে বসলাম—সে কি আসছে? সে কি আসছে?

দরজার উপরে আর কোনো আঘাত হল না। ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় দরজা নড়ে উঠেছে নিশ্চয়! নিজের কাপুরুষতার জন্য মনে মনে নিজেই লজ্জিত হয়ে আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি; এমন সময় বাহির থেকে খন্‌খনে ঝাঁঝালো গলায় গান শুনলুম:

'লোগোবুরু ধীরকো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

এ তো সাঁওতালি ভাষা। নিশ্চয়ই কোনো সাঁওতালি গান গাইছে! কিন্তু এত রাত্রে, এমন ঝড়-বাদলে, এই হিংস্র জন্তুভরা গভীর অরণ্যের মধ্যে কে সাঁওতালি মনের আনন্দে শখ করে গান গাইতে আসবে?

আবার দরজার উপর ঘন ঘন আঘাত হল—এবারে আরো জোরে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল! এ তো ঝড়ের ধাক্কা নয়, এ যে সত্যসত্যই কে দরজা ঠেলছে আর

BanglaBook.org

ঠেলছে!...তবে কি সে এসেছে? তবে কি সে এখানে ঘুমোতে এসেছে?

আবার গান শুনলুম! এবারে আমার খুব কাছে, একেবারে কুঠির বারান্দার উপরে! সেই তীব্র খন্‌খনে গলার গান!

'লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

হঠাৎ উলটো বিপদ! কুঠির ভিতর দিককার দরজায় ঘন ঘন আঘাত! ভিতরে বাহিরে বিপদ দেখে প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছি, এমনি সময়ে শুনলাম: 'গুপ্ত! গুপ্ত! ভগবানের দোহাই, দরজা খোল—দরজা খোল শিগ্‌গির।'

এ তো টেলরের গলা!...আ! বাঁচলুম! তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম।

টেলর হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল—তার চোখমুখ পাগলের মতো, তার হাতে বন্দুক।

আমি তাকে দুহাতে চেপে বললুম, 'মি. টেলর, হয়েছে কী? এতরাত্রে কী দরকার তোমার?'

টেলর দেয়ালে ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'গুপ্ত, আমার ঘরের দরজায় ক্রমাগত কে লাথি মারছে আর গান গাইছে! তুমিই কি আমার ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকছিলে আমাকে?'

আমি বললুম, 'না, না! আমি বিছানা ছেড়ে এক পাও নড়ি নি!' কিন্তু আমারও ঘরের দরজায় আবার দু-বার প্রচণ্ড আঘাত হল, ...সঙ্গে-সঙ্গে সেই গান:

'লোগোবুরু ধীর্‌কা সিনিন ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

আচম্‌কা আবার একটা ঝড়ের ঝাপটা এসে দরজা-জানালার ওপরে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে একটা খড়খড়ি দুম্‌দাম করে খুলে গেল!

... সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে স্পষ্ট দেখলাম, বারান্দার উপরে কার একটা জীবন্ত ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে! কে ও? কে ও? ও কি সেইই—যে প্রতি রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসে? আমার মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল!

টেলরের বন্দুক ধ্রুম করে গর্জে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিটা সাঁৎ করে বারান্দার একপাশে, আমাদের চোখের আড়ালে সরে গেল।

টেলর চেঁচিয়ে উঠল, 'গুপ্ত! গুপ্ত! জানলা বন্ধ করে দাও—জানলা বন্ধ করে দাও!'

পা চলতে চাইছিল না! কিন্তু পাছে টেলর মনে করে বাঙালি কাপুরুষ, সেই ভয়ে নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে দমন করে আমি জানলার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করে দিলুম।

টেলর টলতে টলতে আমার বিছানার উপরে বসে পড়ে বললে, 'গুপ্ত—! কিছু মনে কোরো না, আমি আজ তোমার বিছানাতেই তোমার সঙ্গে রাত কাটাব।'

বাইরে আবার কে গান গাইলে:

'লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

গ

সকালবেলা। কিন্তু তখনো সমানভাবে বৃষ্টি ঝরছে আর ঝরছেই। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সারা আকাশখানা যেন কালো মেঘের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা; সূর্যকে যেন আজ কোনো অন্ধকার রাহু গ্রাস করে ফেলেছে। যতদূর নজর চলে খালি দেখা যায় অগণ্য শ্যামল তরুর বিরাট সভা আর শৈলমালার গর্বোন্নত-শিখর এবং তারই ভিতরে এসে

BanglaBook.org

মাথার চুলগুলো সাপের মতন ঝুলছে, কানদুটো হাতির মতন, মুখখানা খানিক সিংহ আর খানিক ভাল্লুকের মতন, দু-দুটো গোল গোল কাচের চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। হাঁ-করা বড় বড় দাঁতওলা মুখের ভিতর থেকে রাঙা টকটকে, লকলকে জিভের আধখানা বাইরে বেরিয়ে পড়ে ঝুলছে! কাঁধ ও মুখের মাঝখানে গলাটা দেখলে মনে হয়, কে যেন একখানা লিকলিকে সরু বাঁখারির উপরে মুখখানাকে বসিয়ে দিয়েছে। হাত দুখানা বাঘের থাবার মতো। কোমরের কাছ থেকে পা পর্যন্ত দেহের কোনো অঙ্গ দেখা যাচ্ছে না। কাঠকে খুদে আর কোনো অঙ্গই গড়া হয় নি। মূর্তির গায়ের রং আলকাতরার মতন কালো আর মুখের রং খানিক শাদা, খানিক তামাটে ও খানিক হলদে।

ভাবলুম, এ মূর্তি যদি সত্য সত্য রাত্রে কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসে, তাহলে আমাদের ঘুম এ জীবন আর ভাঙবে কি?

ধীরে ধীরে কুঠির দিকে ফিরে এলুম। টেলর পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিল। আমাকে দেখে সে বললে, 'গুপ্ত, খুব ঝড়-বৃষ্টি আসছে, ঐ দেখ!'

সত্য কথা। পশ্চিমের আকাশখানা আচম্বিতে ঠিক যেন কালো কষ্টিপাথর হয়ে গেছে। ঝড় উঠতে আর দেরি নেই!

খ

ঝড় এসে সমস্ত অরণ্যকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে।

অনেক রাত। টেলরের নিমন্ত্রণ নিয়ে, তার সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ আগে 'ডিনার' খেয়েছি। এখন টেলর তার ঘরে শুয়ে হয়তো দিব্য আরামে নিদ্রা দিচ্ছে; কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ভূত-টুৎ কিছু মানি না;—তবু কেন জানি না, মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করছে! রাজার সেই ম্যানেজারের কথাগুলো আর সাঁওতালি-দেবতার সেই ভয়ানক মুখখানা মনের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত আনাগোনা করছে। যত তাদের ভুলবার চেষ্টা করি, আজেবাজে নানান কথা ভেবে—তত তারা মনের ওপরে চেপে বসে নরম মাটির উপর ভারী পায়ের দাগের মতো।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝম্-ঝম্-ঝম্-ঝম্! মাঝে মাঝে ঝোড়ো, দমকা হাওয়া হা-হা-হা-হা করে উঠছে!—যেন কোনো আহত আত্মার কান্না! চারিদিক থেকে বনের গাছপালাগুলো মর্-মর্-মর্-মর্ করে যেন কোনো শত্রুকে অভিশাপ দিচ্ছে! তারই ভিতর থেকে একবার শুনলাম হায়েনার অট্টহাসি, একবার শুনলাম শৃগাল দলের মড়াকান্না, একবার শুনলাম বাঘের গর্জন!

হঠাৎ আমার ঘরের দরজার উপর দুম্-দুম্ করে আঘাত হল! ধড়মড় করে আমি বিছানার উপরে উঠে বসলাম—সে কি আসছে? সে কি আসছে?

দরজার উপরে আর কোনো আঘাত হল না। ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় দরজা নড়ে উঠেছে নিশ্চয়! নিজের কাপুরুষতার জন্য মনে মনে নিজেই লজ্জিত হয়ে আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি; এমন সময় বাহির থেকে খন্‌খনে ঝাঁঝালো গলায় গান শুনলুম:

'লোগোবুরু ধীরকো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

এ তো সাঁওতালি ভাষা। নিশ্চয়ই কোনো সাঁওতালি গান গাইছে! কিন্তু এত রাত্রে, এমন ঝড়-বাদলে, এই হিংস্র জন্তুভরা গভীর অরণ্যের মধ্যে কে সাঁওতালি মনের আনন্দে শখ করে গান গাইতে আসবে?

আবার দরজার উপর ঘন ঘন আঘাত হল—এবারে আরো জোরে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল! এ তো ঝড়ের ধাক্কা নয়, এ যে সত্যসত্যই কে দরজা ঠেলছে আর

BanglaBook.org

ঠেলছে!...তবে কি সে এসেছে? তবে কি সে এখানে ঘুমোতে এসেছে?

আবার গান শুনলুম! এবারে আমার খুব কাছে, একেবারে কুঠির বারান্দার উপরে! সেই তীব্র খন্‌খনে গলার গান!

'লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

হঠাৎ উলটো বিপদ! কুঠির ভিতর দিককার দরজায় ঘন ঘন আঘাত! ভিতরে বাহিরে বিপদ দেখে প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছি, এমনি সময়ে শুনলাম: 'গুপ্ত! গুপ্ত! ভগবানের দোহাই, দরজা খোল—দরজা খোল শিগ্‌গির।'

এ তো টেলরের গলা!...আ! বাঁচলুম! তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম।

টেলর হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল—তার চোখমুখ পাগলের মতো, তার হাতে বন্দুক।

আমি তাকে দুহাতে চেপে বললুম, 'মি. টেলর, হয়েছে কী? এতরাত্রে কী দরকার তোমার?'

টেলর দেয়ালে ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'গুপ্ত, আমার ঘরের দরজায় ক্রমাগত কে লাথি মারছে আর গান গাইছে! তুমিই কি আমার ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকছিলে আমাকে?'

আমি বললুম, 'না, না! আমি বিছানা ছেড়ে এক পাও নড়ি নি!' কিন্তু আমারও ঘরের দরজায় আবার দু-বার প্রচণ্ড আঘাত হল, ...সঙ্গে-সঙ্গে সেই গান:

'লোগোবুরু ধীর্‌কা সিনিন ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

আচম্‌কা আবার একটা ঝড়ের ঝাপটা এসে দরজা-জানালার ওপরে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে একটা খড়খড়ি দুম্‌দাম করে খুলে গেল!

... সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে স্পষ্ট দেখলাম, বারান্দার উপরে কার একটা জীবন্ত ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে! কে ও? কে ও? ও কি সেইই—যে প্রতি রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসে? আমার মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল!

টেলরের বন্দুক ধ্রুম করে গর্জে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিটা সাঁৎ করে বারান্দার একপাশে, আমাদের চোখের আড়ালে সরে গেল।

টেলর চেঁচিয়ে উঠল, 'গুপ্ত! গুপ্ত! জানলা বন্ধ করে দাও—জানলা বন্ধ করে দাও!'

পা চলতে চাইছিল না! কিন্তু পাছে টেলর মনে করে বাঙালি কাপুরুষ, সেই ভয়ে নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে দমন করে আমি জানলার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করে দিলুম।

টেলর টলতে টলতে আমার বিছানার উপরে বসে পড়ে বললে, 'গুপ্ত—! কিছু মনে কোরো না, আমি আজ তোমার বিছানাতেই তোমার সঙ্গে রাত কাটাব।'

বাইরে আবার কে গান গাইলে:

'লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

গ

সকালবেলা। কিন্তু তখনো সমানভাবে বৃষ্টি ঝরছে আর ঝরছেই। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সারা আকাশখানা যেন কালো মেঘের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা; সূর্যকে যেন আজ কোনো অন্ধকার রাহু গ্রাস করে ফেলেছে। যতদূর নজর চলে খালি দেখা যায় অগণ্য শ্যামল তরুর বিরাট সভা আর শৈলমালার গর্বোন্নত-শিখর এবং তারই ভিতরে এসে

BanglaBook.org

পড়ছে তীরের চকচকে ফলার মতো বৃষ্টির অশ্রান্ত ধারাগুলো। কোথাও পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ বা কোনো জীবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—পথের উপর দিয়ে ক্রুদ্ধ জলস্রোত যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুকে বেগে আক্রমণ করতে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ বারান্দার এককোণে চোখ গেল। কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একজন শুয়ে রয়েছে!

কাছে গিয়ে ডাকলুম, 'এই! কে তুই?'

বারকয়েক ডাকাডাকির পর কাপড়ের ভিতর তেকে একখানা সাঁওতালি মুখ বেরুল।

—কে তুই?

—আমি ঠাকুরের পূজারী।

—ঠাকুর! কে ঠাকুর?

—যিনি ঐ শালবনে থাকেন।

—এখানে কী করছিস?

—ঠাকুর রোজ রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসেন, তাই আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসি।

—কাল রাত্রে তাহলে তুই-ই দরজা ঠেলছিলি?

—আমিও ঠেলছিলুম, ঠাকুরও ঠেলছিলেন।

—আর গান গাইছিল কে?

—আমি।

এমন সময়ে টেলরও ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তাকে সব কথা খুলে বললুম। টেলর তো শুনেই মহাখাপ্পা, ঘুসি পাকিয়ে পুরুতের দিকে ছুটে যাবামাত্র সে একলাফে বারান্দার রিং টপ্‌কে বাইরে পড়ে, বনের ভিতরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

টেলর বললে, 'রাস্কেলকে ধরতে পারলে একবার দেখিয়ে দিতুম! ওহ্, সারারাত কী অশান্তিতেই কেটেছে!'

আমি বললুম, 'যাক, যা হবার তা তো হয়ে গেছেই। এখন আমাদের কী উপায় হবে! কুঠির দ্বারবানও এল না, ডুলি-বেয়ারারাও এই দুর্যোগে বোধ হয় আসবে না। আমরা যাব কেমন করে?'

টেলর বললে, 'আমাকে যেমন করেই হোক আজ যেতে হবেই—বোম্বে যাবার টিকিট পর্যন্ত আমি কিনে ফেলেছি। উপায় থাকলে তোমাকেও আমি স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতুম। কিন্তু আমার 'টু-সিটার' গাড়ি—আমি, আমার আর্দালি, তুমি, তোমার চাকর আর তোমার মালপত্তর অতটুকু গাড়িতে তো ধরবে না। কাজেই তোমাকে এখানে ফেলে রেখেই আমাকে যেতে হবে। ...আর্দালি!'

টেলরের আর্দালি এসে সেলাম করলে।

টেলর বললে, 'আমার মালপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে তোলো। তারপর শালবন থেকে সেই কাঠের পুতুলটাও তুলে নিয়ে এস।'

আমি বললুম, 'তুমি কি সত্যি সত্যিই ঐ পুতুলটা ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে চাও?'

টেলর বললে, 'নিশ্চয়। আমার যে কথা সেই কাজ!'

ঘ

আবার রাত এল। বৃষ্টি এখনো থামে নি, আমি এখনো কুঠিতে বন্দি হয়ে আছি।

টেলর চলে গেছে এবং যাবার সময়ে সাঁওতালিদের ভূতের রাজাকেও সঙ্গে করে নিয়ে

BanglaBook.org

গেছে। সে আর এই কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসবে না।

চোখে ঘুম আসছিল না। একখানা ইংরেজি নভেল বার করে পড়তে বসলুম। ঘণ্টা-দেড়েক পরে তন্দ্রার আবেশ এল। আলোটা কমিয়ে দিয়ে শয়নের উপক্রম করছি—এমন সময়ে শুনলুম বাইরের সিঁড়ির উপরে আওয়াজ হল ঠক্-ঠক্, ঠক্-ঠক্!

ঠিক যেন কাঠের আওয়াজ! ঠক্ ঠক্ করতে করতে আওয়াজটা আমার ঘরের কাছ বরাবর এল, তারপর দরজার ওপরে শুনলুম ধাক্কার পর ধাক্কা! কী আপদ! টেলর তো পুতুলটাকে নিয়ে কোন্ সকালে বিদায় হয়েছে, এ আবার কে জ্বালাতে এল!

নিশ্চয়ই সেই সাঁওতালি পুরুত ব্যাটা! সে হতভাগা রোজ রাত্রে এইখানে আরাম করে ঘুমায় আর চারিদিকে রটিয়ে দেয়—কুঠির ভিতরে ভূতের রাজা শুতে আসেন।

ধাক্কার জোর ক্রমেই বেড়ে চলল।... একবার ভাবলুম দরজা খুলে পুরুতটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিই। তারপর মনে হল, সে কাজ ঠিক হবে না। এই দুর্যোগে বিজনে জঙ্গলের ভিতরে রাত্রে একলা আমি এখানে আছি, যদি কোনো দুষ্ট লোক কু-মতলবে এসে থাকে?

বন্দুকটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজার এক জায়গায় একটা ছ্যাঁদা ছিল, বন্দুকটার নল সেইখানে রেখে চেঁচিয়ে বললুম, 'কে আছ চলে যাও নইলে এখনই আমি বন্দুক ছুড়ব!'

কোনো জবাব নেই, দরজার ওপর ধাক্কাও থামল না!

'এখনও আমার কথা শোনো, নইলে—'

বাইরে বিশ্রী গলায় কে হাসতে লাগল—হিহিহিঃ হিহিহিঃ হিহিঃ হিহিহিঃ—আমি বন্দুকের গোড়া টিপলুম—সঙ্গে সঙ্গে দরজার ওপরে ধাক্কাও থেমে গেল!

ঠক্ ঠক্ করে একটা আওয়াজ ঘরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল—তারপর কুঠির সিঁড়ির উপরে শব্দ শুনলাম ঠক্ ঠক্, ঠক্! খানিক বাদে অনেক দূর থেকে আবার সেই বিশ্রী হাসি শোনা গেল, হিহিহিঃ হিহিহিঃ, হি হি হি হি হি হি—

সে হাসি অমানুষিক শরীরের রক্ত জল করে দেয়।

৬

শেষ রাতে জল ধরে গেল।

সকালে দরজা খুলতেই খুলতেই কাঁচা সোনার মতো কচি রোদ এসে ঘরখানা যেন হাসিতে ভরিয়ে তুলল! রোদ দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল।

বারান্দায় বেরিয়ে দেখি এককোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে।

তেড়ে গিয়ে মারলুম তাকে এক ধাক্কা! ধড়মড় করে সে উঠে বসল।

সেই সাঁওতালি পুরুতটা।

ক্রুদ্ধস্বরে বললুম, কাল আবার কী করতে এখানে এসেছিলি? ভারি চালাকি পেয়েছিস, না?

লোকটার মুখের ভাব একটুও বদলাল না। শান্তস্বরে বললে, 'আমার ঠাকুর কাল এখানে ঘুমোতে এসেছিলেন, আমিও তাই এসেছিলুম।'

'তোর ঠাকুর কোথায়? সাহেব তো তাকে নিয়ে চলে গেছে—!'

'আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন সেইখানেই আছেন।'

কুঠি থেকে বেরিয়ে পড়ে ছুটে পাশের শালবনে গিয়ে হাজির হলুম। সবিস্ময়ে দেখলুম, ভূতের রাজা চোখ পাকিয়ে লকলকে জিভ বার করে ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে!

BanglaBook.org

আর, আর, ও কী? মূর্তির পেটের উপরে একটা গর্ত—ঠিক যেন বন্দুকের গুলির দাগ! গর্তের চারপাশে রক্ত জমাট হয়ে আছে—মূর্তির আরো নানা জায়গাতেও রক্তের চিহ্ন!

তবে কি আমার বন্দুকের গুলিই—ভাবতে পারলুম না; মূর্তির দিকে আর তাকাতে পারলুম না,—কেমন একটা অজানা ভয়ে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল,—প্রাণপণে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম!

চ

কলকাতায় ফিরে এসেই খবরের কাগজে এই বিবরণ পড়লুম :

'সাঁওতাল পরগনার পুলিশ-সুপারিনটেন্‌ডেন্ট মি. জে টেলর কর্ম হইতে অবসর লইয়া বিলাত যাইতেছিলেন, কিন্তু পথের মধ্যে এক বিপদে পড়িয়া খুব সম্ভব তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন। স্থানীয় জঙ্গলের ভিতরে তাঁহার মোটরগাড়ি পাওয়া গিয়াছে। মোটরের উপরে, ভিতরে ও চারপাশে রক্তের দাগ, কিন্তু মি. টেলর ও তাঁহার আর্দালির কোনোই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ সন্দেহ করিতেছেন মি. টেলর ও তাঁহার আর্দালিকে ব্যাঘ্র বা অন্য কোনো হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়াছে। নিকটস্থ জঙ্গলে এক নরখাদক ব্যাঘ্রের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।'

সেই ভূতুড়ে মূর্তির গায়ে যে-রক্তের দাগ লেগেছিল, তাহলে সে-রক্ত হচ্ছে হতভাগ্য টেলরের আর তার আর্দালির গায়ের রক্ত?

এবং সেই সাঁওতালি পুরুতটাই নিশ্চয়ই কোনো গতিকে খবর পেয়ে ভূতের রাজাকে আবার শালবনে ফিরিয়ে এনেছিল?

মনকে এই বলে প্রবোধ দিলুম বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলুম শিকার-কুঠিতে আর কখনো রাত্রিবাস করব না! কিসে কী হয়, কে জানে?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গঙ্গাধরের বিপদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে।

সে-সময় মশলা-পোস্তায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোটখাটো একখানা মশলার দোকান ছিল।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলি জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেকদিনের দোকান, যে-সময়ের কথা বলছি, গঙ্গাধরের বয়স তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগত প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। দোকানঘরের ভাড়া দু-মাসের বাকি, মহাজনের দেনা ঘাড়ে—দুপুরবেলা দোকানে বসে খেলো-হুঁকো হাতে সে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধ্যার সময় গোমস্তা আসবে ভাড়া নিতে বলে শাসিয়ে গিয়েছে। কী বলা যায় তাকে!

এক পুরনো পরিচিত মহাজনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারি মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে কয়েকবার টাকা নিয়েছে, শোধও করেছে—কিন্তু সুদের হার বড় বেশি বলে ইদানীং বছরকয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায়নি!

ভেবেচিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হল। সুদ বেশি বলে আর উপায় কী? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যার মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁর নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে, গল্পগুজব করতে দেরি হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয় এসে ট্রাম ধরবে, হনহন করে হেঁটে আসছে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বলল—এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জেরা—

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকল, সেখানে কতকগুলো গাছপালায় বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েছে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হল, এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এল। ওই গাছগুলোর তলায় সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৪—১৯৫০
২৪ পরগণা জেলার মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। শৈশব-কৈশোর কাটে চরম দারিদ্র্যে। পিতার পেশা কথকতা ও পৌরহিত্য। ১৯১৪ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ। ১৯১৬ সালের আই পরীক্ষার ফলাফলও একই রকম। ১৯১৮তে ডিস্টিংশন সহ বি এ পাশ। পেশা ছিল শিক্ষকতা। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ত্রয়ীর পর বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম। গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীবনাচরণের সজীব চিত্র তাঁর উপন্যাসের প্রাণ। প্রকৃতি ও মানবজীবন তাঁর সাহিত্যে এক অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে মূর্ত। মধুর ও কাব্যধর্মী ভাষা তাঁর সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ। *পথের পাঁচালী* তাঁর বিখ্যাততম উপন্যাস। *অপরাজিত*, *ইছামতী*, *আরণ্যক* উপন্যাসের মধ্যে সেরা। *মেঘমল্লার*, *মৌরিফুল*, *কিন্নর দল* ছোটগল্প গ্রন্থগুলোর মধ্যে সেরা।

লোকটা খুব লম্বা, মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েছে, মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। পরনে টিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নিচু করে হিন্দিতে ও বাংলায় মিলিয়ে বলল—বাবু, শস্তায় মাল কিনবেন?

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বলল—কী মাল?

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বললে—এখানে কথা হবে না বাবু, পুলিশ ঘুরছে, আমার সঙ্গে আসুন—

ঝুপসি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বললে—জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট মাল—লুকিয়ে দেব।

গঙ্গাধর চমকে উঠল।

সে কখনো ও-ব্যবসা করে নি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কী সর্বনেশে জিনিস! ভালো লোকের পাল্লায় পড়েছে! না, সে কিনবে না।

লোকটা সম্ভবত পাঞ্জাবি মুসলমান! বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। সে অনুনয়ের সুরে বলল—বাবু, আপনি নিন। আপনার ভালো হবে! সিকি কড়িতে দেব—আমার মুশকিল হয়েছে, আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্ছি নে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারি নে, পুলিশের ভয় তো আছে। কেউ কথা কইছে না আমার সঙ্গে, সেই হয়েছে আরও মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিশের ভয় হল যে কেন বাবু, তা বুঝি নে—আগে যারা এ-ব্যবসা করত, তাদের কাছে যাচ্ছি। তারা আমার দিকে চেয়েও দেখছে না। আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন, পরে দামদস্তুর হবে।

লোকটার গলার সুরে একটা কী শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজল!—কোকেনের ব্যবসাতে মানুষে রাতারাতি বড়মানুষ হয়েছে বটে! বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক-না!

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখল যে, লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়ে ছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে, এই ভয়ে বেশি জোরে ডাকতেও সাহস পেল না! চাপা-গলায় বাংলা-হিন্দিতে ডাকল—কোথায় গিয়া ও খাঁ-সাহেব! এদিকে-ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁ-সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বলল—জলদি বল, রাত হো গিয়া। অনেক দূর যানে হোগা।

কী একটা যেন ঢাকবার জন্য লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করছে! বলল—আমার সঙ্গে এস, মাল দেখাব।

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেকদূরে গেল। যে-সময়ের কথা বলছি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকো ডাঙায় কাদার ওপর পড়ে আছে, দু-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদাকাঁটার বন, পেছনে অনেকদূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁ-সাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বলল—আমায় দেখতে পাচ্ছ তো?

কেন পাব না? এমন বয়েস এখনও হয় নি যে, এই সন্ধেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না।

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করল—তোমার ডেরা কোথায় খাঁ-সাহেব?

লোকটা চকিতে পিছন ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—কেন, সে তোমার কী দরকার? পুলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাক যদি, তবে ভাবো হবে না জেনো। মাল দেব, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে—আমার বাসার খোঁজে তোমার কী কাজ?

BanglaBook.org

লোকটার চোখের চাউনি কী অদ্ভুত ! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করল। মুখ ভালো দেখা যায় না—কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠল না ! সঙ্গে তার টাকা রয়েছে, এ-অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যাবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েছে ! লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইছে, তখন আর চারা নেই। বিশেষত সে যে ভয় পেয়েছে, এটা না-দেখানোই ভালো। দেখালে, বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বৈ কমবে না ! ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূরে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটি গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখল, গুদামঘরের আশেপাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়—সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হল গুদামঘরটা পুরনো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে ! বাঁশের বেড়া খসে পড়েছে, জায়গায় জায়গায় চালের খোলা উড়ে গিয়েছে, মাঝে মাঝে সামনের দোরটা উই-ধরা,—ভেঙে পড়তে চাইছে যেন !...

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হল ! কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায় ? এ-রকম জায়গায় একা মানুষে আসে—বিশেষ করে, এতগুলো টাকা সঙ্গে করে ? সে আসত না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙ্গাল দেশ থেকে নতুন আসে নি। কিন্তু ওই লোকটার কথার সুরে কী জাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেছে, সাধ্য ছিল না যে, সে ছাড়ায় ! এ-কথা এখন তার মনে হল।...

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁ-সাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দে ও এমন অদ্ভুত ধরনের, যেন মনে হয়, অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুল ! কোথাও যে চলে গিয়েছিল, এমন মনে হয় না। পাকা ও ঝুনো খেলোয়াড় আর কী !

খাঁ-সাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকল। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে পেছনে আসতে বলল, তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিমঝিম করছে, বুক ঢিপঢিপ করছে। এই অন্ধকার গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও-লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে, কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেছে। লোকটা নিশ্চয়ই জানত যে, তার কাছে টাকা আছে—সন্ধান রেখেছিল। কে জানে, খোদাদাদ খাঁর দলের লোক কি না ? গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। একবার সে ভাবলে—দৌড়ে পালাবে ? কিন্তু বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবি মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মতো গঙ্গাধর গুদামের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য ! গুদামের ওদিকের দেয়ালটা যে একেবারে ভাঙা ! গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকেমুখে লাগে। একটা কীরকম ভ্যাপসা গন্ধ গুদামের মধ্যে ! মেঝেটা স্যাঁতসেঁতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকে নি !

এদিকে আবার খাঁ-সাহেব কোথায় গেল ? লোকটা থাকে থাকে, যায় কোথায় ?

অল্পক্ষণ...মিনিট-দুই হবে... কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা... আবার সেই ভয়টা হল। কেমন একধরনের ভয়—যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই বা কীরকম ভয় ? আর গুদামঘরটার মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইছে মাঝে মাঝে।

মিনিট-দুই পরেই খাঁ-সাহেব—এই তো আধ-অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে !...

BanglaBook.org

হঠাৎ আবার একটা অদ্ভুত কথা বলল খাঁ-সাহেব। বলল—তুমি কালা না কি? এতক্ষণ কথা বলছি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে-জায়গায় আছে বল্লাম—তা দেখতে পেয়েছ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বল্লাম—পিপে দুটো। হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?

বারে! এত কথা কখন বলেছে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে, মূঢ়ের মতো দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা? কই, কোথায় শাবল? কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁ-সাহেবের মুখের দিকে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, তার বিভ্রান্ত-বিমূঢ় আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁ-সাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত, পা, সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়ছে—সব যেন ভেঙে ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে...খাঁ-সাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখার জন্যে চেষ্টা করছে, কিন্তু পেরে উঠছে না! তার চোখের সে বিজিত হতাশ দৃষ্টি গঙ্গাধরের হৃদয় স্পর্শ করল। দেখতে দেখতে অতবড় দীর্ঘাকৃতি দেহের আর কিছু অবশিষ্ট রইল না...সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল...এক...দুই...তিন...চার..

আর কোথায় খাঁ-সাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিলিয়ে গিয়েছে...একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপটা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চিৎকার করে গুদামঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশি ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায় নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারত না।

...মাস-দুই পরে মেটেবুরুজের খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে—গঙ্গাধর, টাকা নিয়ে যাবার দিন কী ঘটেছিল, সেটা বলল। খোদাদাদ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—সাহজি, ও হল আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর-পনের আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশকিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল; সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে,—জাহাজের লোকের সঙ্গে সড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখত, কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে হঠাৎ খুন হয়। কেন বা কে খুন করলে জানা যায় নি, কেউ ধরাও পড়ে নি। তবে দলের লোকই তাকে খুন করেছিল, এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয়, আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রি করবার জন্যে, ওর লুকানো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা! তা বাবু, সে গুদামঘরটা কোথায়, তুমি দেখাতে পারবে?

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল, তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেত না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়ল, পুরনো ভাঙা গুদামঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁর মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা! হতভাগ্য কি এতদিনেও বোঝে নি, সে মারা গিয়েছে?...কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।

BanglaBook.org

ভূতের গল্প

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সেবার শরীরটা বেশি রকমের খারাপ হয়। ঘুম হত না রাত্রে। ভোরবেলা তন্দ্রা আসত, কিন্তু ভীষণ স্বপ্ন দেখতাম। দুর্গন্ধ কোবরেজ তেলে উপকারের মধ্যে খুব সর্দি হল। ঘুম না-হওয়ার জন্য যা কষ্ট তার চেয়ে বেশি সর্দির। সারাদিন মন খারাপ করে থাকতাম, কোথাও যে বেড়াতে যাব তাও ভালো লাগত না। আর যাবই বা কিসে? ট্রামের চাকায় ও মাথায় ভারি বিদ্যুৎ চমকায়, মোড় ফেরবার ও থামবার সময় কিচকিচ করে ওঠে, চলবার সময় শব্দ হয়। বাসে চড়া আমার পক্ষে অসম্ভব! ট্যাকসি রোজ রোজ কিছু চড়া যায় না—বাঙালি হিন্দু ড্রাইভারও ডাকতে-না-ডাকতে মেলে না। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন দার্জিলিং কিংবা শিলং যেতে, কোবরেজে বল্লেন পুরী। শেষে হোমিওপ্যাথের মতেই কাজ করলাম। গেলাম চন্দননগরে!

সেখানে থাকবার সুবিধা ছিল। আমার দাদা দূরসম্পর্কের হলেও পরমাত্মীয়, সেখানে থাকতেন। তাঁর বাড়ি খুব বড় ও খোলা জায়গায়, গঙ্গার ধারে না হলেও কাছে একমিনিটের রাস্তায়। সংসারে এক স্ত্রী ভিন্ন দ্বিতীয় বালাই নেই। বৌদিও চমৎকার লোক—মোটর পর্যন্ত চালাবার দরকার হলে পিছপাও হন না, ইংরেজি বলেন, ডিনার খান অর্থাৎ সিগারেট খান না, খোঁপা বাঁধেন। তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অতি মধুর সম্বন্ধ ছিল যার জন্য অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি সৌজন্যরক্ষা অতি সহজেই সম্পন্ন হত। তাঁর বাড়িতে প্রতি শুক্রবার শহরের ভদ্র যুবকদের বৈঠক বসত। সে বৈঠকে আমি যোগ দিয়েছি, কখনও কোনো আড়ষ্টভাব কিংবা অভদ্রতা লক্ষ করি নি। সব সময়ই খুব যে উঁচুদরের কথা হত তা নয়। হাসি-ঠাট্টা, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, মজা-তামাশাও হত, আবার ছন্দ নিয়ে কূটতর্কও বাদ যেত না। এক-এক শুক্রবার আবার নতুন কিছু-একটা মজা করা হত। দাদা-বৌদির সংসারে সত্যিকারের লক্ষ্মী বাসা বেঁধে ছিলেন, এমন সুষ্ঠু সংসার চোখে পড়ে না। তাই যখন হোমিওপ্যাথ গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করে মাথা ঠাণ্ডা

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১৮৯৪—১৯৬১
জন্ম হুগলি জেলার চাতরা গ্রামে। ১৯০৯ সালে বারাসাত স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, রিপন কলেজ থেকে ১৯১২ সালে আই এস সি এবং ১৯১৬ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি এ এবং ১৯১৮ সালে ইংরেজিতে এম এ পাশ করেন। ১৯২০-এ দ্বিতীয়বার এম এ পাশ করেন অর্থনীতি বিষয়ে। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়েই মূলত অধ্যাপনা করতেন। গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা ইত্যাদির বিশিষ্ট স্রষ্টা। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে মার্কসীয় ধারার পথিকৃৎ। চিন্তার মৌলিকত্বে, গদ্য ভাষার পরিচ্ছন্নতায়, বিষয় উপস্থাপনের ঋজুতায় তাঁর গদ্য সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষায় ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে উচ্চ স্তরের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য বিশেষভাবে খ্যাতিমান। বাংলা উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রবক্তা। *অন্তশীল*, *মোহানা*, আবর্ত তাঁর উপন্যাস, *রিয়ালিস্ট* তাঁর গল্পগ্রন্থ। *কথা ও সুর*, *আমরা ও তাঁহারা*, *সুর ও সঙ্গীত*, *বক্তব্য*, *মনে এল* উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ।

করতে উপদেশ দিলেন, আমি বৌদিকে একখানা চিঠি লিখলাম—কিছুদিন গিয়ে থাকতে পারি কি না, অনেকদিন যাই নি, কোনো খবরও পাই নি, যেতে ইচ্ছে করছে। অসুখের কথাও লিখলাম গুছিয়ে, দাদা ডাক্তার কিনা। পরের দিনই উত্তর এল, যেন বৃহস্পতিবারে না গিয়ে শুক্রবারেই যাই। স্টেশনে গাড়ি থাকবে। শুক্রবারেই পৌঁছতে অনুরোধ করার কারণ এই যে, হয়তো শনিবার দাদাকে একবার চুঁচড়ো যেতে হবে—সিভিল সার্জেনের সঙ্গে কনসালটেশনে।

ফরাসিদের চন্দননগর হলেও পাড়া-গাঁ। সন্ধ্যাবেলায় ঝিঁঝি পোকা ডাকে, রাতে শেয়ালের ডাকও শোনা যায়। অন্ধকার সূচিভেদ্য না হলেও রাস্তায় আলোর পক্ষে রীতিমতোই দুর্ভেদ্য ! সব রাস্তাগুলোই যেন বাগানের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। দুপাশে খোলা নালা, নিশ্চয়ই সাপ আছে। বাগানের মধ্যে বাড়ির গায়েই বুড়ো বুড়ো গাছ—তাল, নারিকেল, আম, কাঁঠাল—বাজ পড়লে আর রক্ষে নেই, বেত-আছড়া সাপ লাফিয়ে ঢুকতে পারে। তবে ঐ যা, কোনো বাস-ট্রামের গোল নেই—যা হয় শনিবারের রাত্রে, রাস্তার মোড়ে—তাও কলের ও কোলকাতার বাবুদের গলায়। যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। স্টেশনে মোটর আসে নি দেখে একটু চিন্তিত হলাম। একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার বল্লেন, 'তার আর কি? আসুন তা আমাদের গাড়িতে।' শহর থেকে অমন অনেক শেয়ারের গাড়ি যাতায়াত করে। মাথায়ও লোক চড়ে দরকার হলে। আমি ভেতরেই স্থান পেলাম। নড়বড়ে গাড়ি, কিন্তু চলে মন্দ নয়; শব্দ হয় মড়মড়, ক্যাঁচকোঁচ, তার ওপর ছপটির ছপাং ছপাং। গাড়িতে উঠেই কানে বোরিক তুলো গুঁজে দিলুম; বাজ ও ধাতবপদার্থের ঘর্ষণের আওয়াজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই খানিকটা মেডিকেটেড তুলো সঙ্গে রাখি, কেটে গেলে দরকার হতে পারে। কানে গুঁজলাম লুকিয়ে, কেননা লোকদের কানেও যে চামড়া নেই আমি সংগীতের আসরে গিয়ে পরিষ্কার বুঝেছি। একটা চৌমাথার মোড়ে আমাকে নামতে হল, গাড়োয়ান সুটকেসটা নামিয়ে দিল, পয়সা চুকোবার সময় বলে দিল, 'ঐ কাঁসিতলার গলির শেষের বাড়িটা, বড় ফটকঅলা বাড়ি, দেখলেই চিনতে পারবেন।'

সুটকেসটা হাতে নিয়ে অগ্রসর হলাম। ঠিক গলি নয়, কোলকাতার বড় রাস্তার মতন। তবে এ-রকম অন্ধকার কোলকাতার কোনো বাই-লেনেও নেই। যতসব পাখি গাছের ওপর আওয়াজ করছিল। অদ্ভুত আওয়াজ সব, মোটেই পরিচিত নয়, বোধহয়, বাদুড়ের। না হোক, চামচিকের—অন্তত গন্ধে তাই মনে হল। একটা চামচিকে—চামচিকেই বোধহয় আমার অগ্রদূত হয়ে উড়ছিল। পাখিটা কানা, নচেৎ অত ঘোরে কেন? কিংবা হয়তো কোনো ভাঁটিতে পড়ে গিয়েছিল। পাখিটার দিকে চাইতে চাইতে হোঁচট খেলাম। খুব দূরে মনে হল একটা আলো জ্বলছে। দশ-বিশ কদম এগোতেই দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ফটক হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভের শেষে গাড়ি-বারান্দা, তাইতে একটা আলো ঝুলছে। নিশ্চয়ই এ বাড়িটা, কেননা এ-বাড়ি আমার পরিচিত। তবে পাড়াগাঁ-কে বিশ্বাস করতে নেই, বিশেষত রাত্তিরে। কী জানি, ঐ ধরনের অনেক বাড়ি হয়তো আছে। বাড়ির তো আর নম্বর নেই, আলোর বহরও এত কম যে তাতে করে বাড়ি চেনা যায় না। মনটা একটু বিরক্তও হয়েছিল, অতটা রাস্তা একলা আসব সুটকেস বয়ে, জানলে হয়তো আসতাম না। যা হোক, এসে যখন পড়াই গেছে তখন মন্দ হল না। একটু এডভেঞ্চার না হলে জীবনটাই নীরস হয়ে যায়। স্নায়ু-দৌর্বল্যের পক্ষে একটু-আধটু বৈচিত্র্য ভালোই।

দারোয়ান হাত থেকে সুটকেস নিয়ে এগিয়ে চলল। গাড়ি-বারান্দার নিচে সিঁড়ির উপর একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছেন। এক চটকায় দেখে চেনা-মুখ বলে মনে হল না। পেশোয়ারি চালে ধুতি পরা, ছোট পাঞ্জাবি, চোখে কালো টর্টিজ শেলের মস্ত গোল চশমা। আমাকে দেখে, 'এই যে দাদা' বলে এগিয়ে এলেন। 'এ কী, হেঁটে যে ! গাড়ি কোথায়? তাও তো বটে ! রঘুটা চিনতে পারে নি

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই। মালি হয়েও ফুল চিনলি না, ব্যাটা আহাম্মক। যাক গে পৌঁচেছেন এই ভাগ্যি। গলিটাও ভালো নয় আবার। ওরে চা দে।'

ড্রইংরুমে আলো নেই দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা-বৌদি বুঝি বাড়ি নেই? 'না, ডাক্তারবাবুকে হঠাৎ চুঁচড়ো যেতে হয়েছে, আজ রাতে হয়তো আসবেন না। বৌদি, আহা বৌদি ...কেন আপনি কি জানেন না?'

'কেন, বৌদি বুঝি বাপের বাড়ি গেছেন?'

'হু..আজ আমাকেই অতিথি সৎকার করতে হবে—নিজগুণে দোষত্রুটি দেখবেন না।'

ছোকরাটি ভারি সপ্রতিভ। নিশ্চয়ই যুদ্ধের ফেরৎ। ফরাসি সভ্যতার ছোঁয়াচে মানুষ সামাজিক হয়ে ওঠে, বোবার মুখ ফোটে, ব্যবহার সহজ হয়—আর ইংরেজি সভ্যতা! ও-জাতের ভদ্রতা কোথায়? পোড়ামুখো জাত, তাই বাঙালিরাও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি আমাকে ড্রইংরুমে নিয়ে গেল। নিজে প্রথমে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল। প্রকাণ্ড ঘর, মাঝখানে একটা চৌকা লণ্ঠন আলো, বৈদ্যুতিক লণ্ঠনটি মজার। কালো ঘেরাটোপের ওপর বোধহয় একটা চিনে ড্রাগন কিংবা গারগইলের মতো জন্তু আঁকা। এই ধরনের bigarre ও exotic রুচি আমার ভালো লাগে না। যখন সূক্ষ্মরুচি ভোঁতা হয়ে যায়, জীবনস্রোতে ভাঁটা পড়ে, দৈনন্দিন সুপরিচিতের আস্বাদ মুখে রোচে না, তখনই অদ্ভুত একটা কিছুর প্রয়োজন হয়। আলোটির দিকে চেয়ে থাকতে দেখে ছেলেটি বলল, 'ওটা আমার আঁকা। আচ্ছা এবার চা আজ্ঞা হোক।' চা এল, সঙ্গে খাবার। চা-এর সঙ্গে খাবার খাই না সাধারণত, চা-এর রসভঙ্গ হয়, কিন্তু ছেলেটির নিরতিশয় অনুরোধে খেতেই হল। কর্তব্যজ্ঞানের দায়িত্বে সে নাছোড়বান্দা হয়েছে। নিয়মভঙ্গের জন্য মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল, সেও বুঝল অন্যায় হয়েছে। তাই দুজনেই একটু কেমন চুপচাপ হয়ে রইলুম। অপ্রস্তুত হয়েছে দেখে আমিই কথা পাড়লাম—

'আচ্ছা, এ গলিটার নাম কেন ফাঁসিতলা?'

'বহুপূর্বে ঐ মোড়ে যে-গাছটা দেখলেন তার নিচে একবার একটি লোককে গিলোটিন করা হয়েছিল। সে ভারি আশ্চর্য কাণ্ড, শুনবেন?'

'না, থাক গে, তাহলে ওখানে বেশি আলো দেওয়া উচিত।'

'দেওয়া হয়, কিন্তু হাওয়াতে কেবল নিভে যায়।'

'চন্দননগরে খুব হাওয়া বুঝি?' গঙ্গার হাওয়াতে প্রাণ জুড়োয়। একবার রাজগঞ্জে গিয়েছিলাম, মনে আছে হাওয়াতে আমাকে ডেক থেকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আর কী!

'চলুন এই তো স্ট্রান্ড; পাশেই। হাওয়া দেখবেন চলুন, কাকে হাওয়া বলে।'

'বেশ তো চলুন না আলো নিয়ে যাওয়া যাক।' ছেলেটি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল।

'লোকে যে পাগল বলবে দাদা, স্ট্রান্ডে লণ্ঠন। এ ফরাসি রাজত্ব, লোকে ঠাট্টা করতেও জানে, তাই ঠাট্টাকে ভয় করে চলতে হয় দাদা। কলকাতা নয় যে বড়বাজারে পিদিম নিয়ে রাস্তায় হাঁটলেও ফিরে লোকে তাকাবে না। তা ছাড়া, ডাক্তারবাবুর এখানে এসেছেন, তাঁর পসার মাটি হবে যে।'

লণ্ঠন না নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বাস্তবিকই এমন সুন্দর জায়গা দুর্লভ এদেশে। প্রকাণ্ড চওড়া ও লম্বা পাথর-বাঁধানো রাস্তা, গঙ্গার কিনারে বড় ফুটপাথ, তার ওপর বেঞ্চি, দূরে দূরে বড় বড় ঘাট; রাস্তার ওপাশে কাফে, হোটেলে, মেয়েরা খাচ্ছে চোখে পড়ল। ফ্যাক্টরি আমার চক্ষুশূল, কিন্তু রাত্রে ভারি সুন্দর দেখায়, বিশেষত আলোর মালা। গঙ্গার স্রোতে প্রতিবিম্ব একটু কাঁপছিল। যেন স্বপ্নপুরী! একটা বড় গাছের তলায় বেঞ্চিতে আমাকে ছেলেটি বসাল। দৃশ্যের খাতিরে সিগারেটের নতুন টিন খুললাম। এগিয়ে দিতে উত্তর পেলাম—'খাই বটে, কিন্তু আপনার

BanglaBook.org

সামনে খাব না।' ছেলেটি সত্যই অনেস্ট। না-খেয়ে যদি ছেলেটি ঐ কথা বলতে পারত তাহলে অধ্যক্ষ হেরম্ববাবু ভালোবাসত নিশ্চয়, সিটি কলেজের জলপানি পর্যন্ত পেত।

চন্দননগরের ইতিহাস শোনা গেল। অতি পুরাতন শহর, গঙ্গাবক্ষে যুদ্ধ, বর্গীর আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে স্বদেশি যুগের উপেন বাঁড়ুয্যে, চারু রায়, কানাই দত্ত, রাসবিহারী বোসের কাণ্ড সবই ছেলেটির জানা। তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক পুরানো বাড়ির গল্প তার ঠোঁটস্থ। আমাদের দেশের লোকেরা নিজেদের পারিপার্শ্বিকের কোনো খবরই রাখে না, তাদের ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান স্বল্প। কারণ বোধহয় দেশটা ছোট নয়। ইংল্যান্ড ফ্রান্সে প্রত্যেক গ্রামের ইতিহাস, রাস্তা, ভাঙা গির্জা ও প্রাসাদের ইতিহাস নিয়ে লোকে মাথা ঘামায়; তাদের দেশাত্মবোধ এই স্থান-মাহাত্ম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে অত সুদৃঢ়। আমাদের দেশে সতীর অঙ্গ যেখানে পড়েছে সেখানে পুজো দিয়েই খালাস, ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের যে প্রয়োজন আছে জানিই না। তাই ছেলেটির মুখে শহরের নানা বৃত্তান্ত শুনে ভারি আনন্দ হল। উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু জেলের ঘণ্টা বেজে উঠল, সেইসঙ্গে গির্জার ঘড়িতে ন-টা বাজল। 'এইবার দাদা উঠতে হবে, আর বসবার হুকুম নেই চলুন, খাওয়া-দাওয়া করা যাক গে।'

ওঠা গেল। পথে শুনলাম তার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, লোকে পুণ্ড বলে ডাকে। নেহাত আত্মীয়েরা পুঁটু বলেন।

'তবে ঐ ব্যাপারের পর কাউকে ও নাম ধরে ডাকতে দিই না, ভালো লাগে না শুধু নয়, দিনের বেলা ও ডাক শুনলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। দিদির এত আদরের ডাক!'

'ও নাম বুঝি আপনার দিদির দেওয়া?'

'হুঁ।'

'তিনি বুঝি এখন স্বর্গে?'

'স্বর্গেও বটে, মর্তেও বটে। কেন আপনি কি জানেন না?'

আমি একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। পুণ্ড, বড় স্নেহশীল বুঝলাম। কিন্তু আমি কী করে তার বাড়ির খবর জানব?

বাড়ি ফিরে দেখি সব অন্ধকার। পাড়াগাঁয়ের বিজলি বাতি নিয়মের ভদ্রতার তোয়াক্কা রাখে না। কল চালাবার সময় গোল হয় না, সাহেবদের কল কিনা, ধনিকতন্ত্র নির্মমভাবেই কাজ আদায় করতে জানে। গাড়ি-বারান্দায় প্রবেশ করামাত্র দারোয়ান হাতলণ্ঠন নিয়ে হাজির, দাঁত বার করে। পিত্তি জ্বলে গেল। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে পড়লাম। বেয়ারা এসে ড্রইংরুমের টেবিলে একটা আলো বসিয়ে খাবারঘরে আলো দিতে গেল। ভারি খারাপ লাগছিল। মানুষে আর কত আপ্যায়িত করতে পারে এ-যুগে? ছেলেটিও বিমর্ষ হয়ে পড়ছে লক্ষ করলাম, যেন দাদা চুঁচড়ো থেকে ফিরলে সে বাঁচে, তার দায়িত্ব কমে। বললাম, 'তা আর কী হয়েছে? জীবনটাই এইরকম, এ্যাক্সিডেন্টস উইল হ্যাপেন ইন রেস্ট রেগুলেটেড ফ্যামিলিস!'

'কী বল্লেন? ভারি সত্যি কথা। কে জানত দিদির আমার এইরকম হবে! এই ঘরে বসে আছি, ভাবছি দিদি এল পার্টি থেকে, না তার বদলে... যাকগে, কাল শুনবেন সব কথা, আজ ক্লান্ত আছেন।'

কী জানি কেন প্রাণটা ছ্যাঁত করে উঠল। কার কথা বলছে? বৌদি নয় তো? বাড়ি অত অন্ধকার কেন? যেন মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন। যার দীপ্তিতে গৃহ সমুজ্জ্বল হত তারই অভাবে নাকি?

'আপনি কার কথা বলছেন? আমার বৌদির কথা? তিনি তো বাপের বাড়ি গিয়েছেন।'

'হা ভগবান, বাপের বাড়িই বটে। পরম পিতার কোলে।'

মাথায় যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল, বুকের তার ছিঁড়ে গেল, পেটে কে যেন ধাক্কা মারল, শরীরটা

BanglaBook.org

হালকা হয়ে গেল, ছোট্ট হয়ে গেল। সেই বৌদি। ওহ্ সেইজন্য বাড়ি অন্ধকার, শহরে আলো নেই।

'কই আমি কিছু জানতাম না।'

'আপনি শক পাবেন বলে খবর দেওয়া হয় নি। দাদা নিজে দিতে চান না, তাই আমাকে এই অপ্রিয় কাজ করতে হল। তিনি আপনার বৌদি; কিন্তু আমার, আমাদের সকলের দিদি ছিলেন, মা ছিলেন।'

ছেলেটির চশমা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল। আমি চুপ করে বসে রইলাম। বেয়ারা খবর দিল, খাবার তৈরি। 'এইখানে নিয়ে আয় সামান্য কিছু, ঐ ছোট টেবিলে রাখ্। কিছু খেয়ে নিন, খেতে কি কেউ পারে? তবে দিদি না-খাইয়ে কখনও ছাড়েন নি, তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্য কিছু মুখে দিন। তিনি অসন্তুষ্ট হবেন আপনি না-খেলে, আপনাকে না-খাওয়ালে। খাবার পূর্বে খবরটা দেওয়া উচিত হয় নি, কিন্তু ভাবলাম আপনি জানেন! তা ছাড়া, কখনই-বা দিই বলুন, এই স' দশটা বাজল বলে। তখন হয়তো খুবই ভয় পেতেন, আমি একলা, আপনাকে নিয়ে কী করতাম! পরে যদি আপনার অসুখ বেড়ে যেত! আমি দাদাকে কী করে মুখ দেখাতাম! যা হয়, দু-এক টুকরা রুটি ঐ ডিমের কারিটায় মেখে পিত্তি রক্ষা করুন। দুঃখু তো, সারাজীবন ধরেই করতে হবে আমাদের!

ড্রইংরুমের পর্দাগুলো কালো দেখাচ্ছিল—যেন কফিনের ঢাকা। ছাত থেকে যে লণ্ঠন ঝুলছিল তার শেডের ছবিটা ভীষণ দেখাচ্ছিল, যেন আমাদের দুঃখে অন্ধকারের প্রতিমা ঘরে আকাশ থেকে নেমে আসছে। হাতে রুটি নিয়ে কতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম জানি না। গির্জার ঘণ্টায় দশটা বাজল, কবর দেবার সময় যেমন ঢং ঢং করে ভাঙা গলায় ঘণ্টা বাজে। আমার সঙ্গী বলে উঠল—'এইবার! আর দেরি নেই! কোনো ভয় নেই, কিছুই বলেন না। আমাদের সয়ে গিয়েছে, এখন প্রতীক্ষাও করি, প্রথম প্রথম কী হত ভগবানই জানেন!'

ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে তিনি সব বৃত্তান্ত বলে গেলেন। বৌদি কৃষ্ণাভামিনী স্কুলের মিটিঙে সন্ধ্যাবেলা যান। সোফেয়ারের অসুখ করেছিল, নিজেই হাঁকিয়ে যান। ফেরবার পথে এক বাসের সঙ্গে ধাক্কা খান। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। দেহে কোনো ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না, হৃৎপিণ্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। যখন বাড়িতে আনা হল শেঠেদের গাড়িতে, তখন কে বলবে যে প্রাণ আর নেই। মুখে সেই হাসি, শুধু চোখদুটো একটু বেশি জ্বলজ্বলে। দামি শাড়ি পরা ছিল, বিস্রস্ত পর্যন্ত হয় নি। যেন পার্টি থেকে নামছেন।' আমি চুপ করে শুনে গেলাম—কী আর বলব? তার মুখটা আমার মানসপটে ভাসছিল শুধু। তাঁর দুষ্টু-দুষ্টু হাসি-মাখানো মুখটি যে একবার দেখেছে সে কি কখনও ভুলতে পারে? যেমন পুরনো বাড়ির দেয়ালে কোনো একটি দামি ছবি চিরকাল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে করে প্রত্যেক মনের আসবাবের শামিল হয়, তেমনি আমার বৌদির মুখখানা তাঁর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মনে চিরদিনের জন্য আপন হয়ে গিয়েছিল। সে ছবি ভুলবার নয়, যে একবার দেখেছে সে আর কখনও ভুলবে না, ভুলতে পারে না। 'তিনিও আমাদের ভোলেন নি। তিনি আসেন।'

'সে কী!'

'হাঁ আসেন। প্রতি শুক্রবার আসেন, এবং বরাবর ওপরের ঘরে না গিয়ে ড্রইংরুমে এসে আপনার ঐ পাশের চেয়ারেই বসেন।' আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। 'শুক্রবার কেন?' 'শুক্রবার মারা যান। আমাদের রাত্রে খেতে বলেছিলেন, তারপর সেদিন ঠিক হয়েছিল দাদাকে নিয়ে একটু প্র্যাকটিক্যাল জোক করা যাবে। কী প্র্যাকটিকাল জোকই তিনি করলেন।'

'তিনি আবার কোথায় করলেন?'

'ভগবান করলেন, সেই একই কথা।'

BanglaBook.org

'তিনি কী করেন এসে?'

'সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! রাত্রি ঠিক দশটা তের মিনিটে, আমরা ঘড়ি পর্যন্ত মিলিয়ে নিই, গলির মোড়ে মোটরের হর্ন শোনা যায়,অল্পক্ষণ পরেই গেটের ফাটক খুলে যায়, ড্রাইভারের পাথরকুচির ওপর দিয়ে মোটর আসবার কুড়কুড় শব্দ শোনা যায়। তারপর তার পরের ব্যাপারটাই সবচেয়ে আশ্চর্য। দিদির প্রাণের পরিচয় পাবেন, তাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিত পাবেন শুনলে। আমরা বুঝেছি যে তাঁর প্রাণ এখনও আমাদের জন্য কাঁদে। অথচ তিনি চান না আমরা যেন কোনো ভয়ের লক্ষণ দেখাই। তাঁর ইচ্ছা আমরা যেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে গ্রহণ করি। তাঁকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার অর্থই হল দুর্ঘটনাকে সহজভাবে গ্রহণ করা, মৃত্যুকে অনাবশ্যক আড়ম্বরের সঙ্গে না ধরা। এই আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান নেই; ইংরেজ কবি যা বলেছেন মৃত্যুটা নিদ্রামাত্র, জার্মান কবি গ্যেটে যা বলেছেন—দি এন্ড অফ লাইফ ইজ লাইফ। অতএব আপনি ভয় পাবেন না।

পুণ্ডবাবুর কথা সারগর্ভ হলেও আমার স্নায়ু এত শক্ত নয় যে আমি তৎক্ষণাৎ ভয়কে জয় করব। আমি সত্যই ভয়ে কাঁপছিলাম স্বীকার করতে লজ্জিত হচ্ছি না। জীবজন্তুর প্রতি তাঁর ব্যবহার জানতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলাম। শুনলাম যা তা অভূতপূর্ব। গেট খোলার শব্দ হলেই তাঁর এক পোষা কাবলি বেড়াল 'মিউ, মিউ' দুবার মাত্র আস্তে আস্তে ডেকে সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি নামে, তারপর বারান্দা দিয়ে এগোয়, মোটরের পা-দানিতে ওঠে, তিনি কোলে তুলে দেন। আলোগুলো তেজ পেয়ে জ্বলে ওঠে। তিনি হ্যাট-র‍্যাকে প্যারাসল রেখে বেড়াল কোলে করে প্রবেশ করেন, মুখে তাঁর হাসি লেগেই থাকে। 'ঐ হর্নের আওয়াজ হল।'

তারপর কী হল সব লেখা যায় না। যতটুকু যায় তার দ্বারা ছোকরার সত্যবাদিতার প্রমাণই হয়। গেট খুলল, কুড়কুড় শব্দ করে গাড়ি বারান্দার নিচে থামল। মিউ মিউ শব্দ শুনলাম, এঞ্জিনের শব্দ বুকের মধ্যে হচ্ছিল; হঠাৎ এঞ্জিন থেমে গেল, আমার হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। আমি চিৎকার করতে পারলাম না, পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতন চেয়ারে বসেই রইলাম। চোখের ওপর যে ছবি ভেসে উঠল তা আমি বর্ণনা করতে পারব না! বেগুনে পর্দার ফাঁক থেকে দেখলাম—বাইরের সব বৈদ্যুতিক আলো যেন চতুর্গুণ তেজে জ্বলে উঠেছে; সেই হাস্যমুখী বৌদি আমার, তাঁর আদরের বেড়াল কোলে করে এগিয়ে আসছেন। খুট করে ছাতা রাখার শব্দ হল—তারপর পর্দা সরে গেল, ড্রইংরুমের আলো হঠাৎ জ্বলে উঠল, এ যে আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছেন। একটা অস্ফুট ধ্বনি আমার মুখ থেকে বেরিয়েছিল। তারপর বৌদির ঠোঁট নড়ে উঠল, তাঁর হাসি অদৃশ্য হল, মুখে ফুটে উঠল চিহ্ন শঙ্কার। খুব দূর থেকে একটা নাকিসুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম—

'এই যে ঠাকুরপো কখন এলে? মিটিং আর শেষ হয় না। দেরি হয়ে গেল, ক্ষমা কোরো। খাওয়া-দাওয়া হয়েছ তো? এ কী! তুমি যে একদম ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছ। তোমার হয়েছে কী? পুঁটু, বাড়াবাড়ি করেছে বুঝি? মাত্রা রাখতে পার নি? রোগী বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়।'

ছোকরাটি ধীরে ধীরে বলে, 'আমি কী করব! এবারে যে কমপ্লিট নার্ভাস ব্রেকডাউন, বেড়াল দেখলে পর্যন্ত ভয় পান!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভুলোর ছলনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৮—১৯৭১
জন্ম : বীরভূম জেলার লাভপুরে। সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে আই এ ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে রাজনীতিতে যোগদান। ১৯২১ সালে অসযোগ আন্দোলন চলাকালে কারাবরণ। বীরভূম অঞ্চলের গান্ধীবাদী রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ। ১৯৩০-এ কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেয়ায় কারাভোগ করেন। চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ নেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এবং রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে সামন্ত শ্রেণীর পরাজয় ও শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিজয়, যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে কৃষিসভ্যতার বিরোধ, কৃষি নির্ভর অর্থনীতির ভাঙন, শিল্পকেন্দ্রীক নাগরিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা, ধনী কৃষকের সঙ্গে দরিদ্র কৃষকের বিরোধ, পরাধীন ভরাতের স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের লাগামহীন বিস্তার, যুব সম্প্রদায়ের অস্থিরতা ও বিদ্রোহ ইত্যাদি রাঢ়বঙ্গ অঞ্চলের পটভূমিতে তাঁর উপন্যাসে পরিস্ফুটিত। *আরোগ্য নিকেতন, পঞ্চগ্রাম, ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, হাসুলীবাঁকের উপকথা* প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে বিবেচিত।

ভুলো কে জান? ভুলো মানুষ নয়। ভুলো কুকুরও নয়। ভুলো মানে ভ্রান্তি—যা ভোলায়; মিথ্যে ভুলে ভোলায়। আমাদের দেশে বলে—ভুলো হল একরকম ভূত। ব্রহ্মদৈত্য, মামদো, শাঁকচুন্নি, গোদানা, গলায়-দড়ের মতো এও একরকমের ভূত! নিশির নাম অনেকে জানে—ভুলো অনেকটা নিশির মতো। কিন্তু নিশি ডাকে ভোরবেলা কি মাঝরাত্রে, ভুলোর খেলা সব সময়েই। তবে ঠিক সন্ধ্যার পর থেকে একটু অন্ধকার হলে ভুলোর খেলা জমে ভালো। নিশি, ভূত বা প্রেতিনীর সঙ্গে মিল এর অনেকটা। তফাত—নিশি ডাকে ঘুমের মধ্যে আর ভুলোর খেলা জাগ্রত মানুষের সঙ্গে।

হয়তো কেউ সন্ধেবেলা যাচ্ছে মাঠের মধ্যে দিয়ে কি রাস্তা ধরে, ভাবছে কোনো বন্ধুর কথা কি আপনজনের কথা, হঠাৎ একসময়ে সে বন্ধু তার সামনে এসে দাঁড়াল, বললে—এই যে রে!

সে বললে—তুই? আরে তোর কথাই ভাবছিলাম যে!

—হ্যাঁ রে, তাই তো এলাম। এখন আয়, আমার সঙ্গে আয়।

মানুষটার মনেও হবে না যে বন্ধু হঠাৎ কোত্থেকে এল। হয়তো তখন আসল বন্ধু দশ-বিশ মাইল কি একশ মাইল দূরে রয়েছে, সে কথা লোকটি জানে, তবুও তার মনে সে প্রশ্নই জাগবে না। ভুলোর মায়া। সে বিগলিত হয়ে যাবে তাকে দেখে; এবং মুহূর্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পিছনে পিছনে চলবে। ভুলো চলবে পথ ছেড়ে অপথে বিপথে, খানাখন্দ কাঁটাখোঁচা-ভরা জায়গার উপর দিয়ে; মায়ায় ভোলা মানুষটার মনে সে নিয়ে কোনো কথা উঠবে না, জিজ্ঞাসাও করবে না যে এদিক দিয়ে কোথায় চলছিস ভাই। মনে তখন ঘোর লেগেছে তার, সে চলবে মুখ বন্ধ করে।

তারপর? তারপর মানুষটার দেহ হয়তো পাওয়া যাবে কোনো খানাখন্দের মধ্যে; নয়তো কোনো নদীর দহে। নয়তো

কোনো উঁচু জায়গার নিচে একটা পাথরে মাথা ছেঁচে পড়ে থাকবে।

লোকটা ভুলো ভূতের সঙ্গী হয়ে গেল এরপর থেকে।

তার বাসা হল যে-জায়গায় সে মরেছে সেই জায়গায় আর ভুলো ফিরে গেল আপন জায়গায়। রাত্রে দুজনে মাঠের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগল আর কাকে সঙ্গী করা যায়। আর নাহয় তো রাত্রে মাঠের মধ্যে নাচতে গাইতে লাগল—

হায় কি মজা হায় রে
ভুলের খেলা মজার খেলা খেলবি যদি আয় রে।
ফুস মন্তর ভুল ভুলিয়া—যাবি রে সব দুখ ভুলিয়া—

এমনি ধরনের গান। গানটা অবশ্য আমি আন্দাজ করে লিখলাম। কারণ কী গান যে তারা গায় সে আমি কানে তো শুনি নি। তবে হ্যাঁ, ভুলো-ভূতে লোককে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ আমি দেখেছি। আরে বাপ্, সে কী কাণ্ড! ভুলোয় ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—একশ লোক ভুলো-লাগা লোকটাকে ধরবার জন্যে ছুটছে; কিন্তু তাকে কিছুতে ধরতে পারছে না। ভুলো দেখছে লোকে দেখেছে তার কাণ্ড, ছুটে আসছে জোর করে আটকাবার জন্যে, লোকটা সোজা ছুটলে ধরে ফেলবে, সুতরাং ভুলো-ভূত তখন এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল—সোজা চলছে, হঠাৎ ডাইনে বেঁকল, তারপর আবার বাঁয়ে, তারপর আবার আরও বাঁয়ে—তারপর বাঁয়ে, কখনও বা একেবারে উল্টো মুখে; আর তার পিছনে ভুলো-লাগা মানুষটা ঠিক সেই পথে তেমনি করে এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল। ফলে যারা পিছন থেকে ধরতে আসছে তারা কিছুতেই তাকে ধরতে পারছে না। অবশেষে ভুলো-ভূত একটা গাছে মিলিয়ে গেল—কি সামনে নদী পড়ল তো তার মধ্যে ডুবল। পিছনের ভুলো-লাগা লোকটাও গাছে ধাক্কা খেয়ে মরল, নয়তো নদীতেই ভুলোর সঙ্গে ডুবল।

কখনও কখনও লোকে ধরে ফেলে, কিন্তু তাতেও বিপদ, লোকটা তখন সব ভুলে গেছে। মা-বাপ-স্ত্রী সব। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এ আমি চোখে দেখেছি। ভুলো-লাগা লোকটাকে বহুকষ্টে ধরেছি। তারই কথা বলছি তোমাদের।

একেবারে হুবহু সত্য, আগাগোড়া। বানানো নয়। সেইজন্যে এ কাহিনীর মধ্যে যে 'আমি' বলে লিখছে সে আমিই—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ি লাভপুর।

ঘটনাটা অনেক দিনের। বলি শোন।

ইংরেজি ১৯২৯ সাল। আমি তখন লাভপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। সেকালে ইউনিয়ন বোর্ড ছিল; এখন উঠে গিয়ে পঞ্চায়েত হয়েছে।

পাঁচ-সাত কি ন-দশ খানা গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড। লোকের ওপর ট্যাক্স করে, সেই ট্যাক্স আদায় করে চৌকিদারদের মাইনে দেয় আর যা বাড়তি থাকে তা থেকে করে কিছু গ্রাম্য রাস্তা-ঘাট, কিছু পানীয় জলের জন্যে কুয়ো। আর দেশে তখন প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া—তার জন্যে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সিনকোনা ট্যাবলেট বিতরণ করে। ডোবায় কেরোসিন দেয় মশার ডিম মারবার জন্যে।

তখন আমি সাহিত্যিক নই। তখন দেশের কাজ করি, কংগ্রেস করি, বাসনা দেশের সেবা করব। দেশ স্বাধীন করব। তার সুবিধের জন্যে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়েছি। কিছু কাজ তো করা যায় এ থেকে। আমার বয়স তখন একত্রিশ বছর। রাস্তাঘাট করাই; তার সঙ্গে এই

BanglaBook.org

ম্যালেরিয়া নিবারণের কাজটা নিয়েছি। মশা মারতে হবে। অ্যানোফিলিস মশা দূর হলেই ম্যালেরিয়া যাবে। কারণ মাছি যেমন কলেরার বীজ ছড়িয়ে বেড়ায় তেমনি অ্যানেফিলিস-ই ম্যালেরিয়ার বিষ ঢুকিয়ে দেয় মানুষের দেহের রক্তে।

সে-সময় গুরুসদয় দত্ত ছিলেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। মশা মারবার জন্যে তিনি একটা নতুন সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছেন তখন।

আগে জঙ্গল সাফ করে, ডোবায় কেরোসিন দিয়ে মশা মারবার উপায় আমাদের জানা ছিল। কিন্তু সে প্রায় কামান দেগে মশা মারার মতো ব্যাপার। গ্রাম অঞ্চলে কত জঙ্গল পরিষ্কার করবে। কত খানা ডোবায় কেরোসিন দেবে। সে খরচের টাকা কোথায়?

দত্ত সাহেব পথ বের করেছেন—সহজ পথ, কামান না বন্দুক না লাঠি না। মশাও তোমাকে মারতে হবে না; তুমি টোপা 'ডুঁরুলি' বা পানা নির্মূল করে ফেল, তাহলে অ্যানোফিলিস ঝাঁকবন্দি থাকলেও ওদের কামড়ে ম্যালেরিয়া হবে না। ওই টোপা পানার রস খেয়েই অ্যানোফিলিস মশার ভিতর ম্যালেরিয়া জীবাণু জন্মায়, তখন সে কামড়ালে ম্যালেরিয়া হয়।

ধর, মাতালের উপদ্রব হয়েছে! মাতালেরা দাঙ্গা করছে। নিত্য চেঁচামিচি করছে, গালাগাল করছে, মাতাল অনেক। সুতরাং মাতাল তুমি কত ধরবে, কত বাঁধবে? তার থেকে তুমি যদি মদের দোকানই তুলে দাও, তবে মাতাল আর কেউ হবে না। লোকগুলো তো আর মদ না-খেলে মাতলামি করতে পারবে না!

মদের দোকান তোলা যায় না। কিন্তু মশার বিষ শেষ করতে টোপা ডুঁরুলি বা পানা নিশ্চয় শেষ করা যায়। খরচও এতে অনেক কম। সুতরাং ইউনিয়ন বোর্ডে বোর্ডে হুকুম এল—টোপাপানা বা ডুঁরুলি তুলে ফেল।

দত্ত সাহেব নিজে উৎসাহী হয়ে দলবল জুটিয়ে পুকুরে ডোবায় নেমে টোপাপানা পরিষ্কার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কাজ শুরু করেছিলেন। টোপাপানা তুলে তার চারপাশে খড়কুটো দিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতেন। তার চারপাশে তাঁর দলের লোকেরা নেচে নেচে ঘুরত এবং গান করত :

মশার মাসি, সর্বনাশী; আয় দোব তোর গলায় ফাঁসি—
ছিঁড়ব রে তোর ঘেরাটোপ—পোড়াব তোর দাড়ি গোঁফ।

আরও বড় গান। সব ঠিক মনে নেই। যাই হোক, টোপাপানা মশাদের দাড়িগোঁফওলা মাসি—সেই সর্বনাশী মাসিকে নির্মূলের ব্যবস্থা করা ছিল তখন ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ।

প্রথম একদফা অনেক লোক লাগিয়ে গ্রামের যে-সব পুকুরে টোপাপানা ছিল—তা সব তুলে দিয়ে পুড়িয়ে ব্যবস্থা করা হল যে নিয়মিতভাবে দুজন করে লোক কাজ করবে প্রতি গ্রামে, যাদের কাজ হবে পুকুরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা আর টোপাপানা একটা-দুটো যেমন দেখা যাবে অমনি তুলে ফেলা।

লাভপুরে এই কাজের জন্যে দুজন বাউড়ী জোয়ানকে রাখা হয়েছিল। নিতাই এবং পাঁড়ে। নিতাইয়ের নাম তোমাদের শোনা নাম কিন্তু পাঁড়ের নাম 'পাঁড়ে' অর্থাৎ পাণ্ডে কেন তার অর্থ বলব কী আমিও ঠিক জানি না। পাঁড়ে বাউড়ী অর্থাৎ দস্তুরমতো নাম। পাঁড়ে আজ বেঁচে নেই কিন্তু নিতো আজও আছে। বুড়ো হয়েছে। এরা দুজনে ছিল বন্ধু। খুব কড়া খাটুনি তারা খাটতে নারাজ ছিল; চাষ করত না, কারুর ঘরে কাজ করত না। হালকা কাজ খুঁজে বেড়াত। এবং তার জন্যে মজুরি তারা কম হলেও আপত্তি করত না। এই গ্রাম ঘুরে এখানে-ওখানে ডুঁরুলি বা টোপাপানা খুঁজে তুলে ফেলার কাজটা তারা খুশি হয়ে নিয়েছিল। সকালে উঠে—তামাক-টামাক খেয়ে দুজনে বের হত; বিড়ি টানত এবং ডুঁরুলি দেখলে তুলে ফেলে গাছতলায় জিরিয়ে

BanglaBook.org

নিত, গান গাইত। জলখাবার বেলা অর্থাৎ বারোটা বাজতে বাজতে চক্কর দেওয়া শেষ করে দেখাবার জন্যে কিছু ডুঁরুলি গামছায় বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরত। জল খেয়ে বটতলার ছায়ায় ঘুম এবং আড্ডা। বিকেলে চারটের পর স্নান করে টেড়ি কেটে কিছু মদ খেয়ে আসত ইউনিয়ন বোর্ড আপিসে। ডুঁরুলিগুলো দেখিয়ে ফেলে দিত গর্তে, মাটি চাপা দিত—তারপর ইউনিয়ন বোর্ডের খাতায় বুড়ো-আঙুলের ছাপ দিয়ে প্রত্যেকে ছয়আনা পয়সা ট্যাকে গুঁজে মদের দোকানে গিয়ে আনা দুই-তিনেক পচাই মদ খেয়ে টলতে-টলতে বাড়ি ফিরত। আমি তখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসে থাকতাম। পয়সাকড়ি দিয়ে সকলকে বিদায় করে আমিও ফিরতাম বাড়ি। বন্ধুরা বসে আছেন তখন, আসর জমিয়ে তাস খেলছেন।

এরই মধ্যে একদিন—১৯২৯ সালের শ্রাবণ মাসের শেষ। তার আগে একটা কথা বলা দরকার। সেটা এই যে, বাঙলা দেশে ১৯২৯ সালে খুব ভালো বর্ষা হয়েছিল ; শ্রাবণের তৃতীয় সপ্তাহ আসতে আসতে চাষ শেষ হয়ে গেছে। মাঠ সবুজ ধানে ভরে উঠেছে। আষাঢ়ে পোঁতা জমিতে ধান বেশ বড় হয়েছে ; তা প্রায় উঁচুতে হাঁটুর সমান এবং ঝাড়ে-গোছেও বেশ মোটা হয়েছে। পুকুর ডোবা নালা নদী জলে টইটুম্বুর। আমাদের গ্রামের গায়ে দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা রেললাইন, তার দক্ষিণে মাইলখানেক বিস্তৃত ধানের ক্ষেতের ওপারে কূয়ে নদী। কূয়ে তখন ভরাভরতি।

সেদিন বিকেলে সাড়ে চারটের সময় বোর্ডে গেলাম। দেখলাম নিতো বা নিতাই এসে বসে আছে—পাঁড়ে আসে নি। নিতোকে বলেছে—তু চল এগিয়ে, আমি যাচ্ছি! তু কিন্তুক আগেভাগে নিয়ে যেন চলে আসিস না। দুজনে পয়সা নিয়ে মদের দোকানে ফিরব।

সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটা, পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত আমরা অর্থাৎ সেক্রেটারি এবং আমি বোর্ডের কাজকর্ম সারলাম—অপেক্ষা কেবল পাঁড়ের, সে এলে নিতোর এবং তার টিপ নিয়ে পয়সা দিয়ে বাড়ি ফিরব।

ছ-টার সময় বললাম—কই রে, পাঁড়ে এল কই!

নিতো মদ খানিকটা খেয়েছিল—তার ঝোঁকে এবং চুপচাপ বসে থাকায় ঝিমুনিতে সে মধ্যে মধ্যে ঢুলছিল। আমার কথায় সজাগ হয়ে উঠে চোখ কচলে বললে—তাই তো মশায়, কই এল। সে নিচ্চয় আসবে বলেছে।

খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল সে।—তাই তো!

কিন্তু আমরা বসে থাকি কত? সন্ধে হয়ে আসছে। সেক্রেটারি বাড়ি যাবার জন্যে উশখুশ করছে, আমার মনও টানছে তাসের আড্ডায়। তবুও আরও মিনিট দশেক বসে থেকে বললাম—তাহলে টিপ ছাপ দিয়ে তোর পয়সা নিয়ে যা। পাঁড়ের পয়সা বাকি রইল, কাল নেবে।

তাই নিয়েই সে যেন চিন্তিত মনে উঠে গেল। বিড়বিড় করতে করতে গেল—শালার কাজ দেখ দিকি। শালা বদমাশ কোথাকার!

কথাটা আমার কানে এল। আমরা বোর্ড থেকে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম নিতো পশ্চিমমুখে চলেছে। যাবার কথা তার পুবমুখে। বুঝলাম, পশ্চিমমুখে একটু এগিয়ে গিয়ে সে রেললাইন ধরবে। পুবমুখে ফিরে সোজা এসে উঠবে তাদের পাড়ায়। তাদের পাড়াটা আমার বাড়ির দক্ষিণ-পূর্বে একেবারে লাগাও। স্টেশনের গায়ে।

বাড়ি ফিরলাম—তখন অন্ধকার হয়েছে। আমার বৈঠকখানায় তখন আলো জ্বেলে তাসুড়ে বন্ধুরা বসে গেছেন। আমিও পাশে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই থ্রি হার্টস থ্রি নো-ট্রামসের ডাকের নেশা জমে উঠল।

BanglaBook.org

হঠাৎ নেশাটা যেন একটা ঠোক্কর খেয়ে ভেঙে গেল। ঠিক দক্ষিণ দিকে একটা গোলমাল উঠল।

—গোলমাল? কিসের গোলমাল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আগুনের ভয় থাকে কিন্তু এটা বর্ষাকাল এবং সেবারকার মতো ভরাভরতি জমজমাট বর্ষাকাল। আগুন লাগার তো কথা নয়। কান বাজিয়ে শুনলাম।

বহু লোকের একটা আক্ষেপ এবং শঙ্কাপূর্ণ একটা 'গেল রে-গেল রে' শব্দ!

ঠাওর করতে পারলাম না—কী গেল! গেল বা যাচ্ছে—যেন টেনে ছিঁড়ে কিছু চলে যাচ্ছে বা কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

কোলাহলটা নিকটে—ওই রেললাইনের ধারে। আমার বৈঠকখানা থেকে ধীরেসুস্থে পাঁচ-ছ মিনিটের পথ। দৌড়ে গেলে তিন-চার মিনিট লাগে।

আমরা কেউ বসে থাকতে পারলাম না ওই 'গেল গেল' শব্দ শুনে। সকলে ছুটেই বেরিয়ে এলাম। এবং মিনিট দুয়ের মধ্যে গ্রামপ্রান্তে এসে নজরে পড়ল রেললাইনের উপরে অনেক লোক। তারা দাঁড়িয়ে ওই—'গেল রে—গেল রে' বলে একরকম হাহাকারই করছে। লাইনের ওপারে মাঠে দেখলাম গোটা-দুই লণ্ঠনের আলো যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একবার এদিক একবার ওদিক, কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে; আলেয়ার মতো।

লাইনে এসে উঠে দেখলাম বাউরীপাড়ার মেয়েপুরুষেরা সারিবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে ওই হায়-হায় করছে। কতকগুলি পুরুষ চেঁচাচ্ছে—গেল রে। গেল রে। ওই রে!—কতকগুলি ভদ্রলোকও তখন এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা বলছেন—ওই! ওই! না?

—কী হয়েছে?—জিজ্ঞাসা করলাম সামনে যাকে পেলাম।

সে আমাকে চিনে কেঁদে উঠে বললে—ও গো বাবু গো, নিতোকে ভুলোতে নিয়ে গেল গো। নিতোকে ভুলোতে নিয়ে গেল।

ভুলোতে নিয়ে গেল—কথাটা চট করে বুঝি নি। বললাম—নিতোকে ভুলোয় নিয়ে গেল কী?

সে বললে—হ্যাঁ বাবু, ওই দেখ মাঠে মাঠে ছুটছে গো, আর চেঁচাচ্ছে—দাঁড়া রে দাঁড়া রে—পাঁড়ে রে দাঁড়া রে!

বিরক্ত হয়ে বললাম—মানে কী?

—ও গো ভুলো ভূত, পাঁড়ে সেজে এসে ওই দেখ মাঠে মাঠে ওকে ছুটিয়ে নিয়ে চলছে, কেউ ধরতে পারছে না। নিয়ে গিয়ে নদীতে ডুবিয়ে মারবে গো; ছামুতে নদী দুকূল পাথার। আহ্ আহ্ ভরা জোয়ান গো—আহ্ আহ্।

—পাঁড়ে কোথায়?

—সি ওই দেখ, ওইখানে রইচে গো। ভয়ে ডরে সিও কাঁপছে। নিতো গেল সে যে ওকে লেবে গো!

অর্ধেক বুঝলাম, অর্ধেক বুঝলাম না! তবু মাঠে নেমে পড়লাম। আমার সঙ্গে জন-দুই সঙ্গী। সামনে ওই বিস্তীর্ণ এক মাইল স্কোয়ার জলে টইটুম্বুর ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে। প্রায় দু-শ গজ দূরে তখন আলোগুলো ইতস্তত ছুটোছুটি করছে—এদিক ওদিক সেদিক, কখনও সোজা কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে। জল ও ধান-ভরতি জমির আলের উপর দিয়ে আলো হাতে যেতে গেলে এমনিই হবে। আর এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে অন্ধকার-অভ্যস্ত চোখে দেখলাম—কালো কালো মানুষ অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকারে প্রেতযোনির মতো ছুটোছুটি করছে। এবং তার খানিকটা আগে চিৎকার হচ্ছে, তারস্বরে আর্তকণ্ঠে ব্যাকুল হয়ে

BanglaBook.org

কেউ প্রাণ ফাটিয়ে ডাকছে—দাঁ-ড়া রে, দাঁড়া-রে—পাঁ-ড়ে রে, দাঁড়া রে, ও রে দাঁড়া রে!

কণ্ঠস্বর নিতোর তা চিনলাম। কিন্তু কাকে বলছে? পাঁড়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে ভয়ে। কিন্তু নিতো যাকে ডাকছে সে যে তার সামনে—তাতে তো সন্দেহ নেই। সে যেন নিতোর চেয়েও জোরে ছুটে চলছে সামনে এঁকেবেঁকে—কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে কখনও সোজা। যেন সে হাওয়ায় উড়ছে। নিতো দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরবার জন্য ছুটছে—ছুটছে। যেন সে হারিয়ে যাবে, যেন সে পালিয়ে যাবে। নিতো আর তার কখনও লাগাল পাবে না।

পিছনের লোকেরা বহুজনে একসঙ্গে ডাকছে—নিতো, নিতো! নিতো থাম—থাম! কিন্তু নিতো বধির হয়ে গেছে। সে শুনতে পাচ্ছে না। তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সে যেন সমস্ত পিছনটা চিরদিনের মতো ফেলে চলে যাচ্ছে।

কে যেন টর্চ ফেললে। টর্চের আলোটা নিতোর চিৎকার লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে পড়ল, দেখলাম—দু-হাত বাড়িয়ে নিতো ছুটছে; আশ্চর্য সে হাত বাড়ানো। এবং আশ্চর্য সে তার ছোটা। উর্ধ্বশ্বাসেই শুধু নয়, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতো ছুটছে। জল এবং ধান-ভরা মাঠ ভেঙে ছুটছে। কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে কখনও সোজা। কখনও কখনও পড়ছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। একবার দাঁড়ায় না। আরও আশ্চর্য এই যে, পিছনের অনুসরণকারীরা যখন কাছে এসে পড়ছে তখন হঠাৎ আরেক দিকে বেঁকে সে ছুটে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে দিয়ে জল ভেঙে কাদা ভেঙে। অনুসরণকারীরাও প্রাণপণে ছুটছে—কিন্তু জলে ধানের মধ্যে নামতে পারছে না তারা। তারা আইলে আইলে ছুটছে। ঘুর হচ্ছে। ততক্ষণে নিতো আরও এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনের আলোর ছটার প্রতিও তার দৃষ্টি ফিরছে না। মানুষটা যেন উন্মাদ,মানুষটা যেন দানবের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে—প্রাণের ব্যাকুলতায় ব্যগ্রতায়।

—পাঁ-ড়ে রে—পাঁ-ড়ে রে—দাঁড়া রে—দাঁড়া রে!

চলছে কিন্তু ঠিক পুব-দক্ষিণ মুখে। নদীর দহের দিকে। রেললাইন সোজা পূর্বমুখে এসে একটা বাঁকে দক্ষিণমুখে মোড় নিয়ে নদীর উপর ব্রিজ বেঁধে পার হয়ে চলে গেছে। তার পাশেই প্রকাণ্ড দহ—সেই মুখে চলেছে।

মুহূর্তে মুহূর্তে দূরে চলে যাচ্ছে—নিতোর সামনে ভুলো পাঁড়ের চেহারা ধরে হাওয়ায় ভর দিয়ে ডেকে ডেকে নিয়ে চলেছে! আয়—আয়—আয়।

আমরা কেউ দেখতে পাই বা না পাই, নিতো তাকে দেখছে। ওই চলছে নিতো —ওই—ওই!

আলোগুলো কাছে গেল। এইবার ওকে ধরবে।

কিন্তু মুহূর্তে নিতোর কণ্ঠ উলটোমুখী হয়ে ছুটে চলল। যাহ্— আলো অনেক পিছনে পড়ে গেল দেখতে দেখতে। নিতো ছুটেছে পুলের দিকে। পুলের ওপাশে দহ। আর পুলের মুখটা বড় বড় পাথর দিয়ে ঢেকে তারের জাল দিয়ে বেঁধে অন্তত দোতলা বাড়ির সমান উঁচু এবং লাইনের মুখটা লোহার স্পাইক দিয়ে মানুষ-জন্তু-জানোয়ারের পক্ষে অনধিগম্য করে রেখেছে। যেন কেউ লাইন ধরে ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পার না হতে পারে।

দহে পড়লেও মরবে নিতো ডুবে। পুলে উঠলে হয় জালে বেধে পাথরে আছাড় খেয়ে পড়ে মরবে, নয় উপরে উঠে ওই স্পাইকে গেঁথে যাবে।

নিয়ে গেল নিয়ে গেল—ভুলো তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

তখন আমি রেললাইনের দক্ষিণে প্রায় সিকি মাইল মাঠ ভেঙে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এবং নিতো তখন আরও সিকি মাইলের বেশি দক্ষিণে নদীর দিকে ক্রমশ ঢালু এবং জলা-ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে উন্মাদের মতো ছুটোছুটি করে মিনিটে মিনিটে আরও দক্ষিণে

BanglaBook.org

নদীর কিনারার দিকে চলেছে।

শুনতে পাচ্ছি,—দাঁড়া রে—দাঁড়া রে—দাঁড়া রে।

ক্রমশ কণ্ঠস্বর দূরবর্তী হচ্ছে। এরপর নদীগর্ভে, নয়তো ওই ব্রিজের মুখে দোতলা সমান উঁচু বাঁধে উঠে আছড়ে পড়বে। ওই ভুলো—সে তাকে নৃশংসভাবে ডুবিয়ে অথবা পাথরে আছড়ে মেরে নিঃশব্দে হাসবে!

মনে পড়ছিল এখানকার গল্প। চলিত গল্প এই যে, বহুকাল পূর্বে এই মাঠে একজন পাষণ্ড বন্ধুর ছদ্মবেশে একজনকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে মাঠের মধ্যে হত্যা করেছিল। তখন থেকে সেই খুন-হওয়া মানুষটি এখানে ভুলো ভূত হয়ে আছে। সুযোগ পেলেই আত্মীয় বা বন্ধুর বেশ ধরে অন্যমনস্ক মানুষকে এমনিভাবে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে। মনে পড়ল আমাদের গ্রামের সুধীরবাবুকে ঠিক এমনি সন্ধেবেলা তাঁর দাদা সেজে এসে ডেকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অন্য মানুষের চোখে পড়েছিল—তাই রক্ষা পেয়েছিলেন; তারা তাঁকে ধরে ফেলেছিল। তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর অবশ্য জ্ঞান হয়ে সুস্থ মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু কেউ না-দেখলে হয়তো তাঁরও বিপদ ঘটত।

আরও অনেক ঘটনা। ঠিক ওই রেললাইনে একটা মাইলপোস্ট যেখানে পোঁতা আছে ওইখানেই নাকি এই ভুলোর আত্মা ঘুরে বেড়ায়। ওইখানেই নাকি তাকে-তাকে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

ভাবছি—এমন সময় একজনকে পেলাম। সে শশী ডোম। আমাদের ওখানকার বিখ্যাত চোর। লম্বা ছিপছিপে মানুষ। শশী চুরির জন্যে জেল খেটেছে অনেকবার কিন্তু কেউ কখনও তাকে ধরতে পারে নি। তিন হাত সামনে থেকে ছুটলে মিনিটে তিন হাত ব্যবধান সাত হাত হয়ে যায় এবং পাঁচ মিনিটে সেটা বেড়ে পঁচিশ হাত এবং তারপরই সে মিলিয়ে যায়। এমন তার গতিবেগ। এমন সে দৌড়ুতে পারে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা রেললাইনের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলে গেছে এবং নদীর ব্রিজের ঠিক মুখটায় একটা অন্যটাকে কেটে চলে গেছে। মনে হল, শশী যদি সেই দৌড় দৌড়ে যায় তাহলে নিতোর আগেই হয়তো ব্রিজের মুখটা আগলাতে পারে। নিতোকে যদি ভুলো নদীতে নিয়ে গিয়ে ফেলে তবে হাত নেই, কিন্তু যদি ব্রিজের বাঁধে তুলে পাথরে আছড়াতে চায় তবে হয়তো শশী তাকে রক্ষা করতে পারবে। নিতোকে ধরে ফেলতে পারবে।

শশীকে বললাম—শশী একবার চেষ্টা করতে পারিস। তুই একবার সেই দৌড় দে না বাবা। গিয়ে দাঁড়া ব্রিজের উপর।

শশী বললে—যদি নদীতে যায়—

বললাম—তা হলে হাত নেই। তবু দেখ!

শশী ছুটল এবং শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মধ্যে মিনিট দু-তিনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ছুটবার সময় শশীর হাঁটুতে মটমট শব্দ হত। সে শব্দটাও শুনতে পেলাম না। পিছন পিছন আমি এবং দু-তিন জন ছুটলাম। তখনও আমার ফুটবল খেলা অভ্যাস ছিল। দৌড়ুতে আমিও পারতাম। বয়সও তখন তিরিশ-একত্রিশ।

ওদিকে মাঠের মধ্যে শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রিতে জলো মাঠের মধ্যে কয়েকটা আলো ছুটোছুটি করছে, দিশাহারার মতো ছুটছে, কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে কখনও সোজা; আর তার সামনে একটা বুক ফাটানো ডাক—দাঁড়া রে! দাঁড়া রে! দাঁড়া রে! পাঁড়ে রে!

সম্মুখে তার ছুটেছে পাঁড়ের ছদ্মবেশী প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেত ভুলো-প্রেত। তাকে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, দেখছে শুধু ওই ভুলোর ছলনায় মোহগ্রস্থ নিতো। দু-হাত বাড়িয়ে সে

BanglaBook.org

ছুটছে—তাকে ধরবে, তাকে ধরবে! 'পাঁড়ে ভাই!' তার কাছে স্থান বিলুপ্ত, কাল বিলুপ্ত, সব বিলুপ্ত। এতগুলো আলো সে দেখতে পাচ্ছে না। এত ডাক সে শুনতে পাচ্ছে না। পায়ের তলায় কাঁটা বিঁধছে সে বুঝতে পারছে না। ভুলো ছলনায় তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। সে হাঁপাচ্ছে, হৃদপিণ্ড ফেটে পড়তে চাইছে, স্থির চোখদুটো হয়তো ঠিকরে বেরিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে—তবু তার থামবার উপায় নেই। মুহূর্তে মুহূর্তে তার বন্ধুকে ধরবার ব্যগ্রতা উদ্দাম থেকে উদ্দামতর হয়ে উঠছে। পরম বন্ধুর ছদ্মবেশী প্রেত নিঃশব্দ হাসি হেসে বলছে—আয় আয় আয়। ওই নদীতে পাথারে ঝাঁপ খাব দুজনে। কিংবা আয় না ওই পুলের বাঁকের উপর দুজনে জাপটাজাপটি করে পড়ব পাথরের উপর। তারপর দুজনে বসে—হি-হি-হি কত মজা করব!

ছুটছিলাম আর ভাবছিলাম। পাকা রাস্তাটা রেললাইনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিকে বেঁকল পুব মুখ থেকে দক্ষিণ মুখে, সামনে দেড়শ গজ দূরে লাইন আর রাস্তা একসঙ্গে মিলেছে। এরপর রাস্তাটা চলে গেছে রেললাইন ক্রস করে পুবদিকে। যদি ওইখানে—শশী গিয়ে—।

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হল না। অন্ধকার চিরে শশীর ডাক শুনলাম,—ধ-রে-ছি!

ধরেছে! শশী ধরেছে! আহ্!—আমরা আরও জোরে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম মানুষের কাছে ভুলো হয় হেরেছে, নয় নিতোকে নিয়ে খানিকটা নিষ্ঠুর আমোদ করে বা এতগুলো মানুষের ব্যগ্রতা দেখে নদীতে না-ডুবিয়ে ওই পুলের বাঁধের উপর তুলে শশীর হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

আমরা যেতে যেতে যে-আলোগুলো নিতোর পিছনে এতক্ষণ ব্যর্থ ছোটাছুটি করেছে তারা এসে গেল। স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়াল।

আমরা পৌঁছে দেখলাম, শশী নিতোকে ধরেছে। দশ-বারোটা আলো চারদিকে তাকে ঘিরে রয়েছে। সর্বাঙ্গ জলকাদায় ভরা, তার সঙ্গে রক্তের চিহ্ন—নিতো বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। তার চোখদুটো স্থির জবাফুলের মতো রাঙা। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। দৃষ্টি বিহ্বল; এবং নির্বাক। বোবা! লোকে ডাকছে—নিতো! নিতো! সে বোবা। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

দেখতে দেখতে এল তার বাবা, তার দাদা, তার মা, স্ত্রী।—

তারা ডাকলে—নিতো বাবা! নিতো!

ভাই ডাকলে—নিতো রে নিতো!

স্ত্রী ডাকলে—ও গো! ওগো!

কিন্তু নিতো বোবা, নিতো কালা। সে বসে আছে সেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। কাউকে সে চিনতে পারছে না। এবার এল সত্যকারের পাঁড়ে।—নিতো রে নিতো।

নিতো তাকেও চিনলে না। সে সব ভুলে গিয়েছে।

নিতোর জ্ঞান-চেতনা ফিরল অদ্ভুতভাবে। তাকে ধরে নিয়ে আসা হল বাড়িতে। নির্বাক বিহ্বল নিতো যন্ত্রের পুতুলের মতো এল। আমি ডাক্তার দেখাবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু তাদের বাড়ির দোরে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে সে ভয়ার্ত চিৎকার করে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর চোখেমুখে জল সিঞ্চনের ফলে তার জ্ঞান ফিরল।

তার মা ডাকলে—নিতো।

এবার নিতো সাড়া দিলে—অ্যাঁ। তারপর বলে—পাঁড়ে? পাঁড়ে কোথায়?

পাঁড়ে সামনে এসে বললে—এই যে! আমি তো ঘরেই রইছি রে। তু এমন করে ছুটছিলি ক্যানে?

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে দেখে বললে—তাহলে সে কে? অবিকল তোর মতো! বলেই শিউরে উঠে চোখ বুজল।

অনেকক্ষণ পর বললে—বাবুর কাছে পয়সা নিয়ে আমি গেলাম পানু সহিসের বাড়ি। মনে করলাম তু সেখানে জমে গিয়েছিস। তা দেখলাম সেখানেও তু যাস নাই। তখন দু-ঢোক মদ খেয়ে রেললাইন ধরে আসছি। মুখ আঁধার হয়েছে, তোর কথাই ভাবছি এমন সময় ওই মাইলের কাছে পাথরের ওপরে দেখলাম তু বসে রইছিস। আমি বললাম—পাঁড়ে। তা সে ঠিক তু—সে এসে আমাকে বললে—শালা মজা, ভারি মজার—আয়!

বললাম—কোথা?

তা আমাকে লাথি মেরে বললে—আয় ক্যানে শালা। ভারি মজা হবে। বলে, লাইন থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে ছুটতে লাগল। আমি বললাম, দাঁড়া দাঁড়া। তা সে হিহি করে হেসে বললে, আয় শালা আয়।—কী ছুট ছুটল। আমিও ছুটলাম। দাঁড়া রে দাঁড়া রে।

থামল নিতো। বললে—এক গেলাস জল খাব।

তার বাবা বললে—বাবা ভুলোতে ধরেছিল বাবা! খুব বেচেঁছিস রে। ওই নিমচের জোলের ভুলো!

নিতো শিউরে উঠল।

পণ্ডিতেরা শুনে বলেন—ভুলো ভূত নয়। প্রেতও নয়। ভুলো ভুল। নিতোরই মনের ভুল। মদের নেশার মধ্যে শুধু পাঁড়ের কথা ভাবতে ভাবতে আসছিল; তার মন থেকে বেরিয়ে এসেছিল পাঁড়ের একটা কল্পনায় গড়া ছবি। সে যত তাকে ধরবার জন্যে ছুটছে তত ছবিটাও ছুটেছে। ক্রমে উন্মত্তের মতো নিতো ছুটেছে। ভুলে গেছে সবকিছু।

আমিও ভেবেছি। যুক্তি তাইই বলে। মনের কল্পনা। যা একাগ্রমনে ভাবে মানুষ তা ঘুমের ঘোরে নেশার ঘোরে, এমনকি চিন্তা যদি খুব গভীর হয় তবে এইভাবেই মানুষ ভুল দেখে। ভুল শোনে। এ ভুল মনই করায়।

তোমরা যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে এইভাবে পথ হেঁটো না একলা অন্ধকারে। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ো না।

এ-কথার পরেও কিন্তু আমার এই নিমচের জোলের ভুলো-প্রেত সম্পর্কে সংশয় যায় নি। মনে পড়ে এই মাঠে ওই জায়গাতেই অনেক মানুষ এমনি ভুল করেছে। এই ঘটনার বছরখানেক পরে আমি দেখেছিলাম একজনকে। এমনি করেই মাইলখানেক পথ হেঁটেছিলাম। সে অন্য কাহিনী। এবং কে যেন বলে মানুষের হিংসা মানুষের পাপ নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেত করেছে—সে যুগান্ত ধরে এমনি করেই সুযোগ পেলে ভুলিয়ে নিয়ে ছুটবে—নদীর দিকে, পাথরের দিকে, পুকুরের গভীর জলের দিকে আর অট্ট হেসে বলবে—আয়-আয়-আয়—হি-হি-হি—আয়! কেমন মজা দেখ!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কামিনী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেশনে ট্রেন থামিতেই হ্যাট-কোট পরা সুরনাথবাবু নামিয়া পড়িলেন। স্টেশনটি ছোট, তাহার সংলগ্ন জনপদটিও বিস্তীর্ণ নয়, ট্রেন দু-মিনিট থামিয়া চলিয়া গেল।

সুরনাথ ঘোষ একজন পোস্টাল ইন্সপেক্টর। সম্প্রতি এদিকটার গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি নূতন পোস্টঅপিস খুলিয়াছে, সুরনাথবাবু সেগুলি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি এদিকে কখনো আসেন নাই।

ছোট সুটকেসটি হাতে লইয়া তিনি স্টেশনে বাহির হইলেন, সঙ্গে অন্য কোনো লটবহর নাই। সুটকেসের মধ্যে আছে একসেট প্যান্টুলুন, ধুতি, গামছা, সাবান, দাঁত মাজিবার বুরুশ ইত্যাদি।

স্থানীয় পোস্টঅফিসটি স্টেশনের কাছেই। ডাক এবং তার দুই-ই আছে, কিন্তু সবই শহরের অনুপাতে; একজন পোস্টমাস্টার, একটি কেরানি ও দুজন পিওন। পোস্টঅফিসের পশ্চাদ্ভাগে পোস্টমাস্টার সপরিবারে বাস করেন।

বেলা আন্দাজ এগারটার সময় সুরনাথবাবু পোস্টঅফিসে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, পোস্টমাস্টার খাতির করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে আহারাদির ব্যবস্থা পোস্টমাস্টারবাবুর বাসাতেই হইল।

মধ্যাহ্নভোজনের পর সুরনাথবাবু ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার ধড়াচূড়া পরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর লইয়াছেন, যে-তিনটি পোস্টঅফিস পরিদর্শনে তিনি যাইবেন তাহার মধ্যে সবচেয়ে যেটি নিকটবর্তী সেটি বারো মাইল দূরে। কাঁচা-পাকা রাস্তা আছে। সুরনাথ 'তার'-পিওনের সাইকেলটি ধার লইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার সময় উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছিবেন, কাল সকালে সেখানকার পোস্টঅফিস তদারক করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসিবেন, তারপর আবার অন্য পোস্টঅফিসের উদ্দেশে যাত্রা করিবেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৯—১৯৭০
বিহারের পূর্ণিয়ায় জন্ম। ১৯১৫ সালে মুঙ্গের জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় আসেন। ১৯১৯ সালে কলাকাতা থেকে বি এ এবং ১৯২৬ সালে আইন পাস করেন পাটনা থেকে। আইন ব্যবসা ছেড়ে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন ১৯২৯ সালে। বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা গল্প সাহিত্যের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয় তাঁর হাতে। ব্যোমকেশ বক্সী নামীয় গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করে খ্যাতিমান। ইতিহাসের কাল নিয়ে উপন্যাস লিখেও বিশেষভাবে খ্যাত। বেশ কিছুকাল ফিল্ম কোম্পানি বোম্বে টকিজ-এর সঙ্গে চাকরিসূত্রে যুক্ত। *গৌড়মল্লার*, *তুঙ্গভদ্রার তীরে*, *ঝিন্দের বন্দী*, *তুমি সন্ধ্যার মেঘ*, *চুয়াচন্দন*, *বিষের ধোঁয়া* তাঁর উল্লেখযোগ্য বই।

সাইকেলের পশ্চাদ্ভাগে ছোট সুটকেসটি বাঁধিয়া সুরনাথ তাহাতে আরোহণের উদ্যোগ করিলে পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'এখান থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে রাস্তা দু-ফাঁক হয়ে গেছে। ডানহাতি রাস্তা দিয়ে গেলে একটু ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু আপনি ওই রাস্তা দিয়েই যাবেন।'

সুরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন বাঁ-হাতি রাস্তাটা কী দোষ করেছে?'

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'ও রাস্তাটা ভালো নয়।'

সাইকেলে আরোহণ করিয়া সুরনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি শহরের এলাকা পার হইলেন। তারপর অবারিত মুক্ত দেশ।

দেশটা বর্ণসংকর। অবিমিশ্র পলিমাটি নয়, আবার নির্জন মরুকান্তারও নয়। স্থানে স্থানে ঘন বন আছে, কোথাও নিস্তরুপাদপ শিলাভূমি, কোথাও নরম মাটির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুক্ষ পাথরের ঢিবি মাথা তুলিয়াছে। এই বিচিত্র ভূমির উপর দিয়া নির্জন পথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে।

আকাশে পৌষ মাসের স্নিগ্ধ সূর্য, বাতাসে আতপ্ত আরাম। সুরনাথ প্রফুল্ল মনে মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। মাত্র বারো-চৌদ্দ মাইল পথ সাইকেলে যাইতে কতই-বা সময় লাগিবে।

সুরনাথের বয়স চল্লিশ বছর। মধ্যমাকৃতি দৃঢ় শরীর, মুখশ্রী মোটের উপর সুদর্শন। তিনি বিপত্নীক, বছর-তিনেক আগে স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। আবার বিবাহের প্রয়োজন তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন, কিন্তু বিপত্নীকত্বের ফলে যে ক্ষণিক স্বাধীনতাটুকু লাভ করিয়াছেন তাহা বিসর্জন দিতেও মন চাহিতেছে না।

তিনি যখন ছয় মাইল দূরস্থ পথের দ্বিভুজে পৌঁছিলেন তখন সূর্য পশ্চিমদিকে অনেকখানি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সম্মুখে দুইটি পথ ক্রমশ পৃথক হইতে হইতে ধনুকের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে; মাঝখানে উঁচু জমি, তাহার উপর তাল-খেজুরের গাছ মাথা তুলিয়া আছে।

হঠাৎ কোথা হইতে ক্ষুদ্র একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল, চারিদিকে অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গেল। সুরনাথ পথের সন্ধিস্থলে সাইকেল হইতে নামিলেন।

আশেপাশে নিকটে-দূরে জনমানব নাই। আকাশ নির্মল, কেবল সূর্যের মুখের উপর একটুকরা মেঘ লাগিয়া আছে, যেন সূর্য মুখোশ পরিয়াছে, সুরনাথ একটু চিন্তা করিলেন। এখনো ছয়-সাত মাইল পথ বাকি, আধঘণ্টার মধ্যেই সূর্য অস্ত যাইবে; অন্ধকার হইবার পূর্বে যদি গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে না পারেন, দিকভ্রান্ত হইবার সম্ভবনা।

পোস্টমাস্টার বলিয়াছেন বাঁ-হাতি রাস্তা ভালো নয়, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট। সুতরাং বাঁ-হাতি রাস্তা দিয়া যাওয়াই ভালো।

সুরনাথ সাইকেলে চড়িয়া বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিলেন। পোস্টমাস্টার মিথ্যে বলেন নাই, পথ অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ, কিন্তু সাবধানে চলিলে আছাড় খাইবার ভয় নাই। সুরনাথ সাবধানে অথচ দ্রুত সাইকেল চালাইলেন।

সূর্যের মুখ হইতে মেঘ কিন্তু নড়িল না। মনে হইল মুখে মুখোশ আঁটিয়াই সূর্যদেব অস্ত যাইবেন।

মিনিট-কুড়ি সাইকেল চালাইবার পর সুরনাথ সামনে একটি দৃশ্য দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। অস্পষ্ট আলোতে মনে হইল যেন রাস্তার দু-ধারে ছোট ছোট কুটির দেখা যাইতেছে, দু-একটা আবছায়া মূর্তিও যেন সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

আরো কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া সুরনাথ ব্রেক কষিলেন। একটি ছোট মাটির কুটির যেন মন্ত্রবলে রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আশেপাশে অন্য কোনো কুটির দেখা যায় না; এই কুটিরটি যেন গ্রামে প্রবেশের মুখে প্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া আছে।

সুরনাথ রাস্তার ধারে যেখানে সাইকেল হইতে নামিলেন সেখানে হইতে তিন গজ দূরে

BanglaBook.org

কুটিরের দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস দিয়া একটি যুবতী বসিয়া আছে। সুরনাথের চোখের সহিত তাহার চোখ চুম্বকের মতো আবদ্ধ হইয়া গেল।

চাষার মেয়ে! গায়ের রং মাজা পিতলের মতো পীতাভ, দেহ যৌবনের প্রাচুর্যে ফাটিয়া পড়িতেছে। মুখের ডৌল দৃঢ়, তাহাতে প্রগলভতার সমাবেশ। মাথার অযত্নবিন্যস্ত চুলের প্রান্তে একটু পিঙ্গলতার আভাস, চোখের তারা বড় বড়। পরিধানে কেবল একটি কস্তাপাড় শাড়ি, অলঙ্কার নাই। সধবা কি বিধবা কি কুমারী বোঝা যায় না। তার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন আগুন-রাঙা চুল্লির দিকে চাহিয়া আছি।

'হ্যাঁগো, তুমি কোথায় যাবে?' যুবতী প্রশ্ন করিল। দাঁতগুলি কুন্দশুভ্র, গলার স্বর গভীর ও ভরাট; কিন্তু কথা বলিবার ভঙ্গি গ্রাম্য।

সুরনাথের বুকের মধ্যে ধকধক করিয়া উঠিল। দীর্ঘকালের অনভ্যস্ত একটা অন্ধ আবেগের স্বাদ তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি লঘুচেতা লোক নন, সবলে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, 'রতনপুর।'

যুবতী দাওয়ার কিনারায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে প্রগলভতা ছাড়াও এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ুশিরায় আগুন ধরাইয়া দিতে পারে। শেষে হাসি থামাইয়া সে বলিল, 'রতনপুর যে অনেক দূর, যেতে যেতেই রাত হয়ে যাবে, পৌঁছতে পারবে না।'

সুরনাথ রাস্তার দিকে চাহিলেন। দূর হইতে যে-গ্রামের আভাস পাইয়াছিলেন সন্ধ্যার ছায়ায় তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। তিনি উদ্বেগ স্বরে বলিলেন, 'তাহলে গ্রামে কি কোথাও থাকবার জায়গা আছে?'

'এখানেই থাকো না!'

সুরনাথ চকিতচক্ষে যুবতীর দিকে চাহিলেন। যুবতীর দৃষ্টিতে দুরন্ত আহ্বান, আরো কত রহস্যময় ইঙ্গিত। সুরনাথের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি শরীর শক্ত করিয়া নিজেকে সংবরণ করিলেন, একটু স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'বাড়ির পুরুষেরা কোথায়?'

যুবতী দূরের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বলল, 'তারা মাঠে গেছে, সারারাত ধান পাহারা দেবে। মাঠে ধান পেকেছে, পাহারা না দিলে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে।'

সুরনাথ কণ্ঠের মধ্যে একটা সংকোচন অনুভব করিলেন, বলিলেন, 'তা—যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই থাকব।'

যুবতী দশনচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া হাসিল, প্রায়ান্ধকারে তাহার হাসিটা তড়িদ্দীপালির মতো ঝলকিয়া উঠিল। সে বলিল, 'তোমার গাড়ি দাওয়ায় তুলে রাখো! আমি আসছি।'

যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল, একটি মাদুর আনিয়া দাওয়ার একপাশে পাতিয়া দিল। এক ঘটি জল ও গামছা খুঁটির পাশে রাখিয়া বলিল, 'হাত-মুখ ধোও। চা খাবে তো? আমি এখনি তৈরি করে আনছি।'

যুবতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। সুরনাথ হাত-মুখ ধুইয়া মাদুরে বসিলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। আলোর পীতবর্ণ ধারা দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িল।

বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। চরাচর গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সুরনাথ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মানসিক অবস্থার বর্ণনা অনাবশ্যক। ব্যাধ-শরাহত মৃগ, বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মানসিক অবস্থা কে কবে বিবৃত করিয়াছে!

'এই নাও, চা এনেছি!' চা দিতে গিয়া আঙুলে আঙুলে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইল—'আমি রান্না

BanglaBook.org

চড়াতে চললুম।'

সুরনাথ ক্ষীণস্বরে আপত্তি তুলিলেন, 'আমার জন্যে আবার রান্না কেন? ঘরে মুড়ি-মুড়কি যদি কিছু থাকে, তাই খেয়ে শুয়ে থাকব।'

'ওমা মুড়ি-মুড়কি খেয়ে কি শীতের রাত কাটে! রাত উপোসী হাতি টলে। তোমার অত লজ্জায় কাজ নেই, একঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে।'

যুবতী চলিয়া গেল। সুরনাথ চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন। পিতলের বাটিতে গুড়ের চা, কিন্তু খুব গরম। তাহাই ছোট ছোট চুমুক দিয়ে পান করিতে করিতে তাঁহার শরীর বেশ চাঙা হইয়া উঠিল।

সুরনাথ লক্ষ করিয়াছিলেন কুটিরের মধ্যে দুটি ঘর—একটি রান্নাঘর, অপরটি বোধহয় শয়নকক্ষ। তিনি অনুমান করিলেন দাওয়ায় মাদুরের উপর তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইবে। সেই ভালো হইবে। কোনোমতে রাত কাটাইয়া ভোর হইতে-না-হইতে তিনি চলিয়া যাইবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে যুবতী দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'ভাত বেড়েছি খাবে এস।'

সুরনাথ উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের ঠাণ্ডার তুলনায় ঘরটি বেশ উত্তপ্ত। পিঁড়ের সামনে ভাতের থালা, প্রদীপটি কাছে রাখা হইয়াছে, আয়োজন সামান্যই, ভাত ডাল এবং একটা চচ্চড়ি জাতীয় তরকারি।

সুরনাথ আহারে বসিলেন। যুবতী অতি সাধারণ গৃহস্থালির কথা বলিতে বলিতে ঘরের এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরনাথ লক্ষ করিলেন রান্না করিতে করিতে যুবতী কখন পায়ে আলতা পরিয়াছে।

যুবতী সুরনাথের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতেছে, অথচ তিনি হুঁ হাঁ ছাড়া কিছুই বলিতেছেন না। বিপদের সময় যে ডাকিয়া ঘরে আশ্রয় দিয়াছে, খাইতে দিয়াছে, তাহার সহিত অন্তত একটু মিষ্টালাপ করিবার প্রয়োজন আছে। তিনি শামুকের মতো খোলের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'তোমার নাম কী?'

একঝলক হাসিয়া যুবতী বলিল, 'কামিনী'।

নামটা তপ্ত লোহার মতো সুরনাথের গায়ে ছ্যাঁক করিয়া লাগিল। তিনি শামুকের মতো আবার খোলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আহারান্তে সুরনাথ হাত-মুখ ধুইলে কামিনী বলিল, 'পাশের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছি, শুয়ে পড় গিয়ে।'

সুরনাথের বুক ধড়াস করিয়া উঠিল। তিনি তোতলা হইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি—আমি বাইরে মাদুরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।'

কামিনী গালে হাত দিয়া বলিল, 'ওমা, বাইরে শোবে কী! শীতে কালিয়ে যাবে যে! যাও বিছানায় শোও গিয়ে।'

সুরনাথ কথা কাটাকাটি করিলেন না, কামিনী রাত্রে কোথায় শুইবে প্রশ্ন করিলেন না, দণ্ডাজ্ঞাবাহী আসামির মতো শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। মেঝের উপর খড় পাতিয়া তাহার উপর তোশক বিছাইয়া শয্যা। সুরনাথ সুটকস আনিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিলন, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াই শয়ন করিলেন!

চোখ বুজিয়া তিনি পাশের ঘরে খুটখাট ঠুমঠাম বাসন-কোসনের শব্দ শুনিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনের উত্তাপ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল।

BanglaBook.org

চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি আচ্ছন্নের মতো হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চটকা ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন, কামিনী নিঃশব্দে কখন তাঁহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়াছে; তাহার মুখে বিচিত্র হিংস্রমধুর হাসি।

তিন দিন পর্যন্ত সুরনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন না তখন পোস্টমাস্টার বাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কেবল সুরনাথবাবুর জন্যে নয়, সেই সঙ্গে পোস্টঅফিসের সম্পত্তি সাইকেলটিও গিয়াছে। পোস্টমাস্টার পুলিশে খবর দিলেন।

পুলিশ খোঁজ লইল। সুরনাথের যে-তিনটি পোস্টঅফিসে যাইবার কথা সেখানে তিনি যান নাই। পুলিশ তখন রীতিমতো তদন্ত আরম্ভ করিল।

সাতদিন পরে সুরনাথকে পাওয়া গেল। বাঁ-হাতি রাস্তায় একটিও কুটির নাই, সেই রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে! সাইকেলটা অনতিদূরে মাটিতে লুটাইতেছে, তাহার পশ্চাতে সুরনাথের সুটকেস রহিয়াছে, সুটকেসের মধ্যে কাপড়-চোপড় সাবান মাজন বুরুশ সমস্তই মজুত আছে! কিছু খোয়া যায় নাই।

সুরনাথের দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন নাই। কিন্তু দেহটি প্রাচীন মিশরীয় 'মমির' মতো শুষ্ক ও অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, যেন রক্ত-চোষা বাদুড় দেহটা শুষিয়া লইয়াছে।

পুলিশ হাসপাতালে লাশ চালান দিল। পোস্টমাস্টার যখন সুরনাথের মৃত্যু-বিবরণ শুনিলেন তখন তিনি আক্ষেপে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা! ডাইনির হাতে পড়েছিলেন! কামিনী ডাইনি এখনো তল্লাটে আছে, মায়া বিস্তার করে বেচারিকে টেনে নিয়েছিল। আমি ইন্সপেক্টারবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বাঁ-হাতি রাস্তা ভালো নয়। কিন্তু উনি শুনলেন না।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অবর্তমান

ব ন ফু ল

বনফুল

১৮৯৯—১৯৭৯

জন্ম বিহারের পুর্নিয়া জেলার মনিহারপুর গ্রামে। ১৯১৮ সালে পুর্নিয়ার সাহেবগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। হাজারিবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আই এস সি পাশ করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। পরে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি পাস করেন ১৯২৭ সালে। কলকাতার একটি ল্যাবরেটরিতে কিছুকাল শিক্ষানবিশি করে মুর্শিদাবাদ আজমগঞ্জ হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার পদে যোগ দেন। কিছুকাল চাকরি করে পরে স্বাধীনভাবে ভাগলপুরে ডাক্তারি শুরু করেন। ১৯১৮ সালে শনিবারের চিঠি পত্রিকায় ব্যঙ্গ-কবিতা লিখে সাহিত্য জগতে প্রবেশ। প্রবাসী পত্রিকায় অতি সংক্ষিপ্ত গল্প লিখে ছোটগল্পের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধারা প্রবর্তন করেন। ঔপন্যাসিক হিসাবেও বিশিষ্ট। উপন্যাস স্থাবর ও জঙ্গম বাংলা সাতিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কাহিনীর মৌলিকতা, ব্যঙ্গ ও রসিকতা, মননশীলতা এবং চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্য তাঁকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত আসনে আসীন করেছে। *বনফুলের গল্প*, *বনফুলের আরো গল্প*, *বাহুল্য*, বিন্দুবিসর্গ তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। কবি ও নাট্যকার হিসাবেও তাঁর অবদান বিশিষ্ট। *শ্রীমধুসূদন* এবং *বিদ্যাসাগর তাঁর* বিখ্যাত জীবনীমূলক নাটক।

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে করে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যাঁরা কখনও এ-কার্য করেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না হয়তো যে, ব্যাপারটা ঠিক কী জাতীয়। ধু-ধু করছে বিরাট বালির চর, মাঝে মাঝে ঝাউগাছের ঝোপ, এক ধার দিয়ে শীতের শীর্ণ গঙ্গা বইছে। চারদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। হু-হু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে একটা। কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ-দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকালবেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি, খেয়াঘাট থেকে কতদূরেই বা চলে এসেছি, তা খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল, সারাজীবন ধরে যেন হাঁটছিই, অবিশ্রান্ত হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ-অঞ্চলে আগন্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি-আধটি নয়, তিনটি নেশা আছে আমার—ভ্রমণ, সংগীত এবং শিকার। এখানে এসেই শুনলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গঙ্গায় পাখি পাওয়া যাবে, লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দুক কাঁধে করে বেরিয়ে পড়লাম। লোভ শুনে মনে করবেন না যে, আমি মাংস খাবার লোভেই পাখি মারতে বেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিষাশী। আলুভাতে ভাত পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চরে এসে প্রথম যখন পৌঁছলাম, তখন হতাশ হয়ে পড়তে হল আমাকে। কোথায় পাখি! ধু-ধু করছে বালির চড়া, আর কোথাও কিছু নেই। গঙ্গার বুকে দু-একটা উড়ন্ত মাছরাঙা ছাড়া পাখি কোথায়! বন্দুক কাঁধে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় কাঁআঁ, শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে শব্দটা হয়, চখার শব্দটা ঠিক সে-রকম নয়, তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ

শুনেই বুঝলুম চখা আছে, কোথাও কাছে-পিঠে। একটু এগিয়ে গিয়েই দেখি, হ্যাঁ ঠিক, চখাই বটে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম মাত্র একটি দেখে। চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বুঝলাম, দম্পতির একটিকে কোনো শিকারি আগেই শেষ করে গেছেন। এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোচাতে হবে। সাবধানে এগুতে লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম। চখা মারা সহজ নয়। দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আবার সাবধানে এগুতে লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি, বন্দুকটি বাগিয়ে বসতে যাব, আর অমনি—কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরক্ত হলে চলবে না, চখা শিকার করতে হলে ধৈর্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল। আমিও বসলাম। উপর্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়—একটু বসুক। একটু পরেই উঠলাম আবার। আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম, কিন্তু উল্টো দিকে। পাখিটা মনে করুক যে, আমি তার আশা ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি যেন। কিছুদূর গিয়ে ও-ধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছুদূর ঘুরতে হল—প্রায় মাইলখানেক। গুড়ি মেরে মেরে খুব কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাগ্ করে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব, আর অমনি—কাঁআঁ।

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধরে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ পরে বসল যদি, কিন্তু এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় বসল যে, সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোক চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখিটাকে। সোজা এগিয়ে চললাম। আমি ভেবেছিলাম, একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়ল না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম; ঠায় বসে রইল। মনে হল অসম্ভব বুঝি সম্ভব হয়; কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি—কাঁআঁ।

এবারেও এমন জায়গায় বসল যার কাছে-পিঠে কোনো আড়াল-আবডাল নেই—চতুর্দিকে ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হল। এবার গিয়ে বেশ ভালো জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছিও আসতে পারলাম—এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল—ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লাগল না। ঝোপে-ঝোপে যা দু-একটা ছোট পাখি ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙাগুলোও চেঁচাতে শুরু করে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা থিতুতে আধঘণ্টারও ওপর লাগল। নদীর ঠিক বাঁকের মুখটাতেই বসল আবার চখাটা গিয়ে।

আমি বসেছিলুম একটা বালির ঢিপির উপর, মুশকিল হল—উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল, না বালির স্তর দিয়ে কোনোরকম সন্দেশই গিয়ে পৌছল তার কাছে, তা বলতে পারি না। উঠে দাঁড়ালাম। রোক আরও চড়ল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জল রক্তরাঙা। পাখিটা ও-পারের চরে গিয়ে বসেছে। সমস্ত দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিই নি—ও-ও আমাকে দেয় নি। এখন দুজনে দু-পারে। চুপ করে রইলাম।

সূর্য ডুবে গেল। অস্তমান সূর্যকিরণে গঙ্গার জলটা যত জ্বলন্ত লাল দেখাচ্ছিল, সূর্য ডুবে যাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল চতুর্দিক। সমস্ত

BanglaBook.org

অন্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ন বৈরাগ্য জেগে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। পূরবী রাগিণী যেন মূর্ত হয়ে উঠল আকাশে, বাতাসে, নদীতরঙ্গে। হঠাৎ মনে পড়ল—বাড়ি ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানি না।

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্যগগনে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দিকে জোছনায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসেই রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনও পড়ি নি। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল যদিও, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ মন সত্তা অধিকার করে বসল। আমি মুগ্ধ হয়ে বসে রইলাম। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। মনে হল কত জায়গায় কতভাবে ঘুরেছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনও চোখে পড়ে নি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমার চোখে পড়ে নি। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হল আজীবন সব দিক দিয়েই আমি বঞ্চিত। জীবনের কোনও সাধটাই কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনের তিনটি শখ ছিল—ভ্রমণ, সংগীত, শিকার। ভ্রমণ করেছি বটে—ট্রেনে স্টিমারে চেপে এখানে-ওখানে গেছি কিন্তু তাকে কি ভ্রমণ বলে? হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্ত-প্রসারিত অনিশ্চয়তায়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে, হিমশীতল মেরুপ্রদেশের ভাসমান তুষার পর্বতশৃঙ্গে যদি-না ভ্রমণ করতে পারলাম, তা হলে আর কী হল!

সংগীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেধেছি বটে; কিন্তু সংগীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকাল এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে আমাকে। সেদিন অত চেষ্টা করেও বাগেশ্রীর করুণগম্ভীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে। ঠিক ঘাটে ঠিকভাবেই আঙুল পড়ছিল ; কিন্তু সেই সুরটি ফুটল না, যাতে আত্মসম্মানী গম্ভীর ব্যক্তির নির্জন-রোদনের অবাঙ্‌ময় বেদন মূর্ত হয়।

শিকারই বা কী এমন করেছি জীবনে? সিংহ, হাতি, বাঘ, গণ্ডার কিছুই মারি নি। মেরেছি পাখি আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হল।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপরে চখাটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিরা সাধারণত রাত্রে তো ওড়ে না—হয়তো ভয় পেয়েছে কোনোরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁআঁ—কাঁআ—

আরও খানিকটা নেবে এল।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে ফায়ার করে দিলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লেগেছে ঠিক। পাখিটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম, ভেসে যাচ্ছে।

যাক। জীবনে যা বারবার হয়েছে, এবারও তাই হল।

পেয়েও পেলাম না। সত্যি, জীবনে কখনই কিছু পাই নি, খোলের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ করে বসেছিলাম।

চতুর্দিকে ধু-ধু করছে বালি, গঙ্গার কুলুধ্বনি অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে, জোছনায় ফিনকি ফুটছে। শিকার, চখা, বন্দুক, সমস্ত দিনের শ্রান্তি কোনোকিছুর কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সাগরে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় ঋজুদেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করতে

BanglaBook.org

করতে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখন বা নদীতে নাবলেন, কিছুই দেখতে পাই নি।

একটু ইতস্ততের পর জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে?

লোকটি এতক্ষণ আমাকে লক্ষই করেন নি। আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল; ফিরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল—তারপর বললেন, আমি এখানেই থাকি। আপনিই আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন।

পরিচয় দিলাম।

ও, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি? আসুন আমার সঙ্গে, কাছেই আমার আস্তানা।

দীর্ঘকায় ঋজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। একটু দূর গিয়েই দেখি, একটি ছোট্ট কুটির। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সমস্ত দিন এ-অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি, এটা চোখে পড়ে নি আমার। ছোট্ট কুটিরটি যেন ছবির মতন, সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ, চতুর্দিকে রজনীগন্ধার গাছ, অজস্র ফুল। অনাবিল জোছনায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে গুচ্ছগুচ্ছ রজনীগন্ধার ঊর্ধ্বমুখ বিকাশে। মৃদু সৌরভে চতুর্দিকে আচ্ছন্ন। আমিও আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এসেই ঘরের ভেতর ঢুকেছিলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এবং শতরঞ্জি-গোছের কী একটা পাততে লাগলেন।

বসুন।

বসে দেখলাম শতরঞ্জি নয়—গালিচা। খুব দামি নরম গালিচা। তিনিও একপ্রান্তে এসে বসলেন। বলা বাহুল্য, আমার কৌতূহল ক্রমশই বাড়ছিল। তবে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম, তিনিও চুপ করে রইলেন। শেষে আমাকেই কথা কইতে হল।

সমস্ত দিন এ-অঞ্চলে ঘুরেছি, কিন্তু আপনার দেখা পাই নি কেন ভেবে আশ্চর্য লাগছে।

সব সময় সব জিনিস কি দেখা যায়?

মুখের দিকে চেয়ে ভয় হল, চোখদুটো জ্বলছে—মানুষের নয়, যেন বাঘের চোখ।

একটা গল্প শুনুন তা হলে। রাজা রামপ্রতাপ রায়ের নাম শুনেছেন?

না।

শোনবার কথাও নয়। দুজন রামপ্রতাপ ছিল, দুজনেই জমিদার, একজন সুদখোর আর একজন সুরখোর।

সুরখোর?

হ্যাঁ, ও-রকম সুর-পাগল লোক ও-অঞ্চলে আর ছিল না। যত বিখ্যাত ওস্তাদদের আড্ডা ছিল তাঁর বাড়িতে। আমার অবশ্য এসব শোনা কথা। আমার পাঞ্জাবে জন্ম, পাঞ্জাবি ওস্তাদের কাছেই গান-বাজনা শিখেছিলুম। বাংলাদেশে এসে শুনলুম, রামপ্রতাপ নামে নাকি একজন গুণী জমিদার আছেন, যিনি সুরের প্রকৃত সমঝদার। প্রকৃত গুণীকে কখনও ব্যর্থমনোরথ হতে হয় নি তাঁর কাছে, গাড়িতে একজনের মুখে কথায় কথায় শুনলুম। তখনই যদি তাঁকে ঠিকানাটাও জিজ্ঞেস করি, তা হলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু তা না করে আমি সপ্তাহখানেক পরে আর-একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, রাজা রামপ্রতাপ রায় কোথায় থাকেন? তিনি বলে দিলেন সুদখোর রামপ্রতাপের ঠিকানা। ডানকুনি স্টেশনে নেমে দশ ক্রোশ হাঁটলে তবে নাকি তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। একদিন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর উদ্দেশে। ডানকুনি স্টেশনে যখন নামলাম, তখন বেশ রাত হয়েছে। সেদিনও পূর্ণিমা। স্টেশনে আর-একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। সুদখোর রামপ্রতাপ ও-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক, সবাই চেনে। যাকে জিজ্ঞেস করলুম, সে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে, সোজা চলে যান। চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলেছিলাম তা ঠিক বলতে

BanglaBook.org

পারি না। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটা বিরাট প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি, চারদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ, কোথাও কিচ্ছু নেই। মনে হল যেন শেষও নেই।

কিছুদূরে গিয়েই হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড রাজবাড়িটা দেখা গেল, যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হল—শাদা ধবধব করছে, মনে হল যেন মর্মর পাথর দিয়ে তৈরি। মিনার, মিনারেট গম্বুজ, সিংহদ্বার সমস্ত দেখা গেল ক্রমশ। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ, তারপর এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের দুপাশে দেখি দুজন বিরাটকায় দারোয়ান বসে আছে, দুজনেই নিবিষ্টচিত্তে গোঁফ পাকাচ্ছে বসে। ভিতরে ঢুকব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কোনো উত্তরই দিল না, গোঁফ পাকাতে লাগল। একটু ইতস্তত করে শেষে ঢুকে পড়লাম, তারা বাধা দিলে না। ভিতরে ঢুকে দেখি বিরাট ব্যাপার, বিশাল জমিদারবাড়ি জমজম করছে; প্রকাণ্ড কাছারি-বাড়িতে বসে আছে সারি সারি গোমস্তারা। কেউ লিখছে, কেউ টাকা গুনছে, কেউ কেউ কানে কলম গুঁজে খাতার দিকে চেয়ে আছে, সবারই গম্ভীর মুখ। সামনে চত্বরে বসে আছে অসংখ্য প্রজা সারি সারি। সবাই কিন্তু চুপচাপ, কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আমি তানপুরা ঘাড়ে করে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না। আমারও সাহস হল না কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে, আমি ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। আমার মনের ইচ্ছা রাজা রামপ্রতাপকে গান শোনাব, কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলাম, কিছুদূরে ছোট্ট একটা বাগান রয়েছে, বাগানের মধ্যে ধবধবে শাদা মার্বেল পাথরের উঁচু চৌতারা, আর সেই চৌতারার উপরে কে একজন ধবধবে শাদা তাকিয়া ঠেস দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। গড়গড়ার কুণ্ডলী-পাকানো নলের জরিগুলো জোছনায় চকমক করছে। বাগানে ছোট্ট একটি গেট, গেটের দুধারে উর্দি-চাপরাশ-পরা দুজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেন পাথরের প্রতিমূর্তি। কেমন করে জানি না, আমার দৃঢ় ধারণা হল, ইনিই রাজা রামপ্রতাপ। এগিয়ে গেলাম। দারোয়ান দুজন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাধা দিলে না। রাজা রামপ্রতাপের কাছাকাছি এসে ঝুঁকে প্রণাম করলাম একবার।

তিনি গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়লেন একবার শুধু। আস্তে আস্তে বললাম, হুজুরকে গান শোনাব বলে এসেছি, যদি হুকুম করেন—

তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকেও বসতে বললেন। তারপর কখন যে আমি দরবারি কানাড়ার আলাপ শুরু করেছি আর কতক্ষণ ধরে যে সে আলাপ চলেছে, তা আমার কিছুই মনে নেই। যখন হুঁশ হল তখন দেখি, একছড়া মুক্তোর মালা তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মালাটা দেখবেন?

কুটিরের ভিতর ঢুকে গেলেন তিনি, পরমুহূর্তেই তিনি বেরিয়ে এলেন একছড়া মুক্তোর মালা নিয়ে। অমন সুন্দর এবং অত বড় বড় মুক্তো আমি আর দেখি নি কখনও।

তারপর?

আমাকে মালা পরিয়ে দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। আমি চুপ করে বসেই রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছু মনে নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি, রাজবাড়ি কাছারি-চৌতারা লোকজন—কোথাও কিছু নেই, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুয়ে ঘুমুচ্ছি!

একা! কী রকম?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা—কেউ নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হল মারা গেছেন। বেঁচে আছে সেই সুদখোর ব্যাটা। তার বাড়ির পথ সবাই

BanglaBook.org

আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই তিনি মাঠের মাঝখানে আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বকশিশ দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই।

হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, গান শুনবেন?

যদি আপনার অসুবিধে না হয়—

অসুবিধে আবার কী? সুরের সাধনা করবার জন্যেই আমি এই নির্জনবাস করছি—

আবার উঠে গেলেন। কুটিরের ভিতর থেকে বিরাট এক তানপুরা বের করে বললেন, বাগেশ্রী আলাপ করি শুনুন।

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্রী। ও-রকম বাগেশ্রীর আলাপ আমি কখনও শুনি নি। যা নিজে আমি কখনও আয়ত্ত করতে পারি নি কিন্তু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলাম তাই যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাও জানি না। ঘুম ভাঙল যখন, তখন দেখি, আমি সেই ধু-ধু বালির চড়ায় একা শুয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চখাটা চরে বেড়াচ্ছে, মরে নি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গল্পটা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলাম। শিকার উপলক্ষেই আমরা এ-অঞ্চলে আসিয়া সন্ধ্যাবেলা এই ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারি শুনিয়া তিনি নিজের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্প আমাদের বলিলেন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর?

তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবার শুতে যান, আপনাদের তো আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাচ্ছে—

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতূহল হইল, কোন্ অঞ্চলের গঙ্গার চরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলে আমরাও একবার জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। চতুর্দিকে দেখিলাম, কেহ নাই।

ডাকবাংলার চাপরাসিকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলাম, পাশের ঘরে যে-ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি কোথাকার লোক। চাপরাসি উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো কোনো লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ-ডাকবাংলায় কেহ বড় একটা আসিতে চায় না।—বলিয়া সে অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বউমা

মনোজ বসু

রাত দুপুরে মোটর-বাস রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গেল। গাঁ-গ্রাম নেই কোনো দিকে। আউশ ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। দুর্যোগও বিষম। হু-হু করে হাওয়া বইছে। রাস্তা থেকে উড়িয়ে ধান বনে ফেলে না দেয়। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি। অন্ধকারে চারিদিক মুছেপুঁছে গেছে। একমাত্র সুবিধে ঝিলিক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। সেই আলোয় পথ দেখে এগুচ্ছি।

অথচ কোনো গোলমাল হবার কথা নয়। সন্ধ্যা নাগাদ নামিয়ে দেবে। পালকি থাকবে। বাস থেকে নেমেও পালকি, এই সমস্ত লিখেছিল দীপেশ। বি-ডি অর্থাৎ ব্লক ডিপার্টমেন্ট অফিসে কাজ করে সে। মাইল তিনেক পথ। কাঁচারাস্তা বটে, কিন্তু বাঁকচুর নেই, নাকের সোজা চলে গেছে। অন্ধ মানুষও আঁধারে চলে যেতে পারে। আর আমার জন্যে তো পালকি। দীপেশ সবিস্তারে সমস্ত জানিয়েছিল।

কিন্তু বাসটা বদমায়েশি করল। কিন্তু গোড়ায় বেশ ভালো চলছিল। এ্যাসিস্টেন্ট বার পাঁচ-সাত হ্যান্ডেল করতেই গর্জন করে উঠল, ড্রাইভার গদি থেমে নেমে এসে ইঞ্জিনের সামনে পথের উপর গড় হয়ে প্রণাম করল। ভাবখানা, ত্যাঁদড়ামি করো না আজকের এই দুর্যোগের দিনে। এক দৌড়ে গিয়ে কেশবপুর থানার সামনে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও, রাতের মতন নিশ্চিত। বাসও যেন কানে নিল কথাটা। ভক্-ভক্ আওয়াজ করে গরু ছাগল মানুষ জনকে ভয় দেখিয়ে দিব্যি স্ফূর্তিতে দৌড়াচ্ছে। কুয়োছার হাট ছাড়িয়ে এসে মাথায় যে কী কারতানি ভর করল—একেবারে নিশ্চুপ। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কত কাণ্ড করছে ড্রাইভার—এটা খুলছে, ওটা খুলছে, ইঞ্জিনের তলায় ঢুকে যাচ্ছে এক-একবার। কিছুতে কিছু নয়। শেষটা নিজে উঠে গদির ওপর বসে যত প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিল। বলে,—ঠেলুন মশায়রা—

পঁচিশজনের পঞ্চাশখানা হাত ঠেলছে তো গাড়িও চলতে লাগল। ঠেলা বন্ধ হল তো গাড়িও অচল। বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে

মনোজ বসু
১৯০১—১৯৮৭
যশোরের ডোঙ্গাঘাটা গ্রামে। কলকাতা রিপন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯১৯ সাল এন্ট্রান্স পাশ করেন, বাগেরহাট কলেজে এফ এ ভর্তি হন। কিন্তু তখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তাতে যোগ দেন। কলকাতার সাউথ সুবার্বন কলেজ থেকে ডিস্টিংশন সহ ১৯২৪ সালে বি এ পাশ করেন। উপন্যাস লিখে খ্যাতিমান। *নিশিকুটুম্ব*, *মানুষ গড়ার কারিগর*, *জলজঙ্গল* তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। *বনমর্মর*, *দেবী কিশোরী*, *একদা নিশীথ কালে* তাঁর ছোট গল্পের বই। সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকীও সম্পাদনা করেছেন। গ্রামবাংলার নিসর্গ ও গ্রামীণ মানুষের জীবনাচরণ তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও মানুষের জীবন সংগ্রাম তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গাড়ি যেন নেশা করে বুঁদ হয়ে আছে, আমরা ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।

প্যাসেঞ্জাররা চেঁচামেচি করে, এ বেশ মজা হল। ঠেলতে ঠেলতে কেশবপুর পৌঁছে দিতে হবে নাকি? ভাড়া নিয়েছ তবে কেন?

ড্রাইভার বলে, বেশ, সিটে উঠে পড়ুন তবে মশায়রা। তাতে যদি গাড়ি কেশবপুর পৌঁছে দেয়, আমার কোন্ ক্ষতি?

না, তোমার ক্ষতি কোনো দিকে নয়। গাড়ি না চলে তো আমরা ঠেলব, চললে তখন তো ইঞ্জিনই টানছে। তুমি থাকো আরাম করে গদির উপরে।

আজেবাজে কথার জবাব না দিয়ে ড্রাইভার নির্বিকারে বিড়ি ধরাল একটা।

আমাদের কষ্টে ও কাকুতি-মিনতিতে শেষটা বুঝি ইঞ্জিনের দয়া এল খানিকটা। আওয়াজ দিয়ে উঠল হঠাৎ! চলতেও শুরু করল। কিন্তু খানিকটা গিয়ে বুঁদ হয়ে আসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। পুনশ্চ ধস্তাধস্তি। এমনিভাবে যেখানে ঠিক সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছবার কথা, সেখানে রাত্রি বারোটায় এনে থামিয়ে দিল।

দিয়েই ছুট। ড্রাইভার বলে, দেরি করতে গেলে আবার বিগড়ে যাবে; তা হলে চিত্তির। নামবার সময়টুকু দেয় না এমনি অবস্থা।

ছুটে বেরুল মোটর-বাস। নিরন্ধ্র অন্ধকার। ছড়ছড় করে বৃষ্টি এল একপশলা। কাঁচারাস্তায় জলকাদা ভেঙে চলেছি। বিপদের ওপর বিপদ—মাঠের উল্টোপাল্টা হাওয়া ছাতায় বেধে পটপট করে কতগুলো শিক ভেঙে গেল। ছাতার কাপড় উড়ছে ঘুড়ির মতন পত্‌পত্ করে। তখন আর চলা নয়—দৌড় দস্তুরমতো। তেপান্তর মাঠ থেকে ছুটে পালিয়ে গাঁ-গ্রামের কোথাও আশ্রয় পেতে চাই।

ছুটছি, ছুটছি। নদীর উপর এলাম। নদীর কথাও দীপেশ লিখেছিল বটে। নদীর উপরে পাকা পুলের কথা। পথ ভুল করিনি তবে। কিন্তু আর তো পেরে উঠি নে। শীত ধরে গিয়ে সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছে, পা চলতে চাইছে না। অসাড় হয়ে পথের উপর পড়ে না যাই, এই এখন ভয়।

ঝিলিক দিল একবার। দেখলাম পুলটা ছাড়িয়ে অদূরে অশ্বত্থতলায় পাকা ঘর। চুনকাম করা শাদা দেয়াল বিদ্যুতের আলোয় ঝিকঝিক করে উঠল। খেতে চাইনে, জায়গার অকুলান থাকে তো এমনকি শোওয়ার কথাও বলব না। রাতটুকু মাথা গুঁজে থাকবার মতো আশ্রয়।

কড়া নাড়তে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। এমন নিশিরাত্রে জেগেই ছিল ভিতরের মানুষ। মাথায় আধ-ঘোমটা ফুটফুটে এক তরুণী বউ দরজা খুলে দিল।

পিছনে এক বুড়োমানুষ। বিদ্যুৎ চমকাল এই সময়। দেখলাম, কাঁদছিল বউটা। এখনো সামলে নিতে পারেনি। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। দু গালে জলের ধারা গড়াচ্ছে। কোন্ দুঃখে জানি না, ঘরে খিল এঁটে বসে কাঁদছিল। বুড়োর সঙ্গেই বা কী সম্পর্ক বউটার—।

বুড়ো পরিচয় দিয়ে দিলেন, আমার বউমা। দাঁড়িয়ে কেন বাবা, ভিতরে এস। বৃষ্টিতে নেয়ে গেছ একেবারে। শুকনো কাপড়-চোপড় আছে তো সঙ্গে—

হাতের কিডব্যাগ দেখিয়ে দিলাম। মোটামুটি সমস্ত আছে। বুড়ো বললেন—ও বউমা, রসবার একটা কিছু পেতে দাও খাটের উপর। বাছার বড় কষ্ট হয়েছে।

কী মোলায়েম কথা বুড়োমানুষটির। কথা শুনে সব কষ্ট জুড়িয়ে যায়। চেহারাটিও মুনি ঋষির মতন। বউটি বলবার আগেই বেরিয়ে চলে গেছে। ব্যাগ খুলে শুকনো কাপড় বের করে পরলাম। মাদুর বালিশ চাদর হাতে করে বউ ফিরে এল। পরিপাটি করে পেতে দিল।

BanglaBook.org

যেমন শ্বশুর তেমনি বউ—কী ভালো যে এরা! কিন্তু বড় দরিদ্র। নড়বড়ে ছোট একখানা খাট একেবারে খালি পড়ে ছিল। মাদুর বালিশ চাদরে বিছানা করছে—তাও অতি জীর্ণ। চুপি চুপি বলছি, দোষ দেবেন না—সাধারণ অবস্থায় অমন চাদরে পা মুছি নে আমরা।

বিছানা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে—আমি বললাম, রাতদুপুরে রাঁধাবাড়ার হাঙ্গামায় যাবেন না আবার। মনিরামপুরে গাড়ি অচল হয়েছিল, সেই সময়টা ভরপেট খেয়ে নিয়েছি।

বউটি বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

বুড়ো দেখছি মজলিশি মানুষ। এতরাত্রি, তবু খাটের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন।

—একেবারে কিছু খাবে না বাবা? না, লজ্জা করে বলছ? ছেলের মতো তুমি, খুলেই বলি। দুর্যোগে অতিথি হয়ে এলে। সত্যি ভাবনা হয়েছিল, কী খেতে দিই এখন? বউমার মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তবু সে মেয়ে বড় ভালো। তুমি নিজে থেকে মানা না করলে এতক্ষণে রান্নাবান্না বসিয়ে দিত।

সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, কাঁদছিলেন যেন উনি —কী হয়েছে?

ফোঁস করে বুড়ো এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বড় দুঃখের বৃত্তান্ত। সংসারে আগুন ধরে গেল। রোজগেরে ছেলে বাসা থেকে দূর করে দিল আমাদের। আগে বউমাকে দিল, তারপর আমাকে। একটা বেলার এদিক ওদিক। বাপ-বেটি সেই থেকে এখানে আশ্রয় নিয়ে আছি। ছেলে আবার বিয়ে করছে শুনতে পেলাম। বউমা ছেলেমানুষ তো—খবর শোনা অবধি দু-চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে তার।

স্তম্ভিত হয়ে গেছি। বুড়ো আরও কত কী বলে যাচ্ছেন, একবর্ণ আমার কানে যাচ্ছে না। নিরপরাধ এই সুন্দরী মেয়েটাকে ত্যাগ করেছে! এবং বাপ বোধ হয় পুত্রবধূর হয়ে দু-কথা বলতে গিয়েছিলেন, সেজন্য তাকেও তাড়িয়েছে। সেই পাষণ্ড টোপর মাথায় দিয়ে আবার নতুন বউ আনতে চলল। হাতের সামনে পেলে লোকটাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম, তাতে আমার জেল ফাঁসি যা হবার হত। এই সমস্ত ভাবছি। এমন সময় বুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দরজা দিয়ে শুয়ে পড় বাবা। আমরা এই পাশেই রইলাম।

জোর বৃষ্টি বাতাস তখন বাইরে। বড্ড ধকল দিয়েছে, শুতে-শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। মড়ার মতন ঘুমিয়েছি। যখন ঘুম ভাঙল দরজা খুলে দেখি, বিস্তর বেলা হয়েছে। চারিদিকে রোদ, রাত্রিবেলার এত দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই।

চলে যাওয়ার আগে বুড়োমানুষটিকে দু-এক কথা বলে যাওয়া উচিত। বড় ভালো লোক এরা। আরে সর্বনাশ, এ কোন্ জায়গা! ঘরের ঠিক পিছনে শ্মশানঘাট মজা নদীর কূলে। আধপোড়া কাঠ, ভাঙা কলসি, ছেঁড়া মাদুর-বালিশ ইতস্তত ছড়ানো—গ্রামে শ্মশানের যে-চেহারা হামেশাই দেখা যায়। যে কুঠুরিতে রাত্রিবাস করেছি, সেটা শ্মশান-বন্ধুদের বসা-ওঠার জায়গা। দেয়ালে সাল তারিখ সব খোদাই করা আছে, রাত্রিবেলা নজরে আসে নি--নবীনচন্দ্র মালাকার নামে কোনো এক ব্যবসায়ী পিতামাতার আত্মার কল্যাণে এই ঘর বছরখানেক আগে বানিয়ে দিয়েছেন। আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে শ্বশুর আর পুত্রবধূ গেলেন কোথায় তবে?

ঘণ্টাখানেক পরে বি. ডি. অপিসে হাজির হলাম। অদূরে দীপেশের কোয়ার্টার। ইস্কুলে পড়বার সময় দীপেশ অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিল আমার। অনেক বছর পরে হঠাৎ এই সেদিন শিয়ালদা স্টেশনে দেখা। বিয়ের বাজার করে ফিরছে। আমায় নিমন্ত্রণ করে হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বারংবার যাবার জন্য বলল। কথা না দিয়ে পারলাম না। সেই কথা রাখতে

BanglaBook.org

গিয়ে এত দুর্ভোগ।

আমায় দেখে দীপেশ কলরব করে উঠল। বিয়ের তারিখ কাল। আত্মীয়-স্বজন কিছু কিছু এসে পড়েছেন, ভিড় জমেছে মন্দ নয়; বলে, এক গলা কথা জমে আছে, চল্। চেঁচিয়ে চা খাবার দিতে বলে টানতে টানতে তার নিজের ঘরখানায় নিয়ে চলল।

ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। সামনের দেয়ালে হাসিমুখে এক তরুণীর ছবি। ঠিক তার উল্টোদিকের দেয়ালে বুড়োমানুষটি। কাল রাত্রে শ্বশুর তার পুত্রবধূ সেই যে-দুজনকে দেখেছিলাম। স্তম্ভিত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি, এ ছবি কাদের?

আমার স্ত্রী নীরা। আর ইনি হলেন বাবা। দীপেশের চোখ ছলছল করে ওঠে—এই কোয়ার্টারে আসার পরেই সর্বনাশ হল, কলেরা হয়ে দুজনে মারা গেলেন। একই দিনে—সকাল আর বিকেল। আট মাস হয়ে গেল দেখতে দেখতে। বউমা বলতে বাবা অজ্ঞান হতেন। বউ যেতেই তাই যেন তিনি আর দেরি করলেন না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বন্ধু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নিচে প্রায় সদর দরজার কাছেই ছোট্ট একটা ঘরে বিনোদ শোয়,—এবং একা শোয়, নিচেটা একদম ফাঁকা, তবু কিছুতে বিনোদের ভয় নেই। সেদিন তাদের পাশের বাড়ির ছাদে যে একটা জলজ্যান্ত খুন হল—এত হইচই, এত কান্নাকাটি—এবং তারই ঘরের পাশের গলি দিয়ে যে সেই রক্তাক্ত মৃতদেহটা মোটরে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল—এতেও বিনোদের ঘুম ভাঙে নি। মা তাকে জাগাতে এলে বলেছিল,—পায়ের দিকের জানালাটা খুলে দাও, যা গরম আজ!

মা বললেন,—তুই ওপরে চল্, আমার কাছে শুবি!

বিনোদ পাশ-ফিরে বলল,—কিসের তোমার ভয়! এত গোলমালে সেই খুনেটা তো আর ঘুপটি মেরে বসে থাকে নি, কখন দিব্যি সরে পড়েছে। সে আবার এখানে ফিরে আসবে নাকি?

মা অবুঝের মতো বললেন,—না, তুই চল্ ওপরে। তুই এ-ঘরে একা থাকিস্ বলে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। চ্যাঁচালেও শুনতে পাব না।

—চ্যাঁচানি তোমাদের শুনতে দেব নাকি ভেবেছ? যদি ব্যাটা আসে, টুঁটি টিপে তার দম বন্ধ করে দেব না?

তার দিদি বললেন,—কিন্তু যাকে মেরেছে, সে যদি জানলা দিয়ে এসে মুখ বাড়ায়?

বিনোদ হেসে বলল,—তার মুখটা ভালো করে দেখবার জন্যই তো পায়ের দিকের জানলাটা খুলে রাখতে বললাম। মুখ যদি বাড়ায়-ই তবে নেহাত না-হয় দুটো গল্প করা যাবে।

কিছুতেই বিনোদের ভয় নেই। তার স্কুলের বন্ধুরা কত ষড়যন্ত্র করে তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে রাত্রিবেলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মশারির দড়ি নাড়ে, ঢিল ছোড়ে, বিকট স্বরে হরিবোল দেয়, চাকরের হাতে পয়সা গুঁজে দরজা খুলিয়ে ওর তক্তপোশের তলায় গিয়ে লুকোয়,—গোঁ গোঁ করে, ঠুকঠাক দুমদাম্ শব্দ করে, কিন্তু বিনোদের যেই ঘুম সেই ঘুম। শেষকালে আরশোলার উৎপাতে ওরাই

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৯০৩--১৯৭৬

জন্ম নোয়াখালি জেলায়। কলাকাতার সাউথ সুবার্বান কলেজ থেকে ১৯২০ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯২২ সালে একই কলেজ থেকে আই এ এবং ১৯২৪ সালে বি এ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে এম এ এবং ১৯২৯ সালে আইন পাশ করেন। ১৯৩১ সালে মুন্সেফ হিসাবে চাকরি জীবনের শুরু। কালক্রমে জেলা জজ পর্যন্ত পদোন্নতি হয়। ১৯৬০ সালে চাকরি থেকে অবসর নেন। রবীন্দ্রোত্তর কবিতা আন্দোলনে আধুনিকতাবাদী কবিদের অন্যতম। *অমাবস্যা, আমরা, প্রিয়া ও পৃথিবী, উত্তরায়ণ* তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা গ্রন্থ। উপন্যাসও লিখেছেন। আঙ্গিক, রচনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিশিষ্ট উপন্যাস *বেদে*, উপন্যাস *পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, উদ্যত খড়্গ, জৈষ্ঠের ঝড়*ও বিখ্যাত হয়। *কল্লোল যুগ* নামে তাঁর রচিত স্মৃতিকথাটি বাংলা সাহিত্যের এক স্থায়ী সম্পদ। প্রচুর সংখ্যক ছোটগল্প লিখেছেন। *টুটাফুটা, হাড়ি মুচি ডোম, কাঠ খড় কেরোসিন, চাষাভূষা, একরাত্রি* তাঁর গল্পগ্রন্থ।

বেরিয়ে আসতে পথ পায় না, গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলে, কিছুতেই তোকে ভয় দেখাতে পারলুম না বিনু।

বিনোদ হেসে বলে—দুবেলা যে নিয়মিত ডন-বৈঠক করে, তার আবার ভয় কী? খেয়ে হজম করি আর গভীর করে ঘুমাই—

শেষকালে অভয়কে বলতে হয়,—একা-একা বাড়ি ফিরে যেতে আমারই এখন ভয় হচ্ছে!

বিছানা থেকে ঝট করে লাফিয়ে উঠে বিনোদ বলে,—চল্ তোকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

রাত তখন প্রায় বারোটা! রাস্তা-ঘাট নিঝুম। বিনোদ তার বিছানায় অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এমন সময় সদর-দরজার কড়া নড়ে উঠল। কে যেন গলা খাঁকরে ডাকলে—বিনু, বিনু!

সাধারণত এত সহজে বিনোদের ঘুম ভাঙে না, কিন্তু সেই অস্ফুট কণ্ঠের ডাক শুনে চট করে তার ঘুম ভেঙে গেল। এমন অনেক কালা আছে চেঁচিয়ে কথা বললে তার এক বর্ণও যারা শুনতে পায় না, কিন্তু চলন্ত ট্রেনের শব্দের মধ্যেও আস্তে তাদের একটু নিন্দে করলে তেড়ে উঠে বলে,—কী বললে? ভাবো, আমি শুনতে পাই নি? বিনোদেরও আজ সেই দশা! চুপি-চুপি কেউ তাকে ভয় দেখাতে এসেছে বুঝি? কিন্তু সবসময়েই সে সাবধানি! জোরে ডাকলে সে তেমনি ঘুমোয় বটে, কিন্তু আস্তে ডাকলে জেগে উঠতে জানে।

পাছে লোকটা সাড়া পেয়ে পালায়, বিনোদ তাই কোনো কথা না বলে হাতে একটা লকলকে বেত নিয়ে নিঃশব্দে সদর-দরজা খুলে দিল।

সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে অভয় হাসছে।

বিনোদ তো অবাক! বলল,—তুই এই সময়? এত রাত্রে? কী দরকার?

অভয় ভিতরে ঢুকে বলল,—সাড়ে নটার শো-তে বায়োস্কোপে গিয়েছিলাম। এই ফিরছি।

—বাড়ি যাস নি?

অভয় চাপা গলায় বলল,—বাড়ি আর ফিরব না।

—কেন, কী হল?

—বাবা-মা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন!

বিনোদ বিস্মিত হয়ে বলল,—তাড়িয়ে দিয়েছেন। কেন? কী অপরাধ—?

—অপরাধ আবার কী! ও-বাড়িতে আমার আর পোষাবে না।

তারপর ঘরের চৌকাঠের দিকে পা বাড়িয়ে বললে—চল্ ভেতরে, বলছি।

ঘরের এককোণে ক্যানভাসের একটা ইজি-চেয়ার, তার উপর বসে অভয় বলল,—তোর এখানে আজ আমি শোব। দিবি তো শুতে?

বিনোদ আলো জ্বালাল। বলল,—স্বচ্ছন্দে!

আলোতে বিনোদ দেখলে অভয় অত্যন্ত অদ্ভুত সেজেছে। গায়ে গরদের পাঞ্জাবির ওপরে দামি শাল, পরনে নীল সিল্কের ধুতি, পায়ে জরির জুতো, হাতের কব্জিতে সোনার রিস্ট-ওয়াচ বাঁধা। সারা গায়ে এসেন্সের গন্ধ ভুরভুর করছে। পরিপাটি করে টেরি বাগানো। ডান হাতের আঙুলে হীরের একটা আংটি।

বিনোদ বলল,—এত সেজেগুজে বেরিয়েছিস। চেহারা দেখে তো ত্যাজ্যপুত্তুর হয়েছিস বলে মনে হয় না!

অভয় হেসে বলল, বাবা-মা বাড়ি থেকে বার করে দিলেন বটে, কিন্তু যতকিছু আমার

BanglaBook.org

জিনিস ছিল, সব সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বললেন,—এই নাও তোমার জিনিসপত্তর, আর এ-মুখো হয়ো না বাছাধন! যেখানে খুশি বেরিয়ে পড়। সেই-যে জাপানি বাক্সটায় রোজ দু-আনা চারআনা করে জমাতাম বিনু, সেই বাক্স ভেঙে সব খুচরো সিকি-আধুলি আমার পকেটে দিয়ে দিয়েছেন। বললেন—যেখানকার খুশি টিকিট কেটে ভেসে পড়, তোমার ঐ কালো মুখ আর দেখতে চাইনে।

বিনোদ বিছানায় বসে অভয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। পরে বলল,—কিন্তু কী তুই করেছিলি শুনি?

—বলছি। অভয় হাত বাড়িয়ে বলল,—তোর ম্যাপের বইটা দে তো।

—কী করবি?

—একটা জায়গা খুঁজে বের করব। খুব দূরে—যেখানে মানুষ সহজে যেতে চায় না। ধর, গ্রিনল্যান্ড—বছরে ছ-টা মাস সেখানে রাত, কঠিন বরফের দেশ—পড়িস নি ভূগোলে?

বিনোদ হেসে উঠল। বলল—কিন্তু পকেটে মাত্র তো কয়েকটা টাকার খুচরো দেখতে পাচ্ছি। ঐ নিয়ে তুই গ্রিনল্যান্ডে যাবি?

টেবিলের উপর 'য়্যাটলাসটা' পড়ে ছিল, সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে অভয় পাতা উলটোতে লাগল। বলল,—এমন জায়গায় যাব, যেখানে যেতে ভাড়া লাগে না।

বিনোদ হেসে বলল,—আপাতত দেখছি সে তো আমার শোবার ঘর। তুই পাগলামি করিস নে অভয়। চল্, তোকে বাড়ি রেখে আসি। বাবা বকে থাকেন, এখন নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অভয় বলল,—খুঁজুন গে! কিন্তু একবার যখন বেরিয়েছি, আর আমি ফিরছি না। জাহাজে করে আমি স্পেনে যাব, সেখান থেকে কলম্বাসের মতো নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করতে বেরুব। জাহাজ না পাই, সঙ্গী না জোটে, তবু আমি পেছ-পা হব না। নে, আলোটা নেবা—আজ রাতটা তো এখানে ঘুমোই!

বিনোদ বলল—আমার বিছানায় উঠে আয়। দুজনে খুব ধরবে।

অভয় বলল,—না, না, আমি চিৎ হয়ে আরাম করে শুতে পারব এখানে। একটা বালিশ এগিয়ে দে দেখি। বলে সে নিজেই আলো নিবিয়ে একটা বালিশ টেনে পিঠের তলায় রেখে আবার বলল,—নে তুই এখন শুয়ে পড়। ঢের রাত হয়েছে। কাল ভোরে উঠে চা খেতে-খেতে না-হয় কর্তব্য ঠিক করা যাবে।

বিনোদ বলল,—এমনি তোর ঘুম আসবে? হতভাগা, উঠে আয় ওপরে।

অন্ধকারে অভয় খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল,—পাগল! ঘুম আসবে না কী! ইস্কুলে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে পর্যন্ত ঘুমুই, আর এ তো দিব্যি মোলায়েম একটি চেয়ার! কলম্বাসের মতো যে দেশ-জয়ে বেরুবে, তাকে খালিগায়ে শীতের রাতে শুকনো কাঠের ওপর শুলেও বেমানান দেখাবে না। থাম, তোকে আর বকাব না, ঘুমো।

বিনোদের একটুতেই ঘুম আসে, কিন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে থেকেও কিছুতেই আজ তার ঘুম এল না। অভয়ের সঙ্গেই আরো খানিকক্ষণ গল্প করা যাক। চোখ না-মেলেই ডাকল,

—অভয়!

অভয়ের কোনো সাড়া নেই। মেরুদণ্ডে চোট খেয়েও ঘুমের তার একবিন্দু ব্যাঘাত হয় নি। আবার ডাকল,—অভয়!

সেই অন্ধকার কালোরাত্রি, আর সেই স্থূল নিঃশব্দতা।

BanglaBook.org

বিনোদ লাফিয়ে উঠে বসল। ঘরে কেউ নেই! ম্যাপের খাতাটা মেঝের উপরে উলটানো, চেয়ারের উপরে বালিশটা কুঁচকে পড়ে আছে। দরজাটা খোলা।

বিনোদ ঘর ছেড়ে সদর-দরজার কাছে এল—সদর-দরজাটাও দু-ফাঁক।

অভয় আবার কখন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেছে!

দুষ্টু ছেলে তাকে ভয় দেখাবার নতুন ফন্দি করেছে বুঝি! কিন্তু বিনোদ দমবার পাত্র নয়। গরম কোটটা গায়ে দিয়ে সে রাস্তায় নামল। কোথাও একটা জনপ্রাণী নেই, নিজের দ্রুত ও সশব্দ নিশ্বাস ছাড়া একটা সামান্য শব্দও কোথাও শুনতে পাচ্ছে না।

আবার সে ডাকল,—অভয়!

মুহূর্ত-মধ্যে তার খুব কাছে খিলখিল করে কে খুব জোরে হেসে উঠল এবং সেই খণ্ড-খণ্ড হাসির ঢেউ মিলিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল অভয়। বিনোদ বলল,—কোথায় গেছলি?

—বাহ্, এইখানে তোর পাশেই তো দাঁড়িয়ে ছিলাম! ঘরের মধ্যে ভীষণ গরম—অত গরমে কখনো ঘুম আসে!

—গরম কী রে পাগলা? এই কনকনে শীতের রাতে তোর গরম লাগছে?

অভয় হেসে বলল,—গরম বলে গরম! চারিদিকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠছে। টিকতে পাচ্ছি না। চল্ রাস্তায় একটু হাঁটি!

বিনোদ ভাবল, মন্দ নয়, বেড়াতে-বেড়াতে গল্পের ফাঁকে অভয়কে তাদের বাড়ির দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে পূর্ণবাবুকে ডেকে তাঁর ছেলেকে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেবে।

বিনোদ বলল,—চল্, কিন্তু সদর-দরজাটা যে খোলা থাকবে? দাঁড়া, ভজুয়াকে বলে আসি বন্ধ করে দিতে! থাকগে, ডাকতে গেলেই আমার মা টের পাবেন। ভেজিয়েই আসি দরজাটা! খানিক বাদেই তো ফিরে আসছি, কী বল?

অভয় বলল,—তোর ভাবনা কী। তোকে তো আর বাপ-মা তাড়িয়ে দেয় নি! আমারই জন্য না-হয় বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

দু-বন্ধু বড় রাস্তায় এসে পড়ল। কারুর মুখে কোনো কথা নেই!

বিনোদ ভয় পেয়ে বলল,—এবার ফের।

অভয় হেসে বলল,—কোথায়? এই তো বেশ যাচ্ছি।

খানিক দূরে কয়েকজন লোক এদিকে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। একজনকে বিনোদের মনে হল খানিকটা পূর্ণবাবুর মতো দেখতে। লোকজন নিয়ে ছেলের খোঁজে বেরিয়েছেন নিশ্চয়! অভয়কে এবার স্বচ্ছন্দে ধরিয়ে দেওয়া যাবে। গায়ের জোরে বিনোদের সঙ্গে কখনই এঁটে উঠবে না।

লোকগুলো না বেঁকে সামনে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে দেখে বিনোদ ভরসা পেলে। অভয়কে বুঝতে না দিয়ে বললে—হ্যাঁ, আরো একটু বেড়াই আয়।

অভয় বলল,—কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। বাবা ঐ এসে পড়লেন বলে। তার কাছে আমি সেই সাতআনা পয়সা ধারতুম না—সেই যে রেস্টুরেন্টে খাইয়েছিলি? এই নে, চট করে—বলে, সে পকেট হাতড়ে কতকগুলো পয়সা বার করল, বলল—গুনে নে, শিগগির! বাবা, মেজদা, ন-কাকা, রাম খুড়ো—সব এসে পড়লেন বলে। দেরি নয়, শিগগির তুলে নে পয়সাগুলো আহাম্মক—বলে পয়সা-ভরা হাত মেলে অভয় কাঁপতে লাগল। এখুনি সে যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে!

বিনোদ এরি জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত ছিল। গায়ের জোরে তার সঙ্গে তাদের স্কুলের

BanglaBook.org

ছাত্র দূরের কথা, মাস্টাররাই পেরে ওঠেন না। সে তাড়াতাড়ি অভয়কে দুই শক্ত হাতে জাপটে ধরে বলল,—কিন্তু কোথায় তুই যাবি? তোকে ধরিয়ে দেব না আমি?

কিন্তু কোথায় অভয়? বিনোদ দু-হাত দিয়ে নিজেরই বুকটা জোরে চেপে ধরে নিজের সঙ্গে অকারণ ধস্তাধস্তি করছে।

অভয় কোথাও নেই। কখন টুপ করে সরে পড়েছে! নিশ্চয় এই পাশের গলি দিয়ে। এখনো ছুটলে তাকে ধরা যায়। দেখতে দেখতে পূর্ণবাবু দলবল নিয়ে কাছে এসে পড়লেন। বিনোদ তখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

পূর্ণবাবুকে দেখে তার বুকে বল এল। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনারা অভয়কে খুঁজতে বেরিয়েছেন তো?

পূর্ণবাবু তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

বিনোদ বলল,—সে এই গলি দিয়ে পালিয়েছে। আসুন আমার সঙ্গে। খুব জোরে ছুটলে এখনো তাকে ধরতে পারবেন। আমি তাকে জাপটে ধরেও রাখতে পারলুম না। খুব যুযুৎসুর প্যাঁচ শিখছে যাহোক! আপনারা কেউ ও-দিক দিয়ে ঘুরে যান,—আমি এ-দিকে যাচ্ছি। ঐখানে কোথাও লুকিয়ে আছে নিশ্চয়।

পূর্ণবাবু হঠাৎ তাকে বুকে জড়িয়ে শিশুর মতো ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠলেন, বললেন,—কই তোমার অভয়? ঐ দেখ—বলে চারজনের কাঁধে উত্তোলিত একটা খাটিয়ার পানে ইঙ্গিত করলেন।

বিনোদ কিছু বুঝতে পারল না। খাটিয়ার উপরে লম্বালম্বি কী একটা জিনিস আগাগোড়া ঢাকা! কে একজন বলল,—আজ বিকেলে মোটর-চাপা পড়ে সে মারা গেছে—

বিনোদ সমস্ত গায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—মিথ্যা কথা। সে এতক্ষণ আমার সঙ্গে বসে গল্প করল, দুজনে বেড়াতে বেরোলুম—কেন আমায় মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছেন? সে বলল,—আপনারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সে স্পেনে যাচ্ছে; সেখান থেকে জাহাজে করে আমেরিকায় —কত কথা বলল! আমাকে পয়সা দিতে চাইল—গরদের পাঞ্জাবির উপরে মেরুণার শাল—আসুন-না আমার সঙ্গে এই গলিতে, তাকে বার করে না দিই তো কী বলেছি—

পূর্ণবাবুরা এগোতে লাগলেন। বিনোদ হতভম্বের মতো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে! ব্যাপারটা সে স্পষ্ট করে এখনো বুঝতে পাচ্ছে না। সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে নাকি? না তো! রসা রোড, রাস্তার এক পারে ইলেকট্রিক ও অন্য পারে গ্যাস জ্বলছে—লাঠি-হাতে ঐ একটা কনস্টেবল, দূরে ঐ পূর্ণবাবুদের দল চলেছে শ্মশানে।

পূর্ণাবাবু হেঁকে বললেন,—তুমি এবার বাড়ি যাও বিনু!

বিনোদ তবু নড়ে না। ভয়ে সে জমে গেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, পূর্ণবাবুরা কালীঘাটের দিকে ঘুরে গেলেই পাশের গলি থেকে অভয় বেরিয়ে আসবে। অভয় আবার বেরিয়ে আসবে ভাবতে বিনোদ হঠাৎ আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু আবার অমনি সেই খিলখিল হাসি! একেবারে তার কাছে—রাস্তার উপরে। কিন্তু অভয় কোথাও নেই! একটা ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে মাত্র।

ট্যাক্সিটা বিনোদ দাঁড় করাল। বাড়ি থেকে অনেক দূরে সে চলে এসেছিল, এখন পায়ে হেঁটে কিছুতেই সে যেতে পারবে না। পেছন থেকে অভয় এসে তার সঙ্গ নেবে; তার কাঁধে হাত রেখে গল্প করতে চাইবে, সাতআনা সে ধরেছিল, এখনো সে ভোলে নি!

BanglaBook.org

ট্যাক্সি চেপে বিনোদ বলল,—চালাও এলেনবি রোড।

কিন্তু কিছুদূর থেকেই মনে হল ট্যাক্সিটার আগে-আগে অভয়ও ছুটে চলেছে। কিছুতেই সে বিনোদকে ছেড়ে দেবে না। বিনোদ চেঁচিয়ে উঠল,—খুব জোরে চালাও পাঁয়জি।

শিখ ড্রাইভার গাড়ি খুব জোরে ছুটিয়েছে। অভয় ট্যাক্সির সঙ্গে সমানে চলতে পারছে না। হাত তুলে স্পষ্ট সে বলল,—আস্তে। কিন্তু ট্যাক্সি থামল না, তার গায়ের উপর হুড়মুড় করে পড়ল। বেচারা অভয় দলা পাকিয়ে চাকার তলায় চেপটে গেল!

বিনোদ চোখ বন্ধ করে কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল—গেল, গেল,—বাঁধো গাড়ি, বাঁধো শিগগির বলছি।

ড্রাইভার কিছু বুঝতে না পেরে গাড়ি থামিয়ে বলল,—ক্যা হুয়া?

বিনোদ ঝুঁকে পড়ে গাড়ির তলাটা দেখতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও একবিন্দু রক্ত নেই।

অভয় তাড়াতাড়ি উঠে এসে খিলখিল করে হেসে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল,—ভয় কী, আমার কিছুই হয় নি! খালি এই মেরুদণ্ডটায় সামান্য একটু চোট লেগেছে। খুব হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলি যা হোক! আচ্ছা, গুডনাইট!

আর তাকে দেখা গেল না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মাঝরাতের কল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যে-পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা পৃথিবীকে জানি, তাদের ত্রুটি অনেক। অনেক রকম ভুল তাদের হয়। তবু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তাদের ওপর বিশ্বাস অগাধ। অগাধ বিশ্বাস আমাদের সাধারণ বুদ্ধির ওপর। এই কটা ইন্দ্রিয়ের নাগালের মধ্যে না এলেই—আমরা অনায়াসে অনেক কিছুই উড়িয়ে দিই। বুদ্ধি দিয়ে আমরা কঠিনভাবে সত্য বা মিথ্যা বলে সবকিছুর ওপর রায় দিই। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যা সত্য-মিথ্যার মাঝামাঝি জগতের—যেখানে বুদ্ধি থই পায় না, ইন্দ্রিয় হার মেনে যায়।

সেইরকম একটা কাহিনীই আজ বলতে বসেছি।

গোড়ায় নিজের একটু পরিচয় দেওয়া ভালো। পশ্চিমের কোনো একটি মাঝারি গোছের সমৃদ্ধ শহরে আমি ডাক্তারি করি। শহরের নামের কোনো প্রয়োজন এ-গল্পে নেই সুতরাং নামটা না-ই করলাম!

সেদিন রাত্রে শহরের প্রায় বাইরে বহুদূরের একটা 'কল' সেরে একলাই ফিরছিলাম। একে দারুণ শীত এ-বছর, তার ওপর রাত অনেক হওয়ায় ঠাণ্ডা অত্যন্ত বেশি পড়ছিল। পুরু পুরু গোটাকতক গরমের জামা থাকা সত্ত্বেও সব ভেদ করে মনে হচ্ছিল, ঠাণ্ডা হাওয়া আমার পাঁজরার ভেতর গিয়ে ঢুকছে!

আসছিলাম আমার পুরনো মোটরে। এ-মোটর আমি আজ দশ বছর ধরে একাই চালিয়ে ফিরছি কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল সঙ্গে একজন সোফার থাকলেই বুঝি ভালো হত। এই দারুণ শীতে স্টিয়ারিং-হুইল ধরে সমস্ত হাওয়ার ঝাপটা সহ্য করার চেয়ে কষ্ট আর কিছু নেই।

আমাদের শহরটি অত্যন্ত ছড়ানো। বড় বড় কয়েকটি রাস্তাকে আশ্রয় করে চারিধারে অনেকদূরে পর্যন্ত সে বিস্তৃত হয়ে আছে; কিন্তু জমাট বাঁধে নি। অনেক সময় একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মধ্যে শুধু একটি নির্জন রাস্তা ছাড়া আর কোনো যোগ নেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৯০৪--১৯৮৮

জন্ম কাশিতে ১৯০৪ সালে। কলকাতা সাউথ সুবার্বান স্কুলের ছাত্র। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন। স্কুল শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবনের শুরু। কিছুকাল পরে শিক্ষকতা ছেড়ে কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। পরে কলিকলম পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এ-ছাড়াও বঙ্গবাণী, বাংলার কথা, সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। কবি, ছোটগল্প লেখক, ঔপন্যাসিক হিসাবে তিরিশোত্তর রবীন্দ্রবলয় মুক্ত আধুনিক সাহিত্যের পথিকৃৎ। শিশুসাহিত্যিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান বিশিষ্ট। *প্রথমা, সম্রাট, সাগর থেকে ফেরা* তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে *পাঁক, মিছিল, উপনয়ন* উল্লেখযোগ্য। গল্পগ্রন্থের মধ্যে *বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, মৃত্তিকা, মহানগর* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর সৃষ্ট ঘনাদা এক অনবদ্য চরিত্র।

যে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম সেটিও অত্যন্ত নির্জন। দুধারে মাঝে মাঝে হরতুকী বা মহুয়া গাছ। আর রাস্তার দুধারে শুধু শূন্য অসমতল মাঠ। তার ভেতর বাড়ি-ঘর নেই বললেই হয়। কে বাড়ি করবে এই নির্জন জায়গায়!

অন্ধকারে অবশ্য এসব কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমার মোটরের মিটমিটে আলোয় সামনের পথের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল মাত্র। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল অন্ধকারের সমুদ্রই যেন আমার মোটরের আলোয় কোনোরকমে কেটে চলেছি।

শীতে দারুণ কষ্ট পেলেও বেশ নিশ্চিন্তমনেই চলেছিলাম। আমার কারটি পুরনো হলেও মজবুত। বেয়াড়াপনা সে করে না। আধঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গরম লেপের মধ্যে আরাম করে যে শুতে পাব এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

অন্ধকার রাস্তার নিস্তব্ধতার ওপর শব্দের ঢেউ তুলে আমার মোটর চলেছে দ্রুতগতিতে। নিজেকে যথাসম্ভব ঢাকাঢুকি দিয়ে রেখে ভেতরে বসে আমি শুধু আমার গরম বিছানাটার আরামের কথাই ভাবছি। ডাক্তারদের মতো পরাধীন আর কেউ নয়। তবু মনে হচ্ছিল একবার বাড়িতে পৌঁছতে পারলে প্রাণের দায়ে শুধু পয়সার জন্যে আর আমায় কেউ বের করতে পারবে না। এখন কোনোরকমে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট কাটলেই হয়।

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনায় সুখস্বপ্ন আমার ভেঙে গেল। আমার একান্ত সুস্থ-সবল মোটর থেকে থেকে অদ্ভুত একরকম ধাতব আর্তনাদ করতে শুরু করেছে। মোটরের এ-রকম আচরণের কোনো কারণই খুঁজে পেলাম না। আজ দুপুরেই আমার মোটরের ভালোরকম সেবা-শুশ্রূষা হয়ে গেছে। কোনোরকম রোগের আভাস তার ভেতর তখন ছিল না। হঠাৎ তার এ-রকম আকস্মিক বিকারের কারণ তবে কী?

এই দারুণ শীতের রাত্রে অন্ধকার নির্জন এই পথের মাঝে মোটরের এই বেয়াড়াপনায় সত্যিই ভীত হয়ে উঠলাম। এখনও প্রায় সাত-আট মাইল পথ বাকি। রাস্তার মাঝে মোটর সত্যি অচল হয়ে গেলে করব কী? এই রাত্রের ডাকেও সঙ্গে লোক না-আনার নির্বুদ্ধিতার জন্যে এবার নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল। সঙ্গে একজন লোক থাকলে তবু বিপদে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত।

দেখতে দেখতে মোটরের আর্তনাদ আরো বেড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মোটরের বেগও মন্থর হয় আসছে বুঝতে পারলাম। মোটরচালনার সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করেও সুরাহা কিছু করতে পারলাম না। কাতরাতে কাতরাতে খানিকদূর গিয়ে আমার মোটর হঠাৎ রাস্তার মাঝে একজায়গায় একেবারে থেমে গেল। আর তার নড়বার নাম নেই। চেষ্টার আমি তখনও ত্রুটি করলাম না; কিন্তু আমার পীড়নে অস্ফুটভাবে একটু কাতরোক্তি করে ওঠা ছাড়া আর কোনো সাড়া সে দিল না।

ভয়ে দুর্ভাবনায় সত্যিই তখন আমার সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। মোটর ফেলে এই দারুণ শীতের মাঝে সাত-আট মাইল জনহীন পথ হেঁটে যাওয়ার কথা তো কল্পনা করা যায় না। এই মাঠের মাঝে মোটরে সারারাত কাটানও অসম্ভব। এখন উপায়!

'ডাক্তারবাবু।'

হঠাৎ বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। এই জনশূন্য পথে এমন সময়ে কে ডাকলে?

আবার শুনতে পেলাম—'ডাক্তারবাবু।'

এদিক-ওদিক অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবার দেখতেও পেলাম। পথের ধারে ঝাঁকড়া একটা গাছের পাশে আবছা একটি দীর্ঘ শীর্ণমূর্তি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এমন জায়গায়

BanglaBook.org

কেমন করে তার উদয় হল, বুঝতে না পারলেও সাড়া দিয়ে বললাম—'কে তুমি ?'

মনে তখন আমার একটু আশার রেখাও দেখা দিয়েছে। তার আবির্ভাব যেমনই বিস্ময়কর হোক-না কেন, লোকটার কাছে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা তো আছে।

লোকটা সেই জায়গা থেকেই বললে—'আমায় চিনবেন না আপনি।'

চেনবার জন্যে আমি তখন ব্যস্ত নই। আমার সাহায্য করবার জন্যে একজন লোক তখন দরকার মাত্র। সেই কথাই আমি তাকে বলতে যাচ্ছি এমন সময় লোকটা আবার বললে—'আপনাকে একটু আসতে হবে ডাক্তারবাবু ! ভারি অসুখ একজনের।'

এমন সময়ে এ অনুরোধে বিরক্ত যেমন হলাম, আশ্চর্যও হলাম তেমনি। ঠিক এই সময়ে রাস্তার ঠিক এই জায়গায় রোগী কি আমার জন্যে তৈরি হয়ে বসেছিল !

লোকটা আমার মনের কথাই যেন আঁচ করে বললে—'এ ভগবানের দয়া ডাক্তারবাবু। এমন সময় আপনাকে এখানে পাব, স্বপ্নেও ভাবি নি, অথচ না-পেলে কী বিপদই যে হত।'

বেশি কথাবার্তা তখন আর ভালো লাগছিল না। একটু বিরক্ত হয়েও বললাম—'কোথায় তোমার রোগী ?'

লোকটা এবার নিঃশব্দে অন্ধকারের ভেতর একদিকে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ করলে। সেদিকে চেয়ে দেখলাম, সত্যি দূরে একটা বাড়ির আলো যেন দেখা যাচ্ছে। এ-রকম নির্জন প্রান্তরের মাঝে এ-রকম বাড়ি খুব কমই থাকে। হঠাৎ এ-রকম জায়গায় এমন সময়ে যাওয়াও একটু বিপজ্জনক। তবে শত্রু আমার কেউ তো নেই এবং সঙ্গে টাকাকড়িও নিতান্ত সামান্য, এই যা ভরসা।

একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কী অসুখ ?'

উত্তর এল—'জানি না ডাক্তারবাবু কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গিন অবস্থা, তাড়াতাড়ি না গেলে বোধহয় বাঁচানো যাবে না। দোহাই আপনার, চলুন ডাক্তারবাবু।'

কোথায় নিজের বিপদ সামলাব, না হঠাৎ রাস্তার মাঝে মাঝরাতে যেতে হবে পরের চিকিৎসায়। তবু ডাক্তার মানুষ—জীবন-মরণের সমস্যা শুনলে চুপ করে বসে থাকতে পারা যায় না। বাধ্য হয়েই তাই বললাম—'চল।'

মাঠের ওপর দিয়ে সরু একটা পথ। অন্ধকারে ভালো দেখাই যায় না। তাই ধরে লোকটার পিছু পিছু মিনিট-পাঁচেক হেঁটে একটি বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে একটি ঘরের দরজা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। সেইদিক দেখিয়ে লোকটা বললে—'ওই ঘরেই রোগী বাবু, আপনি যান, আমি এখুনি আসছি।'

অন্ধকারের ভেতরই বুঝতে পারছিলাম, বাড়িটি বিশেষ সমৃদ্ধ চেহারার নয়। গুটি-চার-পাঁচেক ঘর এবং একটুখানি ঘেরা উঠোন। ঘরগুলিও সব পাকা-ছাদের নয়, দুপাশে খোলার ছাউনি।

লোকটার কথামতো সামনের ঘরে গিয়ে এবার ঢুকলাম। ঘরটি আয়তনে বিশেষ বড় নয়, তার ওপর নানান আকারের বাক্স-পেঁটরায় বোঝাই বলে ভেতরে নড়বার চড়বার স্থান অত্যন্ত অল্প। দরজার মুখোমুখি একটা জানালা। সেই জানালার ধারে মিটমিট করে একটি কোরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোতেই অস্পষ্টভাবে দেখা গেল দরজার বাঁ-ধারে একটি চারপায়ায় অত্যন্ত শীর্ণ এক ভদ্রলোক শুয়ে আছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই ক্ষীণস্বরে তিনি বললেন—এসেছেন ডাক্তার বাবু। আপনার দয়া কখনও ভুলব না, বসুন।'

ঘরের ভেতর এদিক-ওদিক চেয়ে বসবার জায়গা একটিই মাত্র দেখতে পেলাম।

BanglaBook.org

জানালার কাছে চারপায়া থেকে অনেক দূরে একটি বেতের মোড়া। সেইটেই টেনে চারপায়ার কাছে বসবার উদ্যোগ করতে ভদ্রলোক আবার ক্ষীণস্বরে বললেন—'বসুন, বসুন, ওইখানেই বসুন, আগে আমার রোগের কথা বলি, শুনুন।'

এইটু হেসে এবার সেইখানেই বসলাম। রোগীদের নানা অদ্ভুত বাতিকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। বুঝলাম খানিকক্ষণ ধরে নিজের রোগ-সম্বন্ধে ভদ্রলোকের নানা মতামত এখন আমায় শুনতে হবে। না-শুনলে নিস্তার নেই।

ক্ষীণস্বরে প্রথমেই তিনি আরম্ভ করলেন—'আমার রোগ কি সারাতে পারবেন ডাক্তারবাবু? পারবেন আমাকে বাঁচাতে?'

একটু হেসে বললাম—'সেই চেষ্টা করাই তো আমাদের কাজ। আর বাঁচবেন না-ই বা কেন?'

একটু অদ্ভুত হাসির আওয়াজ এল খাট থেকে—'বাঁচতেও পারি তাহলে ডাক্তারবাবু! কেমন।'

বললাম—'পারেন বই কি! কী তেমন আর হয়েছে আপনার?'

'না, তেমন আর কী হয়েছে।' ভদ্রলোক আবার যেন হাসলেন, তারপর বললেন,—'ডাক্তারদের অনেক ক্ষমতা, কেমন না? কিন্তু ধরুন তাতেও যদি না বাঁচি, যদি আজ রাত্রেই মারা যাই?'

রোগীর এই অর্দ্ধোন্মত্ত প্রলাপের উত্তরে কী যে বলব, কিছুই ভেবে পেলাম না। মনে মনে তখন এই বিলম্বের জন্যে অস্থির হয়ে উঠছি।

রোগীই আবার বললেন—'যদি আপনি থাকতে থাকতেই মারা যাই ডাক্তারবাবু, কী হবে তাহলে? কে আপনার ফী দেবে?'

আচ্ছা-পাগল রোগীর পাল্লায় তো পড়া গেছে। বললাম—'যদি নেহাতই তাই হয়, তাহলে ফী নাহয় নাই পেলাম। আমরা শুধু ফী-র জন্যেই সবসময়ে আসি না!'

'তা বটে, তা বটে। পৃথিবীতে ভালো লোক, পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব তাহলে এখনও আছে, না ডাক্তারবাবু? কিন্তু ফী-র ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি ডাক্তারবাবু। হঠাৎ যদি মরে যাই, তাহলে ওই বাক্সটি খুলে ফেলবেন, বুঝেছেন ডাক্তারবাবু—ওই বেতের ছোট্ট বাক্সটি।'

ভদ্রলোকের স্বর আরো মৃদু হয়ে এল—'ওই বাক্স থেকে আপনার প্রাপ্য টাকা নেবেন। আরও একটা জিনিস নেবেন ডাক্তারবাবু। বলুন, নেবেন তো?'

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—'কী?'

'কিছু না, ডাক্তারবাবু, একটা কাগজ! কিন্তু ভয়ানক দরকারি কাগজ! এ-কাগজ যে ওখানে আছে, শুধু আমি জানি আর আপনি এখন জানলেন। আর কেউ জানে না। জানলে আর ওখানে ওটা থাকত না।'

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে আবার বললেন—'এ-বাড়িতে কাউকে দেখতে না-পেয়ে ভাববেন না যেন, আমার কেউ নেই! আমার অনেক আত্মীয় আছে—ওত পেতে আছে আমার মরার অপেক্ষায়। শুধু তাদের বিশ্বাস, আজ আমি হয়তো মরব না। তাদের বিশ্বাস মরবার আগে আর আমি কিছু করব না। তারাই পাবে সব।'

আমি এবার বলতে যাচ্ছিলাম—'আপনার অসুখটা সম্বন্ধে—'

'হ্যাঁ, অসুখ তো দেখবেনই, তার আগে আর একটা কথা বলে নিই—ওই কাগজটি আমার উইল, ডাক্তারবাবু। আমার ছেলের নামে উইল। সে ছেলেকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছিলাম একদিন, কোথায় আছে, তাও জানি না; কিন্তু জানেনই তো রক্ত জলের চেয়ে ঘন।'

BanglaBook.org

আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যায় না। মোড়া থেকে উঠে পড়ে আমি বললাম—'এইবার আমি দেখতে পারি?'

খাট থেকে আওয়াজ এল—'দেখুন।'

আমি খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে রোগীর নাড়ি দেখবার জন্যে হাতটা তুলে ধরলাম এবং পরমুহূর্তেই সেই দারুণ শীতের ভেতরও আমার সমস্ত দেহ ঘেমে উঠল।

সে হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা। রোগী মৃত। শুধু মৃত হলে এতখানি আতঙ্কের আমার বোধহয় কারণ থাকত না। কিন্তু ব্যাপার যে আলাদা। ডাক্তারি-শাস্ত্রে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহলে এ-রোগী এইমাত্র কখনই মারা যায় নি। তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে, কয়েক ঘণ্টা আগে। সমস্ত দেহ তার কঠিন।

উন্মাদের মতো আরো খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলাম। নাহ্, ভুল আমার হতেই পারে না। কিন্তু তাহলে এ-ব্যাপারের অর্থ কী?

তখন কিন্তু স্থিরভাবে কোনো চিন্তা করবার আর আমার ক্ষমতা নেই। আতঙ্কে আমার বুকের স্পন্দন পর্যন্ত যেন থেমে আসছে। হঠাৎ জানালার কাছে বাতিটা দপদপ করে নেচে উঠল। সেটা একবার নেড়ে দেখলাম, তাতে তেল একফোঁটাও নেই। প্রান্তরের মাঝে নিস্তব্ধ নির্জন বাড়িতে এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আমি একা। এই বাতির আলোটুকুই যেন আমার একমাত্র সহায় ছিল, তাও নিভতে চলেছে দেখে আমি দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, পিছনে আলোটা আর কয়েকবার নেচে নিভে গেল। তখন আমি উঠোন ছাড়িয়ে এসেছি প্রায়।

কীভাবে তারপর অন্ধকারে প্রান্তরের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মোটরে উঠেছিলাম, তা আমার মনে নেই। মোটর চালিয়ে শহরের মাঝ বরাবর আসবার পর আমার যেন স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এল। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মনে হল মোটরের এই চলা। খানিক আগে অদ্ভুতভাবে যে মোটর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ এবার বিনা চেষ্টায় আপনা হতে সে মোটর এমন শুধরে গেল কী করে?

তার পরদিন দিনের আলোয় লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে সেই প্রান্তরের মাঝেকার বাড়ির নিঃসঙ্গ রোগীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাঁর ছেলেই আজকাল সমস্ত বিষয়ের মালিক।

সেদিনকার রহস্যের স্বাভাবিক মীমাংসা কিন্তু আমি এখনও করতে পারি নি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই বন্ধু

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু
১৯০৮--১৯৭৪
জন্ম কুমিল্লায়। জন্মের পরপরই মায়ের মৃত্যু। মাতামহ-মাতামহীর কাছে শৈশবের প্রথম ভাগ কাটে; এর পর পিতামহের বিভিন্ন কর্মস্থল কুমিল্লা, নোয়াখালি ও ঢাকায়। শিক্ষাজীবন কেটেছে ঢাকায়। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অনার্স এবং এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পান। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রিপন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত *স্টেটসম্যান* পত্রিকার সাংবাদিক। ঢাকায় থাকাকালে অজিত দত্তর সঙ্গে প্রগতি পত্রিকা সম্পাদনা, ১৯৪২ সালের আশ্বিন থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে কবিতা পত্রিকা সম্পাদনার শুরু। মাঝে কিছুকাল সমর সেনের সঙ্গে যৌথ সম্পাদক। এ-ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সমালোচনা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যাপক। একাধারে ছিলেন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সমালোচক এবং শিশুসাহিত্যিক। *বন্দীর বন্দনা*, *কঙ্কাবতী*, *যে আঁধার আলোর অধিক* তাঁর কবিতার বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। *তিথিডোর*, *যেদিন ফুটল কমল*, *কালো হাওয়া*, *রাতভর বৃষ্টি* তাঁর উপন্যাস।

না, ঘুম পাচ্ছে—বর্বর ঘুম। হাত শিথিল, কলম চলে না, মন ঝাপসা। তার মন যেন গোধূলি, সেখানে কোনো রেখা নেই, সব থমথমে, মস্ত কালো থমথমে মেঘের মতো ঝুলে আছে—ঘুম। যেমন সন্ধ্যায় মশা, পোকা, বাদুড় ছিটকে ছিটকে উড়ে বেড়ায়, তেমনি তার মনের মধ্যে ধূসরভাবে নড়ে বেড়াচ্ছে কবিদের নাম, কবিতার লাইন, পড়ার স্মৃতি—এতদিন ধরে যা-কিছু পড়েছে, শুনেছে, ভেবেছে, তার চাপা, একটানা, অর্থহীন—ঝিঁঝির মতো আওয়াজ। অসম্ভব তাদের এখন স্পষ্ট করে তোলা। অসম্ভব কোনো-এক লক্ষ্যের দিকে চিন্তার সিঁড়ি গড়ে তোলা। ঘুম। ঘুমোতেই হবে। আর পরীক্ষা তো এসে গেল।

খাতা বন্ধ করে উঠতে যাবে, এমন সময় ঘুমের চেয়েও ভারী চাপে তার শরীর অবশ হয়ে এল। ঘরে আর-একজন আছে, আর-একজন এসেছে। দরজার ধার থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তার দিকে, খুব আস্তে, যেন অতি কষ্টে,আর একেবারে, একেবারে নিঃশব্দে। সুকুমারের ঘুম ছুটে গেল মুহূর্তে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ফিরে এল; যদিও একটু আঙুল নাড়ার ক্ষমতাও সে খুঁজে পেল না নিজের মধ্যে, বিদ্যুৎবেগে সে অনেক কিছুই দেখে ফেলল। লোকটি চোর নয়, গুণ্ডা নয়—দেখেই বোঝা যায়। পায়ে কার্পেটের চটি, ধবধবে কোঁচানো ধুতি পরনে, গিলে-করা মিহি পাঞ্জাবি, আর পাঞ্জাবির ওপরে এক অতি ম্লান যুবকের মুখ বসানো। দেখে ভয় পাবার কিছু নেই, কিন্তু সেটাই সবচেয়ে ভয়ের। লোকটি এমন সুসজ্জিত ধীর নিঃশব্দ আর পরিপাটি যে সত্যি সে কোনো 'লোক' কিনা সেটাই সন্দেহ করা যায়। যেন পুতুল, যেন যন্ত্র, কোনো জাদুকর চালাচ্ছে।

মেঝের কয়েক গজ পার হতে যতটুকু সময় লাগল এই অতিথির, সুকুমারের সেটা মনে হল অনন্তকাল। সে চ্যাঁচাতে চাইল, গলা বন্ধ, উঠতে চাইল, পায়ে যেন শেকল বাঁধা। অবশেষে দেখতে পেল তার টেবিলের পাশের ইজিচেয়ারটিতে 'লোকটি' বসে আছে। এত হালকা হয়ে বসেছে, এত কম জায়গা নিয়ে, যেন তার শরীরের কোনো ওজন নেই। আর কী

ফ্যাকাশে তার মুখ।

ক্ষীণ আওয়াজ শুনল, 'ভয় পেলে নাকি?'

সুকুমার কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হল, কিন্তু জবাব জোটাতে পারল না। তার জিভ তখনও কাঠ।

'ভয় নেই। নির্জনে থাকি আমরা, একটু কথা বলতে এলাম।'

'আমরা' শুনেই সুকুমার ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। স্বপ্ন দেখছে? না সত্যি? ঘুমিয়ে আছে? না জেগে? সত্যি ভয় পাবার কিছু নেই? না, ভয় কিসের! কী করতে পারে আমাকে ঐ...ঐ।

'কথা বলতে এলাম। কিন্তু আসা কি সহজ? অনেক, অনেক, অনেক চেষ্টায় ...তুমি কলেজে পড়?'

'তা পড়ি বলা যায়।' এতক্ষণে আওয়াজ ফিরে পেল সুকুমার।

'বলা যায়, মানে? হয় পড়ো, নয় পড়ো না—এর মাঝামাঝি কিছু তো নেই।'

'আমি এবার এম. এ. পরীক্ষা দিচ্ছি।'

'ও, এম. এ. দিচ্ছ। কোন্ সাবজেক্টে?'

'বিষয়টার নাম কম্প্যারেটিভ লিট্‌রেচার।'

'কী বললে? কম্-প্যা-রে-টিভ....সে আবার কী?'

'নতুন হয়েছে।'

'তা ব্যাপারটা কী? কী পড়তে হয়?'

'এই—সাহিত্য আর কি...নানা দেশের সাহিত্য। বলতে পার বিশ্বসাহিত্য।' সুকুমার থামল, কিন্তু নিজের নতুন জ্ঞানের একটু নমুনা দেবার লোভ সামলাতে পারল না শেষ পর্যন্ত—'নানা দেশের সাহিত্য না পড়লে তো কোনো দেশের সাহিত্যই বোঝা যায় না।'

'নানা দেশের সাহিত্য? অনেক অলৌকিক গল্প পড়ো তাহলে?'

'অলৌকিক মানে?'

'মানে—দেহ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মা কোথায় যায়, কী করে, এইসব কথা। মানে—আমি এখন যে-অবস্থায় আছি, সেই অবস্থার বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা। এসব পড়ো না?'

সুকুমার স্থিরচোখে তাকাল এই অদ্ভুত আগন্তুকের দিকে। না, আমরা যাকে শরীর বলি তার কোনো চিহ্ন নেই, ফাঁপা একটা আকৃতি শুধু, যেন কাগজে তৈরি নাক-চোখ-মুখ সবই আছে, কাপড়চোপড়ও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ও-সবের পেছনে কোনো বাস্তবতা নেই যেন, এক ঝাপটা হাওয়া এলেই ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাবে। বেচারার জন্য কষ্ট হল সুকুমারের—কষ্ট হল এ-কথা ভেবে যে একে একপেয়ালা চা খাইয়েও সুখী করা যাবে না—খাদ্য, পানীয়, বিশ্রাম, জ্ঞান—কিছুরই আর প্রয়োজন নেই এর।

'জবাব দিচ্ছ না যে?'

'ও-হ্যাঁ। তা পড়েছি বইকি কিছু-কিছু।'

'হ্যামলেট?'

'ও আর কে না পড়েছে।' একটু ঠাট্টার হাসি ফুটল সুকুমারের ঠোঁটে। 'আমি দশ বছর বয়সে প্রথম পড়েছিলাম।'

'দান্তে?'

'পড়েছি।'

'কী মনে হয়েছে তোমার?'

'কোন্ বিষয়ে?'

'দান্তের পাপীদের বিষয়ে। কখনো কি মনে হয়েছে যে সব ধাপ্পা, বুজরুকি, ওপর-চালাকি?'

BanglaBook.org

'মানে?'

'যারা দেহ থেকে মুক্ত হয়েছে তাদের আবার শারীরিক শাস্তি দেবে কেমন করে? তাদের কি মাথা আছে যে মাথা ফাটিয়ে দেবে। চোখ আছে যে পাতার ফাঁকে পোকা ঢুকিয়ে দেবে। নাক আছে যে যন্ত্রণা দেবে দুর্গন্ধ ছিটিয়ে? নাকি মাংসপেশি আছে যে আগুনের হ্রদে ডুবিয়ে রাখবে? কাকে খাওয়াবে ডালকুত্তা দিয়ে? কাকে ভাজবে গরম তেলে? কার গলা থেকে বের করবে আর্তনাদ? সে তো অনেক আগেই ভস্ম হয়ে গেছে, বা মিশে গেছে মাটির তলায়, মাটির মধ্যে। এ-সব কথা ভেবেছ কখনো?'

' এ তো তুমি গীতা বলছ। নতুন কিছু না।'

'গীতা? ঐ আর-একটি অতিকায় ধাপ্পা, বিরাট বুজরুকি। দেহের খাঁচা থেকে বেরুনোমাত্র, আত্মাটি টুপ করে পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, এতবড় মিথ্যে আর কিছু নেই। যত বই পৃথিবীতে লেখা হয়েছে সব মিথ্যে। কেন জান?'

'বোধহয় এইজন্য যে শুধু জীবিতেরাই বই লেখে, আর না-মরা পর্যন্ত পুরো সত্য জানা যায় না।'

'ব্রাভো! ঠিক বলেছ। বেশ বুদ্ধিমান ছেলে তুমি।'

'ধন্যবাদ।—যদিও জানি না আমার পরীক্ষক মশায়েরও তা-ই মত হবে কিনা। একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি কে? কোনো আত্মা? প্রেত? বিশ্রী বাংলায় যাকে ভূত বলে, তা-ই? আমাকে বলছ গীতা ভুল, দান্তে ভুল। সত্য কথাটা তাহলে কী?'

'দ্যাখো ছোকরা, অতিচালাকি করো না—পরীক্ষায় ফল ভালো হবে না তাতে। যেটুকু জান তার বাইরে ছায়া মাড়াবে না।'

'আমি প্রতিবাদ করছি। তুমিও আমার পরীক্ষক নও, আর আমিও কিছু অতিচালাকি করি নি। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি তোমার কাছে। নচিকেতা যেমন যমের কাছে—তেমনি।'

'সেটি হচ্ছে না।' একটা হাসির মতো আওয়াজ শুনল সুকুমার। আমরা মরে গিয়ে যা জেনেছি তুমি ভাবছ বেঁচে থেকেই তা জেনে নেবে? না হে না, সে-আশা নেই।'

'তা বেশ। আমার জ্ঞানের স্পৃহা এত প্রবল নয় যে, তার জন্য ছটফটিয়ে এই দেহ থেকে বেরিয়ে যাব। নশ্বর দেহের সঙ্গে এক হয়ে থাকতে নেহাত মন্দ লাগছে না আপাতত।'

'স্বার্থপর! নিষ্ঠুর! জীবিতেরা সকলেই তা-ই। যারা মরে গেছে, কে আর ভাবে তাদের কথা?'

'যুধিষ্ঠির ভেবেছিলেন। দান্তে ভেবেছিলেন। কবিরা অনেকেই ভেবেছিলেন।'

'তোমার বই-পড়া জঞ্জাল ভুলে যাও। আমরা কথা শোন। জান, আমি ডাক্তারি পড়তুম?'

'আচ্ছা। আমিও একবার ভরতি হয়েছিলাম মেডিকেল কলেজে।'

'মড়া কাটার ভয়ে পালিয়েছিলে তো?'

'কিছু আগেই পালিয়েছিলুম। শুরু করার আগেই।'

'কত ছেলেকে ভয় পেতে দেখেছি। কেউ অপারেশন থিয়েটারেই বমি করে ফেলেছে। কেউ বাড়ি ফিরে ঘেন্নায় ভাত খেতে পারে নি। রাত্রে স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে কেউ-কেউ। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই ভালো লাগত।'

'ভালো-মন্দ তো বাইরে কিছু নেই; সবই আমাদের মনে।'

'দ্যাখো ছোকরা, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। কত বয়স তোমার, শুনি? কুড়ি? একুশ? আমারও তা-ই ছিল—কিছু বেশি—সেই সময়ে। কিন্তু সে কতদিন আগে, জান? তোমাদের হিসেবে পঞ্চাশ বছর। তাহলে আমার বয়স কত হল ভেবে দ্যাখো।'

সুকুমার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'পঁচাত্তর?'

'তাও বলতে পার, অনন্তকাল বললেও ভুল হয় না। এই অনন্তকালের মধ্যে কখনো কি তার সঙ্গে আবার দেখা হবে?'

BanglaBook.org

'কার কথা বলছ?'

'আহ্—বাধা দিয়ো না বার-বার। আমাকে বলতে দাও।'

সুকুমার বুঝল ইনি আত্মজীবনীর একটি অংশ তাকে শোনাতে চান। সকলেই তা-ই চায়, সকলেই ভাবে তার জীবনের সুখ-দুঃখ শুনতে অন্যদেরও গরজ খুব। মরে গিয়েও এ রোগ মরে না।

'বলছিলাম আমার ভালো লাগত ডাক্তারি পড়া। ভালো লাগত মড়া কাটতে—ঐ ফোলা, শক্ত, ঠাণ্ডা মৃতদেহগুলোর পেটের মধ্যে ছুরি চালিয়ে শরীরের সূক্ষ্ম কলকব্জা যখন চোখের সামনে দেখতে পেতাম, নিজেকে আমার মস্ত একজন কেউকেটা মনে হত। ভালোবাসতাম মুমূর্ষুর পাশে পাহারা দিতে, তাদের নাভিশ্বাসের যন্ত্রণা লক্ষ্য করতে—আর কয়েক ঘণ্টা কয়েক মিনিটের মধ্যে এরা আর মানুষ থাকবে না, একটা জিনিসে পরিণত হবে, নেহাত জড়পদার্থ, যার পেটের মধ্যে ছুরি চালিয়ে জ্ঞানী হওয়া যায়।'

একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করল, গর্ব হত আমার, উঁচুদরের জীব বলে মনে হত নিজেকে—কেন জান? আর-কোনো কারণে নয়, শুধু বেঁচে আছি বলেই। এরা মরে যাচ্ছে, মরে গেছে—আর আমি বেঁচে আছি। একটি সপ্রাণ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শরীর আছে আমার। নিতে পারি খাদ্যের স্বাদ, সূর্যের স্বাদ, শরতের শিউলির গন্ধ, ভোরবেলার ভৈরবীর সুর। পারি সাঁতার কাটতে, আড্ডা দিতে, ঘুমের অলস বিছানায় জেগে উঠতে।....আর এখন, এই তুমি চোখের সামনে যা দেখছ, তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে হাত চালিয়ে দিতে পার। এই ধুতি-পাঞ্জাবি, কার্পেটের চটি, সিঁথি-কাটা চুল, নাকের তলায় পাতলা সরু গোঁফ—এসব কিছু না, কিছুই না—হাওয়া, মায়া। অনেক-অনেক-অনেক কষ্টে এটুকুমাত্র জোটাতে পারি এখন। সেই তখন আমি যা ছিলাম তার একটা স্মৃতি মাত্র, ছায়া মাত্র, ভান মাত্র। যদি আমাকে ধরতে যাও মুঠোর মধ্যে, হাওয়া ছাড়া আর কিছু পাবে না। দ্যাখো-দ্যাখো একবার হাত দিয়ে।'

'মাপ করো, তোমাকে স্পর্শ করতে লুব্ধ হচ্ছি না আমি। কিন্তু সবই যদি মায়া, তাহলে তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি কেমন করে?'

'ঐ শুনতে পাওয়াটাও মায়া।' এই জ্ঞানগর্ভ ঘোষণার পরেই আগন্তুক আমাকে আলগোছে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোনো বন্ধু আছে কি?'

'বন্ধু? অনেক আছে।'

'অনেক না—একজন, এক বন্ধু, অনন্য বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। সবসময় থাকো যার সঙ্গে—কাজে, খেলায়, দুঃখে, আনন্দে, চিন্তায়। যাকে একবেলা না দেখলে নিজের অস্তিত্ব অর্থহীন মনে হয়।'

'এমন বন্ধুত্ব হয় নাকি কখনো—মধ্যযুগের কাহিনীতে ছাড়া?'

'হয় না? আমি বলছি, হয়। আমার ছিল তেমনি এক বন্ধু। তার নাম ছিল বিনয়েন্দ্র। আমার সহপাঠী, আমার প্রতিযোগী, আমার চিরসঙ্গী। কলেজে যতগুলো পরীক্ষা হয়—আর জান তো, মেডিকেল কলেজে পরীক্ষার চাপ অনেক বেশি ; কোনোবার সে ফার্স্ট, আমি সেকেন্ড—আর কোনোবার আমি ফার্স্ট, সে সেকেন্ড। এর কোনো নড়চড় হয় নি কখনো। কলেজে আমরা পাশাপাশি বসি, হাসপাতালে কাজ করি একসঙ্গে, একসঙ্গে বেড়াই, ছুটির দিনে একসঙ্গে যাই চন্দননগরের বাগানে, মাছ ধরি, খিচুড়ি রাঁধি, শীতের বিকেলে গাছের তলায় বসে বসে ওথোলো কিংবা ম্যাকবেথ আওড়াই।

'একটা বিষয়ে শুধু তফাৎ ছিল ওর সঙ্গে আমার; বিনয়ের হৃদয় ছিল মেয়েদের মতো কোমল, আর আমি ছিলাম কোনো-কোনো বিষয়ে পাথরে গড়া। কষ্ট, আর্তনাদ, মৃত্যু—এসব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আমার পক্ষে ছিল কৌতূহলের বা গবেষণার বিষয়; কিন্তু রোগীর যন্ত্রণা দেখে বিনয়ের চোখে জল আসে, মৃত্যুর দৃশ্যে মুখ করুণ হয়ে যায়। এ-নিয়ে আমি অনেক ঠাট্টা

BanglaBook.org

করেছি তাকে।

'আর একটা বিষয়ে তফাৎ ছিল।

'আমি, শ্রীশিবশঙ্কর চৌধুরী, কলকাতার বনেদি বাড়ির দুলাল; আর বিনয় ছিল গরিবের ছেলে। জোড়াবাগানে তিন-পুরুষের বাড়ি আমাদের, তার দেউড়িতে দারোয়ান, আস্তাবলে জুড়িগাড়ি। আর বিনয় বীরভূম জেলার বিধবা মায়ের ছেলে, থাকে বৌবাজারের মেস্-এ, তার পড়া-খরচ চালাতে লাটে উঠেছে দেশের ছিটেফোঁটা জমিজমা, মার দু-চারটি গয়না গলে যাচ্ছে। এ-সব কথা তারই কাছে শুনতাম, কিছুই সে লুকোত না আমার কাছে, তাহলে কি আর বন্ধুত্ব হয়?

'খুব বেশিদিন মানুষের সংসারে আমি ছিলাম না। কিন্তু যদি একশ বছর বেঁচে থাকার মতো ভাগ্য আমার হত তাহলেও আমি জানি, বিনয়ের মতো নির্মল চরিত্রের মানুষ আর একটিও দেখতাম না। এমন সহজভাবে, চেষ্টাহীনভাবে, অনলসভাবে ভালো ছিল বিনয়! তার উচ্চাশায় লুব্ধতা নেই, আত্মসম্মানে দম্ভ নেই, তার স্বাবলম্বিতা ভালোবাসাকে অপমান করে না। আমি পারি একপলকে তার সব অভাব মিটিয়ে দিতে, পারি তাকে আমারই বাড়িতে আমারই মতো আরামে রাখতে, আর ...কী বোকা আমি!—প্রথম-প্রথম ও-রকম কথা বলেছি তাকে, কান পাতে নি বলে অভিমান করেছি।

'শেষে একদিন বলল, "আমি যদি তোমাদের বাড়িতে থাকি, তাহলে তুমি তোমার বাড়ির কাছে ছোট হয়ে যাবে। আর তুমি যাতে ছোট হয়ে যাবে তেমন কাজ তুমি বললেও আমি করতে পারি না।" হাসিমুখে বলছে কথাটা, অথচ গম্ভীরভাবেই। গম্ভীর হলে কালো দেখায় না তাকে, হাসলে হালকা মনে হয় না। প্রায় সব কথাতেই সায় দেয়, আর যখন 'না' বলে তাও যেন পালকের মতো নরম, তবু গলার সুরে বুঝিয়ে দেয় যে 'না' মানে সত্যি 'না।' এমনি মানুষ ছিল বিনয়, আমার বন্ধু সে।

'প্রায়ই সে আসে আমাদের বাড়িতে। মা যখন আমাদের দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়ান খুব আনন্দ করেই খায় ও; ষষ্ঠীতে আর পুজোর সময় মা যে কাপড় দেন নেয় মাথা পেতে তা; কিন্তু এটুকুর বেশি যদি আর-কিছু করতে চেয়েছি তার জন্য, তাহলে নিজের ভুলের জন্য নিজেকেই লজ্জা পেতে হয়েছে। আর সত্যিও—তার জন্য কিছু করার প্রশ্ন যেন অবান্তর, নিজের মধ্যে এমন সম্পূর্ণ, এমন আত্মস্থ ও অনাবিল ছেলে বিনয়। দরকারমতো আমার বই নিয়ে পড়তে তার কুণ্ঠা নেই, কিন্তু আমার কোনো শৌখিন জামা একদিনও পরাতে পারি নি তাকে। কম খরচে পরিচ্ছন্ন থাকার উপায় সে জানে, ভালো পুরনো বই শস্তায় জোগাড় করতে সে ওস্তাদ। তার কখনো অসুখ করলেও আমার একটা সুযোগ হত, কিন্তু তার ছিপছিপে মজবুত শরীরে সর্দিরও প্রবেশের অধিকার ছিল না। বরং আমারই নিউমোনিয়ার সময় রাত জেগে শুশ্রূষা করেছিল সে।

'অতএব আমার দিক থেকেই চেষ্টা করলাম তার সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আনতে। মেডিকেল কলেজে বাবুগিরিটাই রেওয়াজ ছিল তখন; ছেলেরা সবাই সেন্ট মাখে, ডবল আস্তিনের বিলেতি কামিজ গায়ে দেয়; শীতকালে পশমি কোট, রেশমি পাফলার, ব্লেজার পরে টেনিস খেলতে যায়। ক্রমে বিলাসিতা কমিয়ে আনলাম। বাড়ির গাড়ি পারতপক্ষে চড়ি না, বিনয়ের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বেড়াই, দূরে যেতে হলে ভাড়া-গাড়ি নেই। রাত্রে মাঝে মাঝে বিনয়ের মেস-এ খেয়ে বাড়ি ফিরি, কখনো-বা রাত্তির দুটো অবধি তার তক্তায় বসে ফিজিওলজির মামাদ্দার করি। এমন আস্তে আস্তে, স্বাভাবিকভাবে অভ্যেসগুলো বদলেছিলাম যে বাড়ির কেউ তা লক্ষ্য করতে পারে নি। বিনয় হয়তো বুঝেছিল, কিন্তু আমাকে বুঝতে দেয় নি যে সে বুঝেছে। সবই সহজভাবে নিয়েছে সে, আর আমিও তাই সহজ হতে পেরেছি। এমনি করে ছ-বছর কাটল, কাছে এল ফাইনাল পরীক্ষা।

'কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ও'ব্রায়েন। নিম্নতম জমাদার থেকে উচ্চতম প্রোফেসর পর্যন্ত সবাই তাঁর নাম দিয়েছিল পাগলা সাহেব।

BanglaBook.org

'এই ও' ব্রায়েন আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার তিন মাস আগে এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিলেন। জানালেন, এই পরীক্ষায় যে ছাত্র ফার্স্ট হবে তাকে তিনি নিজে স্কলারশিপ দিয়ে চার বছরের জন্য এডিনবরায় পাঠাবেন, আর সেখানে পড়াশুনো ভালো করলে আরো এক বছর জার্মানিতে। শোনা গেল, পরের বছর তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন—আর ফিরবেন না, যাবার আগে ভারতের জন্য এটুকু তিনি করতে চান।

'খবরটা বেরোনো মাত্র সারা কলেজে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল; কে পাবে এই স্কলারশিপ? বিনয়েন্দ্র না শিবশঙ্কর? তৃতীয় নাম ভুলেও উচ্চারিত হয় না, কিন্তু দুজনের মধ্যে একজনের বিষয়ে কখনোই নিশ্চিন্ত হতে পারে না কেউ। দেখা গেল, ঘোড়দৌড়ের মতো উত্তেজনা, ভারি মজা। কেউ এসে আমাকে বলে—আমাকে ডুবিয়ো না শঙ্কর, পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাজি রেখেছি ভূতনাথের সঙ্গে। আর অন্য কেউ পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে চেঁচিয়ে ওঠে—বিনয়, ঠিক আছ তো? দেবেনের রুপোর ছুড়িটা জিতিয়ে দেবে তো আমাকে?

'কিন্তু যে দুজনকে নিয়ে এত কথা তাদের ওপর এর ফল কিছুই বোঝা গেল না। যেমন আগে ছিল এখনো তেমনি রইল আমাদের বন্ধুত্ব। বন্ধু, অবিচ্ছেদ্য, নিরন্তর।—কিন্তু মনে মনে এ নিয়ে যে আমি ভাবিনি তাও নয়।'

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলার পর একটু জিরিয়ে নিয়ে আগন্তুক আবার আরম্ভ করল : 'শোনো এবার মন দিয়ে, বিনয়ের আর আমার কথাবার্তাগুলো। বন্ধুর কথাগুলো অবশ্য আমিই শোনাব তোমাকে।

'একদিন আমি তাকে বললাম—ও'ব্রায়েন এই এক মজার ফন্দি করেছে, তোমার আমার ছাড়াছাড়ি ঘটাবার।

বিনয় বলল, সে আর ক-দিনের জন্য!

—পাঁচ বছর, কম কী? ততদিনে কত-কিছু বদলে যেতে পারে।

—তুমি কি বিলেতে যেতে চাও না?

—চাই না তা নয়, কিন্তু এখনই চাই না।

—বিলেতে তো যেতেই হবে। তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারলে মন্দ কী।

—যেতেই হবে কেন?

—বিলেতে না গিয়ে কেউ তো বড় হয় নি, আমাদের দেশে।

—কেন, বিদ্যাসাগর? বঙ্কিমচন্দ্র?

—তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা সরস্বতীর বরপুত্র, আর আমরা হিপক্রেটিস-এর বংশধর। ভালো ডাক্তার হতে হলে বিলেতে যাওয়াই চাই।

—তা তুমি যা-ই বল এই মেডিকেল কলেজের ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে।

আর একটা কথা মনে এনেও মুখে বললাম না, বিনয়কে ছেড়ে অত দূর-দেশে যেতে হবে সে-কথা ভাবতে ভালো লাগে না আমার।

আগন্তুক বলতে লাগল, আমি পরীক্ষার জন্য তৈরিও হচ্ছি আর এই কথাটা নিয়ে তোলপাড়ও করছি মনে মনে। শেষে একদিন লজ্জা কাটিয়ে বললাম—বিনয়, আমি যত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে তোমাকে ছেড়ে বিলেতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

হয়তো একটু অভিমানের সুর ছিল আমার কথায়। বিনয় যদিও মুখে কিছু বলে নি, আমি বুঝেছিলাম যে এ-বিষয়ে তার মনের ভাব ঠিক আমার মতো নয়। বিলেতে সে যেতে চায়। বন্ধুকে ছেড়ে যাওয়া, বিধবা মাকে ছেড়ে যাওয়া—এসব কষ্ট সেখানে বড় হয়ে ওঠে না তার কাছে। সেটাই ঠিক, সেটাই স্বাভাবিক, আমার এই দুর্বলতাই দোষের—সব বুঝেও মনে মনে আমি ঈষৎ ব্যথিত হই।

BanglaBook.org

বিনয় বলল—এসব ভেবে এখন সময় নষ্ট করা কি ভালো? পরীক্ষা এসে গেছে। মনকে তৈরি করে ফ্যালো বিলেতে যাবার জন্য, আর ঠেসে পড়ো। আর-কিছু ভাবতে হবে না।

আমি বললাম—বিনয়, আমার একটা প্রস্তাব আছে।

—বল।

—আমি যদি স্কলারশিপ পাই তুমিও আমারই সঙ্গে একই জাহাজে বিলেতে যাবে? এডিনবরায়? খরচ আমি যে করে হয় দেব।

বিনয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—তা হতে পারে না।

—কেন পারে না? আমি চাইলেই বাবা আমাকে ধার দেবেন।

—তিনি হয়তো দান দিতেও পারেন। কিন্তু—

আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। সে-চোখ কালো আর গভীর আর শান্ত। আমার মনের কথাটা গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল এতক্ষণে—এত কম ভালোবাস আমাকে!

—এত বেশি ভালোবাসি তোমাকে।...থাক, এ নিয়ে আর—

একটু চুপ করে থেকে আমি আবার বললাম—আমি এ-বছর পরীক্ষা দেব না, বিনয়।

আমার চোখের দিকে একপলক তাকিয়ে বিনয় বলল—কী বোকার মতো কথা বলছ তুমি।

জানতাম না, তখন কী সর্বনাশের বীজ আমি বপন করেছিলাম।

পুজোর ছুটিতে বিনয় মা-র কাছে গেল, আমি বাড়ির হট্টগোল এড়াবার জন্য বই-খাতা নিয়ে চন্দননগরের বাগানে আশ্রয় নিলাম। স্থির করলাম, একেবারে কালীপুজো কাটিয়ে ফিরব, কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর আগেই বাড়ির ব্যাপারে একদিন আসতে হল। বিকেলবেলা কলেজের লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখি, বিনয় সেখানে বসে আছে।

তাকে দেখে আমার বুকের ওপর হাতুড়ি পড়ল। কথা ছিল, লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন সে দেশ থেকে ফিরবে। চন্দননগর স্টেশনে নেমে সোজা আসবে আমার কাছে, কালীপুজো পর্যন্ত সেখানেই থাকব আমরা, তারপর একসঙ্গে ফিরব কলকাতায়।

বিনয় খুব নিবিষ্ট হয়ে পড়ছিল, আমাকে দেখতে পায় নি। আমি নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে খুব আস্তে পিঠের ওপর হাত রাখলাম। হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু আমার মনে হল, মুখ তুলে আমাকে দেখে মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল সে। জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার, কখন এলে? চন্দননগর যাও নি যে?

বিনয় বলল—সঙ্গে আমার এক খুড়ো এলেন, তিনি আগে কখনো কলকাতায় আসেন নি। প্রথমে তাঁকে নিয়ে মেস-এ তুলতে হল। কাল কালীঘাট দেখিয়ে পরশু সকালে হাওড়ায় তাঁকে ট্রেনে তুলে দেব, আর আমিও সেই ট্রেনে—

—আসছ তো বাগানে?

—হ্যাঁ, আসব।

দুজনে ফিরে এলাম লাইব্রেরিতে। বিনয়ের পাশের জায়গা খালি ছিল না, আমি একই টেবিলে একটু দূরে বসলাম। আমার সামনে অ্যানিস্থেটিক্স-এর বই, কিন্তু আমার চোখ বারে-বারে বিনয়ের মুখের ওপর পড়ছে, আর বারে-বারে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ এক বিষাদ নেমেছে আমার মনের ওপর; কেন এই বিষাদ, তাও জানি না। দেখছিলাম, বিনয় তার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে খাতায়।

আমার কিছু পড়া হল না। শুধু সামনে বই খুলে বসে থাকলাম। বিনয়ের পড়া শেষ হবার অপেক্ষায়। প্রায় দু-ঘণ্টা পরে বই বন্ধ করল বিনয়। যেন হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে ইশারা করল। একসঙ্গে বেরোলাম দুজনে, কিন্তু—আশ্চর্যের বিষয়—দুজনেই চুপ। বাইরে তখন কার্তিকের সন্ধ্যা, আকাশে রং নেই, বাতাস শিরশিরে ঠাণ্ডা। কলেজের গেট পর্যন্ত এসে আমি দাঁড়ালাম।

BanglaBook.org

জিগেস করলাম—কোথায় যাবে এখন?

—মেস-এ ফিরব।

—আমাকে একবার যেতে হবে দিদির বাড়ি। আটটা নাগাদ ফিরব। এসো তখন।

—আজ তো পারব না।

—তবে কাল সকালে?

—কাল খুড়োকে নিয়ে ব্যস্ত থাকব। পরশু সকালে আটটা-কুড়িতে শিউড়ির গাড়ি। তুমি কি—

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি ঐ একই ট্রেনে যাব। কিন্তু কাল কি সারাদিনই তুমি খুড়োকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে? না-হয় আমিও বেরোব তোমার সঙ্গে—কী বল?

বিনয় চোখ নামিয়ে নিল। আর তার সেই ভঙ্গিটা ছুরির মতো বিঁধল আমাকে। মনের কথা আর লুকিয়ে রাখতে পারলাম না; তার হাত চেপে ধরে বলে উঠলাম—বিনয়, তোমার কী হয়েছে?

—কিছু তো হয় নি। বিনয় হাসল, কিন্তু সে-হাসিও ম্লান।

—নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কোনো অসুখ?

—অসুখ কেন করবে?

—দেশের বাড়িতে কোনো বিপদ?

—কিছু না।

—তাহলে তুমি মনে মনে ভাবছ? বিনয় চুপ।

—বল! আমাকে বল। বলতেই হবে আমাকে!

বিনয় আস্তে আস্তে আমার হাত ছাড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বলল—তোমার কথাই ভাবছি, কত ভাগ্যে তোমার মতো বন্ধু পাওয়া যায়।

এ-কথা শুনে আমি গলে জল হয়ে গেলাম।

এবারে সে বলল—চল আমাকে এগিয়ে দেবে একটু।

হাঁটতে হাঁটতে একটি ছোট আলোচনা হল তার সঙ্গে। এবার দেশে গিয়ে তার মনে হয়েছে—আগেও হয় নি তা নয়—যে ডাক্তারি পেশা সবচেয়ে যেখানে সার্থক হতে পারে সে হল বাংলাদেশের গ্রাম। কলকাতা শহরে—যেখানে বড় ডাক্তার অনেকেই আছেন—সেখানে আর-একজন বড় ডাক্তার হয়ে বসাটা তার পক্ষে কি এতই জরুরি, যখন তারই গ্রাম উচ্ছন্নে যাচ্ছে ম্যালেরিয়ায়, ডিসেন্ট্রিতে, কুসংস্কারে, অশিক্ষায়? তার তো মনে হচ্ছে ওখানেই তার স্থান—যদি পারে মানুষগুলোকে বাঁচাতে—শুধু স্বাস্থ্য দিয়ে নয়, জ্ঞান দিয়েও।

বিনয়ের কথা শুনে আমার হাসি পেল।

—বিলেত থেকে ফিরে পাড়াগাঁয়ে মন টিকবে কি তোমার?

ততক্ষণে তার মেস্-এর দরজায় এসে পড়েছি আমরা। আমার প্রশ্নটার কোনো জবাব না দিয়ে বলল—তাহলে পরশু দেখা হচ্ছে হাওড়ায়?

—সে তো হচ্ছে, কিন্তু কালও এসো একবার। যে-কোনো সময়ে।

আমি হালকা মনে দিদির বাড়ি গেলাম, কিন্তু পরের দিন সত্যি যখন সারাদিনেও বিনয় একবার এল না, রাত্রে আবার মেঘ করে এল আমার মনে। ওর কিছু হয়েছে যা লুকিয়ে রাখছে আমার কাছ থেকে? কেমন যেন আনমনা আনমনা? তা নয় তো কী! আগের দিনের সমস্ত ঘটনা ভেসে উঠল আমার মনে; লাইব্রেরিতে আমাকে দেখে চমকে ওঠা, পড়তে পড়তে একবারও না- তাকানো, আমার কথার উত্তরে চোখ নামিয়ে নেয়া। না, না, এটা তার স্বাভাবিক অবস্থা নয়, নিশ্চয়ই কোনো গোপন দুশ্চিন্তায় সে কষ্ট পাচ্ছে। কী? ওর অসুখ? ওর মার? জমিদারের খাজনা বাকি পড়েছে? বসতবাড়ি নিয়ে টানাটানি? নাকি কোনো বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে গোপনে? যদি কিছু হয়ে থাকে আমাকে বলছে না কেন? আমাকে বলতে পারে না এমন কিছু আছে নাকি ওর? নাকি সবই আমার

BanglaBook.org

কল্পনা?

এইসব ভাবতে ভাবতে অনেক রাত্রে ঘুম এল। আ—সেই ঘুমিয়ে পড়ার সুখ! ভাবনাগুলো যেন পরস্পর গলে যায়, শান্তি নামে কালো হয়ে।—কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়লে না তো? শুনছ?

সুকুমার সাড়া দিল, শুনছি। তারপর?

আগন্তুক আবার বলতে লাগল, পরের দিন হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়ল। প্যাসেঞ্জার গাড়ি, থার্ড ক্লাস কামরা, ছুটির পরে বেজায় ভিড় হয়েছে। বিনয়ের আধ-বুড়ো খুড়োকে কোনোরকমে বসিয়ে আমরা দুজনে দরজার ধারে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যাওয়া যাবে।

ভিড়, গোলমাল, ট্রেনের শব্দে কথা বলার সুবিধে নেই, কিন্তু চলতি ট্রেনে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে আমার। ওকে দেখতেই ভালো লাগছে। আজ সকালে ওর মুখে কোনো মালিন্য নেই, চোখ উজ্জ্বল, ঠোঁটের কোণে হাসি। একের পর এক সরে-যাওয়া টেলিগ্রাফের তারগুলো দেখতে দেখতে আমার কালকের সব দুর্ভাবনা যেন বাষ্পের মতো মিলিয়ে গেল।

লিলুয়ার পরে ট্রেন যখন বেশ স্পিড নিয়েছে, বিনয় তখন বলল—দরজাটা খটখট করছে কেন? ভালো বন্ধ নেই?

আমি উদাসভাবে বললাম—ঠিকই আছে।

—নাহ্, ঠিক মনে হচ্ছে না। একটু সরো তো। বাইরে হাত বাড়িয়ে হুড়কোটা আঁট করতে গেল বিনয়, আর হঠাৎ আমি কানের মধ্যে শোঁ-শোঁ হাওয়ার আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার জোরালো হাত জড়িয়ে ধরলে আমাকে।

—আহ্! ও-রকম করে দাঁড়াতে হয় কখনো? তুমি কী!

আমি তাকিয়ে দেখলাম বিনয়ের মুখে আর রং নেই, ঠোঁট কাঁপছে, আর গাড়ির খোলা দরজাটা ঠকাশ-ঠকাশ করছে হাওয়ায়।

—ও-রকম দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াতে হয় কখনো! ধমক দিয়ে উঠল বিনয়—সরো! সরে দাঁড়াও!

আমাকে ছেড়ে দিয়ে ভালো করে এঁটে দিল দরজাটা। বাকি পথ দরজাটা আগলে রইল যেন—যাতে আমি কাছে ঘেঁষতে না পারি। তার অতি-সাবধানতায় আমার হাসি পেল।

'চন্দননগরে চমৎকার কাটল দিনগুলি', একটু চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করল আগন্তুক—'একসঙ্গে পড়া, খাওয়া, বেড়ানো, একই সময়ে ঘুমিয়ে পড়া আর জেগে ওঠা। বাগানে স্থলপদ্ম, নদীতে ভরা জল, বাঁধানো বটতলায় ছায়া, বিকেলে মাঝে মাঝে ব্যাটমিন্টন। যেমন ছ-বছর ধরে হয়েছে, তেমনি করেই পরস্পরের সাহায্যে হু-হু করে এগিয়ে গেল আমাদের পরীক্ষার পড়া।

তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন কেমন হয়ে যায় বিনয়। পড়া বন্ধ করে উঠে গিয়ে পায়চারি করে বাগানে, বটতলায় চুপচাপ বসে থাকে, নয়তো দূরে ঘোষালের ঘাটে চলে যায়—আমি তাকে খুঁজে বের করি।

—কী হয়েছে তোমার? বল না, কী হয়েছে?

বিনয়ের সেই এক উত্তর—কিছু তো হয় নি। যত চেষ্টা করি, কিছুতেই সেই পর্দা সরে না। পর্দা নয়, দেয়াল। আর সেই দেয়ালে মাথা ফাটাতে ইচ্ছে করে আমার। কিন্তু পরের দিন সে যখন আবার হাসে, সব ভুলে যাই।

সারাদিন ধরে পড়ে বিকেলের দিকে মাথা যেন ঝিমঝিম করে, মাঝে মাঝে নদীতে বেড়াতে যাই। বাবা একটা বিলিতি শ্যালপ আনিয়েছিলেন, যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি বাইতে আরাম। একদিন সূর্যাস্তের সময় চলেছি দুজনে; নদীর জলে সোনা, মস্ত উঁচু আকাশ, জগৎ জুড়ে শান্তি। খেয়াল ছিল না, কত দূরে চলে এসেছি। বিনয় মনে করিয়ে দিল—এবার ফেরো, শঙ্কর। অনেকখানি এসে পড়েছি আমরা আজকে।

BanglaBook.org

আমি বললাম—এবার তুমি বাইবে।

বিনয় দাঁড় হাতে নিল, আমি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারা-ফোটা আকাশের তলায় ঠাণ্ডা বাতাসে, জলের ছলছল শব্দে, আমার মনে ঘুমের মতো আবেশ নামল। হঠাৎ কী-রকম একটা শব্দে চমকে উঠে বসলাম। অন্ধকার, দূরে মিটমিট করছে আলো, কালো আকাশ ভরে ঝকঝকে তারা। আর শোঁ-শোঁ একটা শব্দ। আর সেই শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বিনয়ের বড়-বড় ভারী নিশ্বাস।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—বিনয়!

—কিছু ভয় নেই। দাঁড় ধরো ওদিকে।

—আমাকে আগে ডাকলে না কেন? এসে গেল যে! বলতে বলতে হালকা শ্যালপ দুলে উঠল, গর্জনে ভরে গেল আমার কান। চারদিকে জল—অন্ধকার—নিশ্বাস নেই—তারপর দুখানা সবল হাত বেষ্টন করল আমাকে, পাটাতনে শুয়ে হাঁপাতে লাগলাম।

ফিরে এলাম যখন, তখন রাত প্রায় ন-টা; রামরতন লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। সে কিছু লক্ষ্য করার আগেই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে নিলাম দুজনে। গরম-গরম লুচি আর মাংস খাবার পরে দেহের তেজ ফিরে এল। হেসে বললাম—খুব একটা অ্যাডভেঞ্চার হল আজ।

—হুঁ।

—আমারই ভুল। আমারই জানা উচিত ছিল আজ অমাবস্যা, বান আসবে।

—এখন ভালো বোধ করছ তো?

—আমার কিছুই হয় নি। জান তো, এই বানের ওপর দিয়ে কতবার সাঁতরে গেছি আমি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলেই—আর একেবারে হঠাৎ—। তোমারই কত কষ্ট হল। কতক্ষণ একলা উজান বাইলে।

বিনয় খুব নিচু গলায় বলল—আজ আর কথা না। ঘুমিয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি।

এর পর যে-কদিন বাগানে ছিলাম, বিনয় আনন্দে উৎসাহে সাহচর্যে একেবারে ভরে রাখল আমাকে। কালীপুজোর দিন কলকাতায় ফিরে এলাম দুজনে।

আর এক মাস—আর কুড়ি দিন—পনের দিন—এমনি করে করে সেই সোমবার, যার পরের সোমবার পরীক্ষা আরম্ভ।

শেষ সপ্তাহটি একসঙ্গে রাত জেগেছি আমরা—ঠিক তুমি যেমন এখন রাত জেগে পড়ছ। মা আর-একটা খাট আনিয়ে দিয়েছেন আমার ঘরে, দেয়াল ঘেঁষে কঙ্কাল, কাচের আলমারিতে মড়ার খুলি, হাড়ের টুকরো, টেবিলে মোটা মোটা বই-খাতা, অঙ্কের আর ল্যাটিন ভাষার হিজিবিজি। বারান্দায় রামরতন শোয়, তোলা উনুনে কাঠকয়লা জ্বলে, আমাদের দরকারমতো গরম চা তৈরি করে এনে দেয়।

শুক্রবার রাত্রে আমি বললাম—বিনয়, আমার মনে হচ্ছে, তুমি আর আমি ব্র্যাকেটে ফার্স্ট হব। ডবল খরচ হবে ওব্রায়েন সাহেবের।

বিনয়ের মুখে ছায়া পড়ল। ভুরু কুঁচকে বলল, তা কি আর হবে। দু-চার নম্বরের হলেও তফাৎ থাকবেই।

—আর সে-তফাৎ তোমার দিকেই থাকবে। আমি হাসলাম। বিনয় বইয়ের ওপর চোখ নামিয়ে নিল।

সে-রাত্রে বারোটায় যখন আমাদের জন্য চা এল, বিনয় পকেট থেকে একটি পুরিয়া বের করে তাতে একরকম শাদা গুঁড়ো মিশিয়ে নিল। বলল—ঘুম তাড়াবার ওষুধ।

—তোমারও তাহলে ঘুম পায়?

—আজ পাচ্ছে।

BanglaBook.org

—ঘুমের আর দোষ কী! ও-রকম রাতের পর রাত না-ঘুমিয়ে—সত্যি! থাক আজ, বরং ঘুমোই এস।

—কিন্তু এখন তো আর চার ঘণ্টার মধ্যে ঘুম পাবে না আমার।

—তাহলে আমাকেও একটু দাও ওষুধটা।

—নেবে? বিনয় পকেটে হাত দিল। হঠাৎ কেমন শাদা দেখাল তাকে। পকেট থেকে যখন হাত বের করল, আমার মনে হল তার আঙুল কাঁপছে।

তার শাদা গুঁড়ো আমার চায়ে মিলিয়ে গেল, আস্তে আস্তে দুজনে চা শেষ করলাম। টেবিলের দুদিকে বসে আছি দুজনে, মাঝখানে প্যাথলজির বই খোলা। সে পড়ে যাচ্ছে, বুঝিয়ে বলছে, আমি শুনছি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে আমাকে, আমি ঠিক-ঠিক জবাব দিয়ে যাচ্ছি। আবার খানিক পরে আমি জেরা করছি তাকে। এমনি চলতে চলতে হঠাৎ একসময় বইয়ের পাতা ঝাপসা হয়ে এল আমার চোখে, আর সেই মুহূর্তে মনে হল বিনয়ের আর বইতে মন নেই, সে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আস্তে আস্তে তার মুখটা বিকট হয়ে উঠল—চোখ গর্ত, গালে মাংস নেই, মাথার চাঁদি উঠে গেছে—ঠোঁট, নাক, দাঁতের বদলে সারা মুখ জুড়ে এক নিঃশব্দ বিদ্রূপ। প্রায় একটা ভয় ছড়িয়ে পড়ছিল আমার স্নায়ুতে, কিন্তু তখনই পা-টা মেঝেতে ঢুকে গেল, চমকে জেগে উঠলাম।

—তোমার ওষুধে তেমন কাজ হল না, বিনয়। এর মধ্যে স্বপ্ন দেখেও উঠলাম।

—কী স্বপ্ন দেখলে?

—ঐ কাঠের আলমারির কঙ্কালটা আমাকে তাড়া করেছে।

আমি হাসলাম। ছ-বছর ডাক্তারি পড়ার পর এখন যদি ভূতের ভয় ধরে—

—তোমাকে অল্প দিয়েছিলাম। আচ্ছা, কাল হেভি ডোজ আনব।

—তা-ই এনো। কিন্তু রোববারে আর রাত জাগব না কিন্তু।

—না, রোববারে আর না! অদ্ভুত মোটা শোনাল বিনয়ের গলা।

শনিবার। স্তব্ধ রাত, সারা বাড়ি ঘুমন্ত, সে আর আমি ছাড়া কেউ কোথাও জেগে নেই। দুজনের এক জ্ঞান, এক ধ্যান, এক লক্ষ্য। শুধু বন্ধু নয়, সত্যি যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছি দুজনে। কী আনন্দ, এমনি একজনকে আমার জীবনে আমি পেয়েছি! কী আনন্দ, এমনি কোনো কঠিন কাজের মধ্যে দিয়ে কারো সঙ্গে মিলতে পারা! পড়া, পরীক্ষা, সব ছাপিয়ে এই ভাবনাই বড় হয়ে উঠল আমার মনে—আমার মন যেন হিমালয়ের চূড়াকে স্পর্শ করল, ছড়িয়ে পড়ল তারায়-তারায়। হঠাৎ আমি তার কব্জিতে হাত রাখলাম। যেন ঝাঁকানি খেয়ে চমকে উঠল সে।

—কী হল?

—আমারও বোধহয় ঘুম পাচ্ছে।

—আমি বলতে চাচ্ছিলাম—আজ আর পড়া থাক।

—এই তো হয়ে যাবে। আর-একটু।

—আমার ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে এসো রবিবাবুর কবিতা পড়ি। ছাতে গিয়ে বসবে?

—না। বরং চা হোক।

জল চাপানোই ছিল, বিনয় দুটি ভরা-পেয়ালা নিয়ে এল টেবিলে। পকেট থেকে দুটি পুরিয়া বের করে আলোর কাছে দেখল একবার, নিজেরটিতে সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে বলল—আজ আরো কড়া করেছি। তোমাকে দেব?

—দাও।

অন্য পুরিয়াটি আমার পেয়ালায় ঢেলে দিয়ে সেই পেয়ালাটার দিকেই তাকিয়ে রইল বিনয়। আমি হাত বাড়ালাম কিন্তু পেয়ালাটা ছুঁতে পারলাম না, এক কঠিন আঘাত অবশ করে দিল

BanglaBook.org

আমাকে। টকটকে লাল বিনয়ের মুখ, পেশিগুলো বিকৃত, আগুনের মতো নিশ্বাস। তাকে মুচড়ে দিয়ে একটা বোবা, ভোঁতা, পাশবিক আওয়াজ বেরিয়ে এল, আমার পেয়ালাটা হাতে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ফেলল।

সে দাঁড়িয়েই ছিল, আমার সময়ের কোনো জ্ঞান ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছের মতো পড়ে যেতে দেখলাম তাকে, চেয়ার উল্টে গেল, টেবিল কেঁপে উঠল, কপাল ফেটে রক্ত বেরোল তার।

তখন আমার চিৎকারে সারা বাড়ির ঘুম ভাঙল।

এল বাড়ির লোক, পাড়ার লোক, ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, আমাদের অতি প্রিয় মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে সাড়া পড়ে গেল ... পুলিশও এল। আমাকে নিয়ে গেল হাজতে।

মর্গের রিপোর্ট : বিষপ্রয়োগে মৃত্যু। আর পুলিশের হাতে তার পকেটে পাওয়া চিঠি : "যে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে, আমি যাকে সবচেয়ে ভালোবাসি, সে এখন আমার সফলতার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং একমাত্র অন্তরায়ও সে। তাকে সরাতে পারলে আমার পথ পরিষ্কার। তাই এইরকম একটা ষড়যন্ত্র করলাম গোপনে গোপনে। ভাবলাম : তাহলে আর দশ বছরের মধ্যে আমি নীলরতনের দু-নম্বর হতে পারি, কুড়ি বছরের মধ্যে আর-একজন নীলরতন ডাক্তার। হতে পারি নয়, হবই। সে ছাড়া আমার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই তাকে আমি সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি—একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার। ট্রেন থেকে ফেলে দিতে গিয়েছিলাম, নিজের দুর্বলতার জন্য পারি নি। জলে ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিলাম, নিজের দুর্বলতার জন্য পারি নি। তৃতীয়বার চায়ে বিষ মিশিয়ে—সেখানেও নিজের দুর্বলতা বাধা দিল। মনের মধ্যে এই পাপ নিয়ে আমি আর বাঁচতে চাই না, তার জন্য তৈরি বিষেই নিজের প্রাণ সংহার করছি। তার ভালো হোক।"

কোর্টে দাঁড়িয়ে আমি বললাম যে চিঠির কথা সত্য নয়, আমাকে বাঁচাবার জন্য সে ও-রকম লিখেছিল। আসলে আমিই তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিলাম। আমি কোনো করুণা প্রার্থনা করি না, আমাকে যথোচিত শাস্তি দেয়া হোক। এখন আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা।

বাবা বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার লাগালেন, কোর্টে লোক ধরে না, সারা মেডিকেল কলেজ ভেঙে পড়ে। ছ-মাস পরে আমি বেকসুর খালাস পেলাম। যথেষ্ট প্রমাণ কোনোদিকেই ছিল না, কিন্তু আমার বয়স দেখে জুরিদের দয়া হল।

উৎসব পড়ে গেল আমি যেদিন বাড়ি ফিরলাম। আর পরের দিনই বুক চাপড়ে কান্না। অবশ্য সে-কান্না আমি কানে শুনি নি, কেননা তার আগের রাত্রে একখানা ধুতির সাহায্যে আমার দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলাম।

আগন্তুকের অদ্ভুত কাহিনীটি শোনার পর সুকুমার জিজ্ঞেস করল, 'চিঠিটা বিনয় কখন লিখেছিল?'

কিন্তু সামনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। সুকুমার আবার বলল, 'নিশ্চয়ই আগেই লিখে এনেছিল পকেটে?' কিন্তু কী করে আগে থেকেই জানল কে মরবে, বা দুজনের মধ্যে একজনও মরবে কিনা? বলেই ভাবল, কাকে বলছি কথাটা? কে এই বিনয়? আর এই শিবশঙ্করই বা কে? আবার ভাবল, মিছিমিছি দুটো জীবন নষ্ট হল। দুটো ভালো জীবন। কিন্তু তাও তো দরকার। সব যদি ঠিকমতো চলবে তাহলে সাহিত্য হবে কেমন করে? ভাগ্যিস মানুষ ভুল করে।

আলো নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সুকুমার। চোখ ডুবে গেল অন্ধকারে, কানে এল বৃষ্টির শব্দ, পাতার শব্দ। আরাম। ঘন, কালো, গভীর হয়ে ঘুম নামল তার চেতন্যের ওপর। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ভাবল, এই পরীক্ষা ব্যাপারটা কিন্তু বড় বাজে।

BanglaBook.org

ছবির ভূত

মা নি ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯০৮--১৯৫৬
পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জ জেলার মালবদিয়া গ্রামে। পিতার কর্মস্থল সাঁওতাল পরগণার দুমকা গ্রামে জন্ম। পিতৃদত্ত নাম প্রবোধ কুমার। ম্যাট্রিক ও আই এস সি পাস যথাক্রমে ১৯২৬ ও ১৯২৮ সালে। প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতশাস্ত্রে বি এস সি ক্লাসে অধ্যয়ন কালে বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ধরে অতসী মামী গল্প রচনার মাধ্যমে সাহিত্য জগতে প্রবেশ। সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতাবশত এরপর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ায় অবহেলার কারণে বি এস সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ১৯৪৪ সাল থেকে আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সক্রিয়ভাবে। পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিরিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম। বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন বিশেষ পারঙ্গম। *পদ্মানদীর মাঝি*, *দিবারাত্রির কাব্য*, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, *অহিংসা*, *চতুষ্কোণ*, *চিহ্ন*, *সোনার চেয়ে দামি* তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস; *প্রাগৈতিহাসিক*, *স্বাধীনতার স্বাদ*, *ছোট বকুলপুরের যাত্রী*, *উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ* তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ।

একদিন সকালবেলা পরাশর ডাক্তার নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরিতে বসে চিঠি লিখছিলেন। চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নগেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তাঁর টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল। পরাশর ডাক্তার মুখ না তুলেই বললেন, 'বোস, নগেন।'

চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে চাকরকে ডেকে সেটি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আবার নগেনের দিকে তাকালেন।

—'বসতে বললাম যে? এ-রকম চেহারা হয়েছে কেন? অসুখ নাকি?'

নগেন ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সে চুরি করে কি না, এইরকম অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে সে বলল, 'না, না, অসুখ নয়, অসুখ আবার কিসের!'

গুরুতর কিছু যে ঘটেছে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পরাশর ডাক্তার দু-হাতের আঙুলের ডগাগুলো একত্র করে নগেনকে দেখতে লাগলেন। মোটাসোটা হাসিখুশি ছেলেটার তেল-চকচকে চামড়া পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গেছে, মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই। চাউনি একটু উদভ্রান্ত। কথা বলার ভঙ্গি কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে!

নগেন তার মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। মাস-দুই আগে নগেনের মামার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটেছে, ছেলেটা যাতে এ-রকম বদলে যেতে পারে? ছেলেবেলা থেকে মামাবাড়িতেই সে মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু মামার শোকে এ-রকম কাহিল হয়ে পড়ার মতো আকর্ষণ তো মামার জন্য তার কোনোদিন ছিল না! বড়লোক কৃপণ মামার যে-ধরনের আদর বেচারি চিরকাল পেয়ে এসেছে, তাতে মামার পরলোক-যাত্রায় তার খুব বেশি দুঃখ হবার কথা নয়। বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখালেও মনেমনে নগেন যে তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত, তাও পরাশর ডাক্তার ভালো

করেই জানতেন। পড়ার খরচের জন্য দুশ্চিন্তা হওয়ার কারণও নগেনের নেই, কারণ শেষ-সময়ে কী ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে রেখে গেছেন।

নগেন হঠাৎ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'ডাক্তার-কাকা, সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আমি কি পাগল হয়ে গেছি?'

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'তোমার মাথা হয়ে গেছ। পাগল হওয়া কি মুখের কথা রে বাবা! পাগল যে হয় অত সহজে সে টের পায় না, সে পাগল হয়ে গেছে!'

'তবে—' দ্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আচ্ছা ডাক্তার-কাকা, প্রেতাত্মা আছে?'

'প্রেতাত্মা মানে তো ভূত? নেই।'

'নেই? তবে—'

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে, অনেক ভূমিকা করে, অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল। চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনী! বিশ্বাস করা শক্ত হলেও পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করলেন। মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাঁকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়, তিনি তা জানতেন।

মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে প্রথমটা নগেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মামার এ-রকম উদারতা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। বাইরে যেমন ব্যবহারই করে থাকুন, মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতোই ভালোবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তার মন ভরে গেল। আর সেই সঙ্গে জাগল, এইরকম দেবতার মতো মানুষকে সারাজীবন ভক্তি-ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে, দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ।

শ্রাদ্ধের দিন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর অনুতাপটা যেন বেড়ে গেল—শুয়ে-শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ একসময় তার মনে হল, সারাজীবন তো ভক্তি-শ্রদ্ধার ভান করে মামাকে সে ঠকিয়েছে, এখন যদি সত্য-সত্যই ভক্তি-শ্রদ্ধা জেগে থাকে, লাইব্রেরি-ঘরে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে, মনটা শান্ত হবে।

রাত্রি তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে, সকলে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে—বাড়ি অন্ধকার। এত রাত্রে ঘুমানোর বদলে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াটা যে রীতিমতো খাপছাড়া ব্যাপার হবে, সে-জ্ঞান নগেনের ছিল। তাই কাজটা সকালের জন্য স্থগিত রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মন একটু শান্ত না হলে যে, ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করার পর সেটা ভালো করেই টের পেয়ে শেষকালে মরিয়া হয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

লাইব্রেরিটি নগেনের দাদামহাশয়ের আমলের। লাইব্রেরি-সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাঁর আমলে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পিছনে একটি পয়সাও খরচ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ! আলমারি-কয়েকটি অল্পদামি আর অনেকদিনের পুরনো, ভিতরগুলি বেশির ভাগ অদরকারি বাজে বইয়ে ঠাসা এবং উপরে বহুকালের ছেঁড়া মাসিকপত্র আর নানারকম ভাঙাচোরা ঘরোয়া জিনিস গাদা করা। টেবিলটি এবং চেয়ার কয়েকটি খুবসম্ভব অন্য ঘর থেকে পেনশন পেয়ে এ-ঘরে স্থান পেয়েছে। দেয়ালে তিনটি বড় বড় তৈলচিত্র, শস্তা ফ্রেমে-বাঁধানো কয়েকটা সাধারণ রঙিন ছবি ও ফটো টাঙানো। তাছাড়া, কয়েকটা পুরনো ক্যালেন্ডারের ছবিও আছে—কোনোটাতে ডিসেম্বর, কোনোটাতে চৈত্রমাসের বার-তারিখ লেখা

BanglaBook.org

কাগজের ফলক এখনও ঝুলছে।

তৈলচিত্রের একটি নগেনের দাদামশায়ের, একটি দিদিমার এবং অপরটি তার মামার। দাদামশায় আর দিদিমার তৈলচিত্র দুটি একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি টাঙানো আছে, মামার তৈলচিত্রটি স্থান জুড়ে আছে পাশের দেয়ালের মাঝামাঝি।

কারও ঘুম ভেঙে যাবার ভয়ে নগেন আলো জ্বালে নি। কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না, ছেলেবেলা থেকে এ-বাড়ির আনাচ-কানাচের সঙ্গে তার পরিচয়। লাইব্রেরিতে ঢুকে অন্ধকারেই সে মামার তৈলচিত্রের কাছে এগিয়ে গেল। অস্ফুটস্বরে 'আমায় ক্ষমা কর মামা' বলে যেই সে তৈলচিত্রের পায়ের কাছে আন্দাজে স্পর্শ করেছে ...বর্ণনার এইখানে পৌঁছে নগেন শিউরে চুপ হয়ে গেল; তার মুখ আরও বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দু-চোখ বিস্ফারিত।

'তারপর?'

নগেন ঢোঁক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'যেই ছবি ছুঁয়েছি ডাক্তার-কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। সমস্ত শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি সকাল হয়ে গেছে, আমি মামার ছবির নিচে মেঝেতে পড়ে আছি।'

পরাশর ডাক্তার গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আগে কোনোদিন ফিট হয়েছিল নগেন?'

নগেন মাথা নেড়ে বলল, 'ফিট? না, কস্মিনকালেও আমার ফিট হয় নি! আপনি ভুল করছেন ডাক্তার-কাকা, এ ফিট নয়; মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে, মামাও জানতে পেরেছেন টাকার লোভে আমি তাঁকে মিথ্যা ভক্তি দেখাতাম। তাই ছবি ছোঁয়ামাত্র রাগে-ঘেন্নায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সবটা শুনুন আগে, তাহলে বুঝতে পারবেন।'

সমস্ত সকালটা নগেন মরার মতো বিছানায় পড়ে রইল। এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল, ভক্তি-ভালোবাসার ছলনায় টাকা আদায় করে নিয়েছে বলে পরলোকে গিয়েও তার ওপর মামার এমন জোরালো বিতৃষ্ণা জেগেছে যে, তৈলচিত্রটি পর্যন্ত তিনি তাকে স্পর্শ করতে দিতে রাজি নন। যাই হোক, নগেন এ-কালের ছেলে, প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর, তার মনে নানারকম দ্বিধা-সন্দেহ জাগতে লাগল। কে জানে রাত্রে যা ঘটেছে, তা নিছক স্বপ্ন কি না! ধৈর্য ধরতে না পেরে দুপুরবেলা সে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে মামার তৈলচিত্র স্পর্শ করে প্রণাম করল। একবার যদি মামা রাগ দেখিয়ে থাকেন, আবার দেখাবেন না কেন?

এবার কিছুই ঘটল না। শরীরটা অবশ্য খুব খারাপ হয়ে আছে, মেঝেতে ধাক্কা যেখানে লেগেছিল, মাথার সেখানটা ফুলে টনটন করছে এবং সকালে লাইব্রেরিতে মামার তৈলচিত্রের নিচে মেঝেতেই তার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু এতে বড়জোর প্রমাণ হয়, রাত্রে ঘুমের মধ্যেই হোক আর জাগ্রত অবস্থাতেই হোক, লাইব্রেরিতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল। নিজের তৈলচিত্রে ভর করে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন, তার কি প্রমাণ আছে?

নগেন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু বেশিক্ষণ তার মনের শান্তি টিকল না। রাত্রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার তো ভুল হয়েছে! দিনের বেলা তাকে ধাক্কা দেওয়ার মতো ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই, রাত্রি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই করতে পারেন না! কী সর্বনাশ! তবে তো রাত্রে আরেকবার মামার তৈলচিত্র না ছুঁয়ে কাল রাত্রের ব্যাপারকে স্বপ্ন বলা যায় না।

এত রাত্রে আবার লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবেই হৃৎকম্প হতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না মিটিয়েই বা মানুষের চলে কী করে? খানিক পরে নগেন আবার লাইব্রেরিতে হাজির।

BanglaBook.org

ভয়ে বুক কাঁপছে, ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী এক অদম্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মামার তৈলচিত্রের দিকে। ঘরে ঢুকেই সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। মটকার পাঞ্জাবির ওপর দামি শাল গায়ে মামা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে একজোড়া মোটা গোঁফ, চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি। নগেন এগিয়ে গিয়ে মামার পায়ের কাছে ছবি স্পর্শ করল। কেউ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না, কিন্তু সমস্ত শরীরটা হঠাৎ যেন কেমন অস্থির অস্থির করতে লাগল। তৈলচিত্র থেকে কী যেন তার মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তবু নগেন যেন বাঁচল। ভয়ের জন্য শরীর এ-রকম অস্থির করতে পারে। সেটা সামান্য ব্যাপার।

ফিরে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আরেকটা কথা মনে এসেছে। কাল ঘর অন্ধকার ছিল, আজ আলো থাকার জন্য যদি মামা কিছু না করে থাকেন? নগেনের ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল, অনেকটা নিশ্চিত মনেই সে অন্ধকারে তৈলচিত্রের কাছে ফিরে গেল। সে জানে, অন্ধকারে তৈলচিত্র স্পর্শ করলেও কিছু হবে না। ঘরে একটা আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না, তাতে বিশেষ কী আসে যায়? ইতস্তত না করেই সে সোজা তৈলচিত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে—

'ঠিক প্রথম-রাতের মতো জোরে ধাক্কা দিয়ে মামা আমায় ফেলে দিলেন ডাক্তার-কাকা।'

'অজ্ঞান হয়ে গেলে?'

'না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাই নি! অবশ আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়ে ছিলাম, কিন্তু জ্ঞান ছিল। তারপর থেকে আমি ঠিক পাগলের মতো হয়ে গেছি ডাক্তার-কাকা! দিনরাত কেবল এই কথাই ভাবি। রোজ কতবার ঠিক করি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাবে, কিন্তু যেতে পারি না, কিসে যেন আমায় জোর করে আটকে রেখেছে!'

পরাশর ডাক্তার অনেকক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর আর কোনোদিন ছবিটা ছুঁয়েছ?'

'কতবার। দিনে ছুঁয়েছি, রাত্রে ছুয়েছি, আলো জ্বেলে ছুঁয়েছি, অন্ধকারে ছুঁয়েছি। ঠিক ওইরকম ব্যাপার ঘটে। দিনে বা রাত্রে আলো জ্বেলে ছুঁলে কিছু হয় না, অন্ধকারে ছোঁয়ামাত্র মামা আমাকে ঠেলে দেন। সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে! কোনোদিন অজ্ঞান হয়ে যাই, কোনোদিন জ্ঞান থাকে।'

বলতে বলতে নগেন যেন একেবারে ভেঙে পড়ল, 'আমি কী করব ডাক্তার-কাকা? এমন করে কদিন চলবে? মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কথা ভাবি।'

পরাশর ডাক্তার বললেন, 'তার দরকার হবে না। আমি সব ঠিক করে দেব। আজ সকলে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রি ঠিক বারোটার সময় তুমি বাইরের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমি যাব।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'ভূত বলে কিছু নেই, নগেন।'

তবু মাঝরাত্রে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাক্তার মৃদু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ-ঘরে বাড়ির লোক খুব কম আসে। ঘরের বাতাসে পুরনো কাগজের একটা ভ্যাপসা গন্ধ পাওয়া যায়। নগেন শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরে কাঁপছে। কিসের ভয়? ভূতের? তৈলচিত্রের ভূতের? ভূতে যে একেবারে বিশ্বাস করে না, যার বদ্ধমূল ধারণা এই যে—যত সব অদ্ভুত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায় তার প্রত্যেকটির সাধারণ ও স্বাভাবিক কোনো ব্যাখ্যা আছেই

BanglaBook.org

আছে—ছবির ভূতের অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য ভূতের ঘরে পা দিয়ে তার কখনো কি ভয় হতে পারে? তবু অস্বস্তি যে বোধ হচ্ছে, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নগেন যে কাহিনী শুনিয়েছে, সারাদিন ভেবেও পরাশর ডাক্তার তার কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা করতে পারেন নি। একদিন নয়, একবার নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবার। দিনে তৈলচিত্র নিস্তেজ হয়ে থাকে, রাত্রে তার তেজ বাড়ে। কেবল তাই নয়, অন্ধকার না হলে সে তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। আরও একটা কথা, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তৈলচিত্র যেন বেশি সজীব হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম রাত্রে নগেন অন্ধকারে স্পর্শ করলে ছবি নগেনের হাতটা শুধু ছিটকিয়ে সরিয়ে দিয়েছে; মাঝরাত্রে স্পর্শ করলে এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছে যে, মেঝেতে আছড়ে পড়ে নগেনের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

অশরীরী শক্তি কল্পনা করা ছাড়া এ-সমস্তের আর কী মানে হয়?

হয়—নিশ্চয় হয়; মনেমনে নিজেকে ধমক দিয়ে পরাশর ডাক্তার নিজেকে এই কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন দেয়ালের যেখানে নগেনের মামার তৈলচিত্রটি ছিল। এ-ঘরে তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন, তৈলচিত্রগুলোর অবস্থান তাঁর অজানা ছিল না। যা চোখে পড়ল তাতে পরাশর ডাক্তারের বুকটাও ধড়াস করে উঠল। তৈলচিত্রের উপরের দিকে দুটি উজ্জ্বল চোখ তাঁর দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। চোখদুটির মধ্যে ফাঁক প্রায় দেড় হাত।

ঠিক এই সময় নগেন ফিসফিস্ করে বলল, 'আলোটা জ্বালব ডাক্তার-কাকা?'

পরাশর ডাক্তার তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন—'না।'

রাস্তা অথবা পাশের কোনো বাড়ি থেকে সরু আলোর রেখা ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে। তাতে অন্ধকার কমে নি, মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটুকুতে ঘরের অন্ধকারটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র।

নগেন আবার ফিসফিস করে বলল, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ডাক্তার-কাকা। দাদামশায় আর দিদিমার ছবি তাঁরা মরবার পর করা হয়েছিল, কিন্তু মামার ছবিটা মরবার আগে মামা নিজে শখ করে আঁকিয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্যেই—'

নগেনের শিহরন স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। 'ভয় পেয়ে গেছেন?'

পরাশর ডাক্তারকে স্বীকার করতে হল, একটু ভয় তিনি সত্যই পেয়ে গেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক মন এতদিন পরে একটা মস্ত সত্য আবিষ্কার করল যে, মানুষের মন চিরদিনই মানুষের মন। যুক্তি, তর্ক, বিশ্বাস, অবিশ্বাস দিয়ে মানুষ ভয়কে জয় করতে পারে না। দেহে আঘাত লাগলে যেমন বেদনা বোধ হবেই, তেমনি উপযুক্ত ভয়ের কারণ উপস্থিত হলে মানুষকে ভয় পেতেই হবে।

যাই হোক, একদিন যদি তিনি ভুল বিশ্বাস পোষণ করে এসে থাকেন, আজ ছবির ভূতের কল্যাণে সে ভুল তাঁর ভেঙে যাবে। তাতে ক্ষতি কী? দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পরাশর ডাক্তার তৈলচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে জ্বলজ্বলে চোখদুটির জ্যোতি অনেক কমে গেল।

হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে তাঁর হাত পড়ল দেয়ালে। যত সাহস করেই এগিয়ে এসে থাকুন, প্রথমেই একেবারে নগেনের মামার গায়ে হাত দিতে তাঁর কেমন দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। পাশের দিকে হাত সরিয়ে তৈলচিত্রের ফ্রেম স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তাঁর শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ করে পিছন দিকে দু-পা ছিটকে গিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন।

পরক্ষণে ভয়ে অর্ধমৃত নগেন আলোর সুইচ টিপে দিলে।

BanglaBook.org

মিনিট-পাঁচেক পরাশর একদৃষ্টে তাকিয়ে চোখ বুজে বসে রইলেন, তারপর চোখ মেলে মিনিট-পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মামার রুপার ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রটির দিকে।

তারপর তীব্র চাপা গলায় তিনি বললেন, 'তুমি একটি আস্ত গর্দভ নগেন।'

রাগ একটু কমলে পরাশর ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'গাধাও তোমরা চেয়ে বুদ্ধিমান। এত কথা বলতে পারলে আমাকে, আর এই কথাটা একবার বলতে পারতে না যে, তোমার মামার ছবিটা ইতিমধ্যে রুপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে, আর ছবির সঙ্গে লাগিয়ে দুটো ইলেকট্রিক বাল্‌ব ফিট্ করা হয়েছে?'

'আমি কি জানি! ছ-মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ছবিটা এখনো তেমনি অবস্থাতেই আছে।'

'ইলেকট্রিক শক খেয়ে বুঝতে পার না কিসে শক্ লাগল, তুমি কোন্ দেশি ছেলে? আমি তো শক্ খাওয়ামাত্র টের পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার মামার ছবিতে কোন্ প্রেতাত্মা ভর করেছেন?'

নগেন উদভ্রান্তের মতো বলল, 'রুপার ফ্রেমটা দাদামশায়ের ছবিতে ছিল, চুরি যাবার ভয়ে মামা অনেকদিন আগে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন। মামার শ্রাদ্ধের দিন মামিমা ফ্রেমটা বার করে মামার ছবিটা বাঁধিয়েছিলেন। আলো দুটো লাগিয়েছে আমার মামাতো ভাই পরেশ। হ্যাঁ। সে এ-বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে পয়সা দেব কেন?'

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে। কিন্তু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাপের ছবিতে ভূত এনে ছেড়েছে। এ-খবরটা যদি আগে দিতে আমায়—।'

নগেন সংশয়ভরে বলল, 'কিন্তু ডাক্তার-কাকা—'

পরাশর ডাক্তার রাগ করে বললেন, 'কিন্তু কী? এখনো বুঝতে পারছ না? দিনের বেলা মেইন-সুইচ অফ করা থাকে, তাই ছবি ছুঁলে কিছু হয় না,—ছবি মানে ছবির রুপার ফ্রেমটা। রুপার ফ্রেমটার নিচে কাটফাট কিছু আছে, দেয়ালের সঙ্গে যোগ নেই, নইলে তোমাদের ইলেকট্রিকের বিল এমন হুহু করে বেড়ে যেত যে, আর কোম্পানির লোককে এসে 'লিকেজ' খুঁজতে হত। তুমিও মামার ভূতের আসল পরিচয়টা জানতে পারতে। সন্ধ্যার পর বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে, আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে যাতায়াত করতে বেশি ভালোবাসে কিনা, তাই সে-সময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না। এ ঘরের আলোটা জ্বাললেও তাই হয়। মাঝরাত্রে বাড়ির সমস্ত আলো নিভে যায়, তখন ছবিটা ছুঁলে আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মতো বোকা হাবার শরীরটা দিয়েই—'

পরাশর ডাক্তার চুপ করে গেলেন। তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, সুযোগ পেলে তাঁর শরীরটা পথ হিসাবে ব্যবহার করতেও বিদ্যুৎ দ্বিধা করে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চেতলার কাছে

লীলা মজুমদার

চেতলা, কালীঘাট, আদিগঙ্গা ইত্যাদি যতই পবিত্র স্থান হোক না কেন, ও-সব জায়গা মোটেই ভালো না। আর লোকের মুখে মুখে কী সব অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায়, তার লেখাজোখা নেই, তাছাড়া মশা-মাছি তো আছেই। চিলতে চিলতে সব গালি, তাতে মান্ধাতার আমলে তৈরি ঝুরঝুরে সব বাড়ি। তায় আবার সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির উঠোন দেখা যায়। একফালি উঠোনের মধ্যে এই বড় বড় সব গাছ,—তালগাছ, আমগাছ, বটগাছ—তাদের ডালপালা বেয়ে, ঝুরি ধরে ঝুলে, যে-কোনো বাড়ি থেকে যে-কোনো বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। বিপদ বুঝলে একটা হাঁক দিলেই হল। সবাই সাতপুরুষ ধরে সবার চেনা। পুরনো সব ঝগড়াও আছে, তার কারণ নিজেরাই ভুলে গেছে, তবু এখনো কথাবার্তা বন্ধ। মুখ দেখা আর কী করে বন্ধ করে, নড়বড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির বান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়, কার বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই চোর ছ্যাঁচড় খুনে জানতে পারবে। একটা টিকটিকি লুকোবার কোথাও জায়গা নেই, দুষ্কৃতকারীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কার ঘরে চুরি করার মতো কী আছে এবং কোথায় আছে তাও সবাই জানে। নেইও অবিশ্যি কারো কিছু। সেদিক দিয়ে জায়গাটাকে চোরেদের গোবি মরুভূমিও বলা যায়।

আমার বন্ধু বটুর বড় কাকা ওখানকার থানার মেজ দারোগা। তাছাড়া ওদের সাতপুরুষের বাড়িও ওখানে। নাকি বাড়ি হবার সময় ক্লাইব জন্মায় নি। বটু জায়গাটার নাম দিয়েছে মিসার হতাশা। শুনে বড় কাকা খুবই মুষড়ে পড়েছেন, দুষ্কৃতকারীরাই যদি একটু সুযোগ না পেল, তাহলে ওঁর হেড আপিসে উন্নতি হয় কী করে? অবিশ্যি ও-সব সাধারণ জিনিসের চাইতেও অন্য এবং আরো ভয়ের জিনিস আছে, ঐ তিনটে পাড়াসুদ্ধ সবাই সন্ধে হতেই যার ভয়ে জুজু। অধিকাংশই ওপরহাতে একগোছা শঙ্কটতারিণী

লীলা মজুমদার
১৯০৮--
জন্ম কলকাতায়। প্রধানত শিশুসাহিত্যের লেখক। শিশুসাহিত্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত। বিখ্যাত রবীন্দ্র পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন। *পদিপীসির বর্মী বাক্স, জোনাকি, আর কোনো খানে, এক বছরের গল্প*, তাঁর উল্লেখযোগ্য বই।

মাদুলি বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষা করেন। কারণ পুলিশে আর কীই-বা করতে পারে।

বটুদের উঠোনের আম পাকলে বটু আমাকে তিনদিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছিল। ঐ তিনদিনে আমি যতগুলো সত্যিকার ভূতের গল্প শুনলাম, সারাজীবন ধরে অত শুনি নি। সবাই সবার পাশের বাড়িতে অশরীরীদের দেখে।

কী বড় বড় সবুজ রঙের চিংড়িমাছ নিয়ে একটা লোক বিক্রি করতে এল। চিলেকোঠায় পুজো করতে বসে তাকে দেখেই বটুর ছোট ঠাকুমা চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'না বাছা, ও মাছ কেউ খাবে না। তুমি অন্য জায়গায় দেখ।'

বটু তো চটে কাঁই, কী ভালো ভালো চিংড়িমাছ!

ছোট ঠাকুমা নেমে এসে বললেন, 'ব্যস, মাছ দেখেছিস তো অমনি হয়ে গেল! আরে ওকি সত্যিকার মাছ? অতবড় চিংড়ি কখনো চার টাকায় দেয় কেউ? আবার বলছে দাম পরে নেবে।'

বটু বললে, 'আহা, বলল যে বিক্রি না হলে পচে যাবে....'

কাষ্ঠ হেসে ছোট ঠাকুমা বললেন, 'তুইও যেমন! তাছাড়া ওগুলো মাছও নয়, ঐ জেলের পো-ও মানুষ নয়, সব ইয়ে...' এই বলে ছোট ঠাকুমা জল খেতে বসলেন।

বটুও বলল, 'তা সত্যিও হতে পারে, মুখটা কেমন মিচকে মতো দেখলি না?'

আমি বললাম, 'যাহ্! ভূতের হাঁটু উল্টোদিকে থাকে, আর ওদের ছায়া পড়ে না।'

ছোট ঠাকুমা শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, 'ইদিকে এখনো রোদ আসে নি বাবা, ছায়া দেখবে কী করে? সে যাই হোক, আদিগঙ্গার বটগাছের তলায় যেন কখনো যাস নি। জায়গাটা ভালো নয়।'

গিজগিজে সব বাড়ি, বটগাছতলায় যেতে হলে সারকাস করতে হয়। অথচ সেখানে নাকি কারা কাপড় কাচে, ঝগড়া করে, মাছ ধরে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, সামনের দোতলার লটঘটে বারান্দায় দুজনে গল্প করছি। ছপ করে কী একটা পায়ের কাছে পড়ল। আর সে কী সুগন্ধ ভুরভুর করতে লাগল! তুলে দেখি কলাপাতায় মোড়া বড় বড় চিংড়িমাছ ভাজা। নিচের দিকে চেয়ে দেখি, সেই মিচকে লোকটা মিটমিট করে হাসছে। মোটা মোটা কান, নাকে মস্ত আঁচিল। একতলায় বৈঠকখানা থেকে বটুর পিসেমশাই ডেকে বললেন, 'কে? কে ওখানে?' সঙ্গে সঙ্গে কেউ কোথাও নেই। খেয়ে ফেললাম দুজনে মিলে সবকটা চিংড়িমাছ। যদি ওগুলো চিংড়িমাছ নাও হয়, তবু খেতে বেজায় ভালো।

ভিতর দিকের উঠোনে আমগাছের গায়ে লাগা বুড়ো তালগাছ। ছোট ঠকুমা শাদা পাথরের রেকাবি করে খোয়া ক্ষীর, চিঁড়ের মোয়া আর বড় বড় মনাক্কা নিয়ে, তালগাছের কোটরে রেখে ভক্তিভরে গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। ছোট ঠাকুমা চলে যেতেই বটু বলল, 'ব্রহ্মদত্যিকে তোয়াজ করা হচ্ছে। তালগাছে সে বাস করে।'

আর কী বলতে যাচ্ছিল বটু, ছোট ঠাকুমা পিছন থেকে বললেন, 'অমন অচ্ছেদ্দা করিস নে বাছা। উনি আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই। চটিয়ে দিলে সব্বোনাশ করবেন। খুশি রাখলে আমাদের জন্য না করতে পারেন এমন জিনিস নেই। ঐ বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে বছরে বছরে পাস করে যাচ্ছিস, সেটা কী করে সম্ভব সে-কথা কখনো ভেবেছিস? হুঁঃ!' এই বলে ছোট ঠাকুমা গীতা পড়তে ঘরে গেলেন। যাবার সময় আরো বলে গেলেন, 'তোরা বিশ্বাস না করতে পারিস, কিন্তু রোজ উনি এই জিনিস গ্রহণ করেন, আর তার বদলে একটি পয়সা আশীর্বাদী—'

BanglaBook.org

আর বলা হল না, কারণ সেই সময় বড় কাকা বাড়ি এলেন।

বড় কাকা খুব চটে ছিলেন। চা আর চিঁড়ের মোয়া খেতে খেতে বললেন, 'এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। বাজারের লোকদের নালিশের জ্বালায় আর টেঁকা যাচ্ছে না। গোলাবাড়িতে রাতে তদন্তে যেতে হবে।'

তাই শুনে বড়কাকি এমনি চমকে গেলেন যে, হাতের দুধের হাতা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোল গোল করে ফ্যাকাশে মুখে বললেন, 'কিন্তু –কিন্তু—'

বড় কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, 'কিন্তু কিন্তু নয়। এর ওপর আমার প্রমোশন নির্ভর করছে। কোনো ভয় নেই, ছ-টা যণ্ডা লোক সঙ্গে থাকবে। হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

বটার কাছে শুনলাম যে, বাড়িটাতে একশ বছর কেউ থাকে না। বড়ই দুর্নাম। ওটা নাকি চোরাচালানকারীদের গুহ্য আড়ত। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, বুড়িগঙ্গায় তার মুখ। অনেকে দেখেছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোনাদানা বেআইনি জিনিস বস্তা বস্তা পাচার করা খুব শক্ত নয়। বাজারে নাকি ওদের চর ঘুরে বেড়ায়, কখনো জেলে সেজে, কখনো পুরুতঠাকুর সেজে। এটা-ওটা কিনতে চায়, চা খেতে চায়, অচল পুরনো পয়সা দিয়ে দাম দিতে চায়। তা লোকে শুনবে কেন? দিয়েছে নালিশ করে। বড় কাকা বলেছিলেন, 'লোকটাকে ধরা যায় না। ফুস-ফাস করে এখান দিয়ে ওখান গলে পালায়। কোনো দোকানদারের সঙ্গে ষড়ও থাকতে পারে। শুনেছি চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়, কী রকম মিচকে মতো, মোটা মোটা কান, নাকের ডগায় আঁচিল!'

শুনে আঁতকে উঠেছিলাম, বটা কনুইয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছিল। আটটা বাজতেই মহাঘটা করে আটজন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বড় কাকা তদন্তে চলে গেলেন। ছোট ঠাকুমা তাঁর গলায় হলদে সুতো দিয়ে একটা বেলপাতা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'ব্যস, আর ভয় নেই। সেখানে গিয়ে কেউ কিছু দিলে খাসনে যেন। দুগ্‌গা দুগ্‌গা!' বড় কাকা চলে গেলে বললেন, 'কামান দেগে হাওয়া ধরা। হুঁঃ।'

আমরা ছাদে গিয়ে বুড়িগঙ্গায় জোয়ার আসা দেখতে লাগলাম। বটু বলল, 'ঐ গোলাবাড়িটা আমার ঠাকুরদার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোটভাই পেয়েছিল। ব্যাটা মহা লক্ষ্মীছাড়া ছিল; লেখাপড়া শেখে নি, কাজকর্ম করত না, খালি মাছ ধরার বাই ছিল আর চিনে ব্যবসাদারদের কাছ থেকে চায়ের নেশা ধরেছিল। দুদিনে বাড়ির সব ঝাড়বাতি, আসবাবপত্র, রুপোর বাসন বেচেবুচে সাফ করে দিল। ওর বুড়িমা নাকি খুচরা পয়সাকড়ি এমনি লুকিয়ে রেখে চোখ বুজেছিলেন যে ব্যাটা সে-সব খুঁজেই পায় নি। এখনো নাকি খুঁজে বেড়ায়। তাই ও-বাড়িতে কেউ রাত কাটায় না। সেইখানে গেছে বড় কাকা তদন্ত করতে। খুচরো টাকাকড়ির বাক্সটা পেলে মন্দ হয় না। আমরাই তো ওর ওয়ারিশ। সে ব্যাটা তো বিয়েই করে নি। নাকি বিশ্রী দেখতে ছিল, শুঁটকো, কালো, বড় বড় কান, চাকর চাকর চেহারা। গেঞ্জি গায়ে ঘাটে বসে অষ্টপ্রহর বুড়িগঙ্গায় মাছ ধরত—কে? কে ওখানে?'

খচমচ করে তালগাছ থেকে আমগাছ থেকে নড়বড়ে বারান্দা কাঁপিয়ে মিচকে লোকটা হাসি- হাসি মুখ করে উঠে এসে নাকের ফুটো ফুলিয়ে ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস নিয়ে বলল, 'চা-চা গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে!'

সত্যিই ছিল চা। দোকানের কেতলিতে একটু চা আর একটা মাটির ভাঁড়, বটু লুকিয়ে এনেছিল সামনের দোকান থেকে। নিচে নামতেও হয় নি, ওদের ছোকরা তেঁতুলগাছে চড়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, রোজকার মতো।

চা পেয়ে লোকটা আহ্লাদে আটখানা, মিচকে মুখে যেন সাত ভাঁজ হয়ে গেল। বললাম,

BanglaBook.org

'পেঁয়াজি খাবে নাকি?'

জিভ কেটে বলল, 'অ্যাঁ ছি ছি ! ও নাম করবেন না। আমার বরাদ্দ রোজকার মতো খেয়েই এসেছি, চিঁড়ের মোয়া, খোয়া ক্ষীর, মেওয়া—'

বটা আর আমি এ-ওর দিকে তাকালাম, কিছু বললাম না। খাক না বেচারি।

মিচকে লোকটি বলল, 'বড়কর্তা আমাদের ওখানে এমন হাঁকডাক লাগিয়েছেন যে টিকতে না পেরে ওনার এখানে গা-ঢাকা দিতে এসেছি। দেখ দাদা, তালগাছের মুড়োয় তোমাদের জন্য একটা দ্রব্য রেখে গেলাম। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। সেখানে মা অমৃতি বানায়।'

বটু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কেন চলে যাবে? এখানে বুঝি খেতে পাও না?'

ফিক করে হেসে মিচকে লোকটা বলল, 'দু-বেলা নৈবিদ্যি পাই, আবার কষ্ট কিসের? ঐ এল বলে ! আমি উঠি !' বলেই হাওয়া।

নিচে বড় কাকাদের রাগ-রাগ গলার হাঁক-ডাক শোনা গেল। নিশ্চয় কিছু দুষ্কৃতকারীটারি ধরতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে আদ্যিকালের তালগাছটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। পোকা ধরা, পুরনো গুঁড়ি ভেঙেচুরে একাকার। তার মধ্যে দেখা গেল বেশ বড় একটা কাঠের হাতবাক্স, পুরনো টাকাকড়িতে তার অর্ধেক ভর্তি। আর চাঁচাপোঁছা নৈবেদ্যের রেকাবিটা তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বড় কাকার রাগ ঠাণ্ডা।

পরদিন বড় কাকা বললেন, 'আশ্চর্যের বিষয়, সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খোপে ঐ বাক্স রাখার স্পষ্ট দাগ দেখলাম। সেই বুড়ি ঠাকুরন তাহলে বাউণ্ডুলে ছেলের হাত থেকে ওটাকে বাঁচাবার জন্য এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এটাও তো তাঁদেরই বাড়ি।'

ছোট ঠাকুমা শূন্যে নমস্কার করে বললেন, 'কত বাঁচিয়েছিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে। ও বটা, নিজে পড়িস দাদু, সে তো গেল।' ফোঁত ফোঁত করে একটু কেঁদেও নিলেন। বড় কাকা তো অবাক !

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

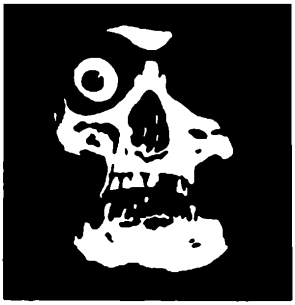

আয়না

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মাস তিনেক আগে সন্ধ্যার পর বউবাজার স্ট্রিটের একজন বন্ধুর ফার্নিচারের দোকানে বসে গল্প করছিলাম। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দোকানটির বেশির ভাগ জায়গা সরোজ গুদামের কাজে লাগিয়েছে। নানা প্যাটার্নের খাট, চেয়ার, আলমারিতে সেই গুদাম ভরতি। দোরের সামনে যে অল্প একটু জায়গা রয়েছে, সেখানে ছোট একটি টেবিল। সরোজের কাউন্টার। আমরা সেই টেবিলের ধারে দুখানা চেয়ারে পাশাপাশি বসে সুখ-দুঃখের কথা বলছিলাম।

বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। ফোঁটা কখনো ছোট, কখনো বড়। বৃষ্টিটা একটু জোরে শুরু হতেই সরোজ দোর বন্ধ করে দিল। বলল, 'কাণ্ড দেখ! এক ঝাপটায় সব ভিজিয়ে ফেলল। কার্তিকের শেষে এমন বদরসিক বৃষ্টি আর দেখেছ!'

বন্ধুর সেই বিরক্তিটুকু আমি উপভোগ করলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এবার যাই।'

কিন্তু সরোজ জোর করে আমার হাত ধরে টেনে বসাল, একটু ধমকের সুরে বলল, 'এসেই তো যাই যাই করছ! ন-মাসে ছ-মাসে একবার দেখা হয়, যদি দু-দণ্ড বসতেই না পার, তবে আস কেন?' তারপর হেসে নরম গলায় বলল, 'বসো আর একটু। মন-মেজাজ খুব খারাপ। যা ওয়েদার চলছে, তাতে কবে যে ফের খদ্দেরের মুখ দেখব, কে জানে!'

বললাম, 'তোমার গলায় সত্যিই বিরহের সুর ফুটছে।'

আমার কথা শেষ না হতেই দরজায় টোকা পড়ল। আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'দেখ, তোমার খদ্দের বোধ হয় এবার একজন এলেন।'

সরোজ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন দোর খোলাই আছে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দরজা ঠেলে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। আমি একটু চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকের বয়স বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। লম্বায় প্রায় ছ-ফুট। বেশ সুপুরুষ। গৌরবর্ণ চেহারা। নাক-চোখ টানা-টানা। শুধু সুপুরুষই নয়, ভদ্রলোক বেশ শৌখিন। গায়ে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
১৯১৬--১৯৭৫
ফরিদপুরের সদরঙ্গি গ্রামে জন্ম। স্থানীয় স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই এ এবং কলাকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। সাংবাদিক হিসাবে দৈনিক সত্যযুগ, দৈনিক কৃষক এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। *রস, সন্ধান, চোর, একটি প্রেমের গল্প*, পালঙ্ক তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। *চেনা মহল, মহানগর, দীপপুঞ্জ, দেহমন* উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় ও মূল্যবোধের সংকট চিত্রণে তার কথাসাহিত্য উজ্জ্বল। বিশেষ করে ছোটগল্পের রূপকার হিসাবেই তিনি খ্যাতিমান।

গরদের পাঞ্জাবি। পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি। এইটুকু পথ আসতেই বেশ একটু ভিজে গেছেন।

এমন একজন সুদর্শন পুরুষকে দেখেও আমার বন্ধু সরোজ খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। বরং তাকে যেন একটু অপ্রসন্নই দেখাল।

সরোজ গম্ভীর স্বরে বলল, 'বসো নিরঞ্জন। এই বৃষ্টি-বাদলের দিনেও বেরিয়েছ?'

এতক্ষণ ভদ্রলোককে বেশ স্বাভাবিক সপ্রতিভ অবস্থায় দেখেছিলাম। কিন্তু সরোজের ওই সাধারণ একটি প্রশ্নে তিনি যেন অন্যরকম হয়ে গেলেন। যেন কী একটা গোপন অপরাধ তাঁর ধরা পড়ে গেছে। চোখেমুখে ঠিক তেমনি একধরনের নার্ভাস-ভাব ফুটে উঠল।

তিনি যেন একটা অভিযোগের প্রতিবাদ করছেন তেমনি ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, বেরিয়েছি। কী এমন ঝড়-ঝাপটা হচ্ছে যে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না! আমার এদিকে কাজ ছিল, তাই বেরিয়েছি।'

সরোজ একটু হাসতে চেষ্টা করে বললে, 'বেশ করেছ। দরকার থাকলে বেরোবে বৈকি! আমরা কি বেরোই না! বসো, ভালো হয়ে বসো।'

কিন্তু লক্ষ করলাম, ভদ্রলোকের মধ্যে যেন কিসের একটা চাঞ্চল্য আরম্ভ হয়েছে। তিনি তাকে জোর করে চাপতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতে পেরে উঠছেন না। মনে হল, তিনি যেন একবার উঠে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু না-পেরে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। যেন জোর করে তাঁকে কেউ উঠতে দিচ্ছে না, তাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখছে। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে কেমন যেন একটা অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হল।

তারপর হঠাৎ তিনি বললেন, 'সেই আয়নাখানা কোথায়? বিক্রি হয়ে গেছে?'

সরোজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি জানতুম, তুমি এ-কথাটি ঠিক জিজ্ঞেস করবে। তুমি এর জন্যেই এসেছ।'

ভদ্রলোক ফের প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'এর জন্যেই এসেছি? আশ্চর্য তোমাদের ধারণা। আমার একটা জিনিস তোমাকে বিক্রি করতে দিয়েছি, সেটা তুমি বিক্রি করলে কি করলে না জিজ্ঞেস করলেই তা দোষের হয়ে গেল?'

সরোজ শান্তভাবে বলতে চেষ্টা করল, 'আমি কি বলছি দোষের! তুমি এত চটছ কেন? সত্যিই তো, তোমার জিনিসের কথা তুমি একবার কেন, হাজার বার জিজ্ঞেস করতে পার, তাতে কিছুই দোষের নেই। ওই তো তোমাদের সেই ড্রেসিং টেবিলটা রয়েছে। এখনো বিক্রি করতে পারি নি। ভেবো না, দরদাম হচ্ছে, একদিন বিক্রি হয়ে যাবে।'

'আমার ভাববার কী আছে।'

বলে ভদ্রলোক চেয়ারে চেপে বসে রইলেন। তারপর যেন নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়লেন। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালেন ড্রেসিং টেবিলটার সামনে। এতগুলি ফার্নিচারের মধ্যে আমি সেই টেবিলটাকে এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি। তিনি গিয়ে দাঁড়াতে এবার ড্রেসিং টেবিলটা আমার চোখে পড়ল। দেখলাম, টেবিল-আয়নাখানা সত্যিই বেশ সুন্দর। আগেকার আমলের বার্মাটিকে তৈরি। কালো পালিশ। আয়নাখানা বেশ পুরু আর স্বচ্ছ। আমি ফার্নিচার ডিলার নই। এসব জিনিস তেমন ব্যবহারও করিনে। তবু বুঝতে পারলাম, জিনিসটা বেশ দামি। আজকাল এ জিনিস খুব সুলভ নয়।

কিন্তু আয়নার মধ্যে ভদ্রলোকের মুখের যে-ছায়া পড়েছে, তার দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়ায় আমি চমকে উঠলাম। বলতে লজ্জা নেই, আঁৎকে উঠলাম। এমন বিবর্ণ ভীত মুখ আমি আর দেখি নি। ভদ্রলোক আয়নার মধ্যে কী দেখছিলেন জানিনে, কিন্তু তাঁকে দেখে আমার মনে হল যেন তিনি আর আমাদের জগতের কেউ নন, কোনো এক অলৌকিক লোকের অধিবাসী।

BanglaBook.org

ভয় জিনিসটা বোধ হয় সংক্রামক। নইলে তাঁর ভয় আমাকে এমন ভয়ার্ত করে তুলবে কেন?

আমি সরোজকে ওঁর কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, দেখি সে ততক্ষণে উঠে গিয়ে ভদ্রলোকের একটা কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরেছে। আমি তার গলা শুনতে পেলাম, 'নিরঞ্জন, নিরঞ্জন!'

ভদ্রলোক ফিরে এবার তাকালেন, অস্ফুট স্বরে বললেন, 'কী বলছ?'

সরোজ ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'বলছি কি, তুমি এবার বাড়ি যাও। তোমাকে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বেশ রাত হয়ে গেছে। মাসিমা তোমার জন্যে ভাবছেন, বরানগর তো এখানে নয়। যেতেও তো সময় লাগবে। যাও এবার।'

ভদ্রলোক শান্ত বাধ্য ছোট ছেলের মতো বললেন, 'হ্যাঁ, যাই, যাই। সত্যি, রাত হয়ে গেছে। আমি খেয়াল করি নি।'

তিনি এবার দরজার দিকে এগোতে লাগলেন। কিন্তু দু-পা যেতে-না-যেতে আবার ফিরে এসে আমার বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'সরোজ!'

সরোজ কোমল স্বরে বলল, 'বল।'

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বললেন, 'তুমি বরং আয়নাটা আমাকে ফেরৎই দাও। আমি ওটাকে বাড়ি নিয়েই রাখি। সেই আসতে তো আমাকে হবেই—'

তিনি একটু হাসলেন। সে হাসি যেমন করুণ, তেমনি বিষণ্ন।

সরোজ বলল, 'কী যা-তা বলছ? এবার বাড়ি যাও তো তুমি! মাসিমা তোমার জন্য ভাবছেন। শিগগির যাও।'

বলতে বলতে সরোজ তাঁকে একরকম জোর করেই ঘর থেকে বের করে দিল।

আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললাম, 'ব্যাপারটা কী সরোজ?'

জন-দুই পালিশওলা ভিতরের দিকে বসে কী কাজ করছিল, সরোজ আমার কথার জবাব না দিয়ে তাদের ধমকে উঠল, 'আচ্ছা, ফটিক, মুকুন্দ, তোমাদের কতদিন বলি নি, টেবিলটা সামনে না-রেখে ভিতরের দিকে কোথাও লুকিয়ে রেখো? আমার কথা গ্রাহ্য হয় না, না?'

পালিশওলাদের একজন বলল, 'আজ্ঞে ছোটকর্তা, ভেতরেই তো ছিল। একজন খদ্দের নেবেন বলে গেলেন, তাই বাইরে এনে পালিশটালিশ করে রেখেছি। কই, তিনি তো আর এলেন না!'

দ্বিতীয় পালিশওলাটি বলল, 'খোঁজ নিয়ে দেখুন তাঁর আসবার অবস্থা আছে কিনা। নাকি বেনেপুকুরের মধুবাবুর মতো তাঁরও এতক্ষণে হয়ে গেছে।'

সরোজ ফের ধমক দিয়ে উঠল, 'কী যা-তা বাজে কথা সব বলছ! নিজেদের কাজ করো তো!'

প্রথমজন বলল, 'আমাদের ধমকান আর যাই করেন ছোটকর্তা, আয়নাটাকে আপনি ঘর থেকে বিদায় করুন। কাউকে বিনি পয়সায় বিলিয়েও যদি দিতে হয়, তাও দিন আপনি। নইলে কবে যে আবার কী ঘটবে—'

সরোজ বাধা দিয়ে বলল, 'আহ্ ফের ওইসব কথা! তোমাদের মত Superstitions লোক নিয়ে কাজকর্ম করাই মুশকিল।'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'সরোজ, ব্যাপারটা কী?'

সরোজ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের। নিরঞ্জনের যে এমন পরিণতি হবে, তা কোনোদিন ভাবতে পারি নি। সত্যি কথা বলতে কি, ওর মতো sane আর sober ছেলে আমাদের দলের মধ্যে আর দুটি ছিল না।'

BanglaBook.org

বললাম, 'হঠাৎ কেন এমন হল?'

সরোজ বলল, 'ঠিক হঠাৎ একদিনে হয় নি। আর একটা কারণেই যে অমন হয়েছে তাও আমার মনে হয় না। তবু শেষের ঘটনা যে সবচেয়ে গুরুতর, তা মানতেই হয়। কিন্তু তোমাকে গোড়া থেকে না বললে কিছু বুঝতে পারবে না।'

বললাম, 'হ্যাঁ, গোড়া থেকেই বল।'

সরোজ তখন কাহিনীটা বলল :

'নিরঞ্জন হালদার সম্পর্কে আমার মাসতুতো ভাই। কিন্তু আত্মীয়তার চেয়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই আমার বড় ছিল। আমরা এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি। কলেজেও একসঙ্গে ঢুকেছিলাম। আমি বছর-দুই যেতে-না-যেতেই বেরিয়ে আসি। আর নিরঞ্জন ডিস্টিংশনে বি.এ. পাশ করে। মেসোমশাই ছিলেন নামকরা অ্যাটর্নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল নিরঞ্জন ল' পড়ে। কলেজে ভর্তিও হয়েছিল। কিন্তু মাস ছয়েক বাদেই ছেড়ে দিল। বলল, 'দূর, ভালো লাগল না !' এই নিয়ে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে ওর সামান্য ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল, কিন্তু সে এমন বেশি কথা নয়। তিনি ছেলেকে খুবই ভালোবাসতেন। একটা কড়া কথা বলে তিনি তিনবার গিয়ে পিঠে হাত বুলোতেন। কিন্তু এত আদর-যত্ন সত্ত্বেও নিরঞ্জন বিগড়ে গেল। বিরাজ গাঙ্গুলী বলে নিরুর এক পিসেমশাই ছিলেন। ও তাঁর খপ্পরে পড়ল। নিরুর পিসিমা অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। বিরাজবাবু আর বিয়ে করেননি। কিন্তু আর সবই করেছেন। জীবনটাকে উড়িয়ে-পুড়িয়ে না-দেখলে তার রসটা পুরোপুরিভাবে পাওয়া যায় না, এই ছিল তাঁর বাণী। নিরু তাঁর মন্ত্রশিষ্য হল। তাঁর সঙ্গে শেয়ার মার্কেটে যায়, রেসের মাঠে যায়, ফিরে এসে বসে পড়ে। খরচটা পিসেমশাই জোগান। কিছুদিন মেসোমশাই রাগ করে, অভিমান করে রইলেন। তারপর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে জোর করে নিরঞ্জনের বিয়ে দিলেন। জোরটা অবশ্য ধমকের জোর নয়, চোখের জলের জোর। তাছাড়া যে মেয়েকে তিনি পছন্দ করেছিলেন, সে অসাধারণ সুন্দরী। তাকে দেখে নিরঞ্জনেরও মন টলল।

বিয়ের পর নিরঞ্জনের বাইরের উদ্দামতা কমে এল। আমরা বললুম, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।' এদিকে নিরঞ্জনের সেই মন্ত্রগুরু পিসেমশাই মারা গেলেন। খবরটায় আমার মেসোমশাই খুব নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু তাঁর শান্তি বেশিদিন টিকল না। নিরঞ্জন আবার বাড়াবাড়ি শুরু করল। এবারকার বাড়াবাড়ির জন্যে শুনলুম মীরা বউদিই দায়ী। কোনো এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় নিরঞ্জন নাকি সে রাত্রে মাত্র দুটি পেগ খেয়ে ফিরেছিল। তার জন্যে মীরা বৌদি স্বামীকে যা-নয়-তাই বলে গাল দিয়েছেন। রাগ করে অন্য ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। নিরঞ্জন অনেক সাধাসাধি করেও বৌয়ের মান ভাঙাতে না-পেরে শেষ পর্যন্ত খেপে গেছে। মাসিমা-মেসোমশাই দুজনই এ নিয়ে মীরা বৌদিকে সেদিন বকাবকি করেছিলেন।

বছর পাঁচেক বাদে মেসোমশাইও চোখ বুজলেন। কিন্তু নিরঞ্জনের তখনও ফেরবার নাম নেই। ওই সেই পিসে বিরাজ গাঙ্গুলী যেন ওর মধ্যে নতুন জন্ম নিয়েছে।

এই সময় একদিন ছেলের অন্নপ্রাশনে ওদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। নিরঞ্জন আসে নি। মাসিমা আর মীরা বৌদি এসেছিলেন। শাশুড়ির অসাক্ষাতে মীরা বৌদি সেদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, সরোজবাবু, বাবা আমাকে শুধু বাড়িঘর দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন, কার হাতে দিলেন দেখেন নি।

আমার স্ত্রী মল্লিকা বলেছিল, ও-কথা কেন বলছেন মীরাদি। রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি কোনোটাতেই তো তিনি খাটো নন। তাঁর তো সবই আছে।

মীরা বৌদি বলেছিলেন, মানুষ তো কেবল বাইরেটাই দেখে, ভিতরে যে থাকে সেই বোঝে সব থাকবার কী জ্বালা।

তাঁর সেই কথাগুলি আজও যেন আমার কানে লেগে রয়েছে।

BanglaBook.org

আরো বছর তিনেকের মধ্যে নিরঞ্জন পৈতৃক বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব খোয়াল। দামি দামি সব ফার্নিচার ভারি সস্তায় বিক্রি করে দিল। আমাকে একবার জানালও না। আমি জানতে পারলে ওকে অমন করে ঠকাতাম না। মীরা বৌদি রাগ করে গিয়ে বাপের বাড়ি ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, বিয়ের সময় বাবার কাছ থেকে যৌতুক-পাওয়া তাঁর খাট আলমারি পর্যন্ত নিরঞ্জন বিক্রি করে দিয়েছে। বাকি আছে ড্রেসিংটেবিলটা। তারও দরদাম হচ্ছে। মীরা বৌদি সেই আয়নার সামনে টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে রইলেন। বললেন, আমাকে না-বেচে তুমি আমার বাবার দেওয়া এই টেবিল বিক্রি করতে পারবে না। তাঁর দেওয়া একটা জিনিসও আমি রাখতে পারব না?

তারপর ওরা জোড়াবাগান ছেড়ে বরানগরের একটা ছোট ভাড়াটে বাড়িতে উঠে যায়। সেখানেও জোর দাম্পত্য-কলহ চলে। তারপর হঠাৎ নিরঞ্জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। ও সেবার মাস ছয়েক ভুগেছিল। মাঝে মাঝে আমি যেতাম। আর দেখতাম, মীরা বৌদির সেবা-শুশ্রূষা। তখন তাঁর গয়না বিক্রি করে চিকিৎসা চলত, সংসার চলত। এই গয়নার বাক্স স্বামীর হাতে পড়বে বলে নিজের দাদার কাছে তিনি লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন। বিপদের দিনে সেই বাক্স আবার তিনি ফেরৎ নিয়ে এলেন। নিরঞ্জন একদিন স্ত্রীকে বলেছিল, আয়নাটা বিক্রি করতে দিলে না, অথচ গয়নাগুলি দিব্যি বিক্রি করছ। আয়নাটা কি গয়নাগুলির চেয়ে দামি?

মীরা একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, তা নয়। একটা আয়না বিক্রি করলে, কতই বা হত!

কিন্তু নিরঞ্জন আর মাসিমার কাছে শুনেছি, আয়নার ওপর মীরা বৌদির একটু বেশিরকম দুর্বলতা ছিল। গয়নাগাঁটি তিনি বেশি পরতেন না। কিন্তু সময় পেলেই চেয়ে থাকতেন। কী দেখতেন কী ভাবতেন তিনিই জানেন। যে রূপে স্বামীকে মুগ্ধ করতে পারেন নি, সেই রূপকে তিনি কী চোখে দেখতেন তা জানিনে। নাকি নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বলতেন, আরো শক্ত হও, ধৈর্য ধর, কিছুতেই ভেঙে পড়ো না।

নিরঞ্জন সুস্থ হয়ে উঠল। ডাক্তার শাসন করে বলেছিলেন, ফের মদ ধরলে আর বাঁচবেন না। অনেক কষ্টে লিভারটিকে রক্ষা করেছি। আর অত্যাচার করলে সইবে না।

তবু মদের জন্য নিরঞ্জনের মন চঞ্চল হয়ে উঠত। কিন্তু উঠলে হবে কি, আর সেই অর্থও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। মৃদু মোলায়েম নেশা হিসাবে মীরা বৌদি নাকি তাকে এসময় ভাঙের শরবত করে দিতেন। নেশার সময়টাকে পার করে দেওয়ার জন্যে সেজেগুজে স্বামীর কাছে গল্প করতে বসতেন।

সুস্থ হওয়ার পর নিরঞ্জনের হঠাৎ সুমতি হল। এতকাল বাদে চাকরির খোঁজে বেরোল নিরঞ্জন। একটা ইনসিওরেন্স অফিসে ভালো চাকরিই পেল। চেহারা আছে, ডিগ্রি আছে, বলতে কইতে পারে, পাবে না কেন! খবর শুনে মীরা বৌদিকে কনগ্রাচুলেট করে এলাম। বললাম, আপনার ক্ষমতা আছে। আপনি ছাড়া ওকে আর কেউ ফেরাতে পারত না।

মীরা বৌদি স্মিত মুখে চুপ করে রইলেন।

বছরখানেক ভালোই কাটল। কিন্তু তারপর তাঁর সে সুখ বেশিদিন সইল না।

নিরঞ্জনকে নতুন নেশায় ধরল। মদ নয়, মদের চেয়েও মারাত্মক। রেখা চ্যাটার্জি নামে বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে নিরঞ্জনদের অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে। তাঁকে নিরঞ্জনের চোখে পড়ল। আমি সে মেয়েটিকে দেখেছি। দেখতে কালো, রোগা, ঢ্যাঙা চেহারা। তার মধ্যে নিরঞ্জন কী যে দেখেছে সেই জানে। আমরা, টাইপিস্ট আর তার নাম জড়িয়ে নানা কথা শুনতে লাগলাম। ছুটির পর নিরঞ্জন সরাসরি বাড়ি আসে না। রেখাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, সিনেমায় যায়, থিয়েটারে যায়। নানারকম শৌখিন জিনিস কিনে প্রেজেন্ট করে। মাইনের বেশির ভাগ টাকাই নাকি

BanglaBook.org

তার এইভাবে ব্যয় হয়ে যায়। আর এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনরাত ঝগড়া চলে। সত্যি বলতে কি, মেয়ের দিকে নিরঞ্জনের আগে ঝোঁক ছিল না। সে মদেই খুশি থাকত। মীরা বৌদি তখন নাকি বলতেন, তুমি বরং অন্য মেয়েকে ভালোবাস তা আমার সইবে, কিন্তু মদের গন্ধ আমি সইতে পারব না।—কিন্তু এখন তিনি টের পেলেন, মদের গন্ধের চেয়েও অন্য মেয়ের গন্ধ আরো কটু। এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি খুব চলতে লাগল। তারপর কথার মুখে নিরঞ্জন একদিন বলে বসল, আমার যা-খুশি তাই করব। আমি বিয়ে করব রেখাকে। আমি ছেলেমেয়ে চাই। তোমার দ্বারা তো আর তা হবে না।

প্রথম যৌবনে একটি ছেলে হওয়ার সময় হাসপাতালে মীরা বৌদির অপারেশন হয়েছিল। সেই থেকেই তাঁর সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।

স্বামীর মুখে ফের সেই পুরনো কথা শুনে মীরা বৌদি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর তিনি কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি।

নিরঞ্জন অফিস থেকে সেদিনও খুব রাত করেই ফিরে এসেছিল। এসে দেখে, শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক অনুনয় বিনয় রাগারাগির পরও দরজার পাট না-খুলতে পেরে, রাত্রের জন্যে নিরঞ্জনকে মার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়। পরদিন ভোরে মিস্ত্রি ডেকে ভেঙে ফেলে দরজা। দেখা যায় কড়িকাঠে ফাঁস লাগিয়ে মীরা বৌদি ঝুলছেন। তাঁর পায়ের ছায়া পড়েছে ড্রেসিংটেবিলের আয়নায়। এ দৃশ্য দেখে নিরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে যায়, মাসিমা চিৎকার করে উঠলেন। বাপ-মা মরা সুলতা নামে চোদ্দ-পনের বছরের একটি ভাইঝি থাকত তাঁর কাছে, সে মূর্ছা যায়।

তারপর যা-যা ঘটতে লাগল সবই গতানুগতিক। আমার স্ত্রী একদিন মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনে এল, সুলতা নাকি ও-বাড়িতে আর থাকতে চাইছে না। নিরঞ্জন অফিসে বেরিয়ে গেলে ঘরখানা সাধারণত বন্ধই থাকে। সেদিন বিকেলবেলায় সুলতা ঘর ঝাড় দেওয়ার জন্যে যেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে, কে যেন তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে থেকে সরে গেল। আর একদিন সন্ধ্যার একটু আগে মাসিমা ওই ঘরের পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় চিরুনিতে চুল আঁচড়াবার শব্দ শুনতে পেলেন।

এমন কিছু নতুন নয়। যে বাড়ির বউ আত্মহত্যা করে মরে, সে বাড়ির মেয়েরা কিছুদিন এ-ধরনের অনৈসর্গিক ব্যাপার দেখতে-শুনতে পায়। আমি আমার স্ত্রীর কথা হেসেই উড়িয়ে দিলাম। বললাম, কবে দোকান থেকে ফিরে এসে দেখব, মীরা বৌদি তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন।

আমার স্ত্রী রাগ করে বলল, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেলাম। সত্যি, মীরা বৌদিকে নিয়ে ঠাট্টা করা চলে না। কিন্তু এত যাঁর বুদ্ধি, এত যাঁর ধৈর্য, তিনি ঝোঁকের মাথায় ও-কাজ করতে গেলেন কেন? নিরঞ্জনকে বাধা দেওয়ার আর কি কোনো উপায় ছিল না?

দিনকয়েক বাদে নিরঞ্জন এল এই দোকানে। একথা-সেকথার পর হঠাৎ বলল, মীরা বৌদির ড্রেসিংটেবিলটা সে বিক্রি করে দিতে চায়। তার কথা শুনে আমি তো অবাক। এমন কাজ কেন করতে যাবে নিরঞ্জন? মীরা বৌদির একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক না ওদের বাড়িতে। আয়নাটা কত ভালোবাসতেন বৌদি!

নিরঞ্জন সেদিন আর কিছু না বলে উঠে গেল। দিনকয়েক বাদে মাসিমা আমাকে খবর পাঠালেন। তাঁর কাছে শুনলাম, নিরঞ্জন নাকি রাত্রে আলো জ্বেলে ঘুমোয়। অথচ এর আগে ঘরে একটু আলো থাকলে তার ঘুম হত না। এরপর তিনিও আমাকে টেবিলটা নিয়ে আসবার

BanglaBook.org

জন্যে অনুরোধ করলেন। বললেন, এখন তোর টাকা দিতে হবে না, বিক্রি হয়ে গেলে যদি কিছু দিতে হয় দিস, না দিলেও কিছু আমার লোকসান হবে না।

মাসিমা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে টেবিলটা নিয়ে আসার জন্যে আমাকে এমন বারবার করে বলতে লাগলেন যে পরদিনই আমি দোকানের একটা কুলিকে পাঠিয়ে দিলাম। নিরঞ্জন মুখে একটু আপত্তি করল, কেন আবার তুমি এত কষ্ট করতে গেলে। আয়নাটা যেখানে ছিল, সেখানেই নাহয় থাকত।

কিন্তু ওর ভাবভঙ্গি দেখে আমার মনে হল, আয়নাটা ওর বাড়ি থেকে নিয়ে আসায় নিরঞ্জন নিশ্চিন্ত হয়েছে, খুশি হয়েছে।

ড্রেসিংটেবিলটার যা ন্যায্য দাম, আমি তাই ওকে দিতে গেলাম। কিন্তু নিরঞ্জন কিছুতেই নিল না। বলল, ঘর থেকে কেন দেবে, বিক্রি হয়ে গেলে তারপর দিও।

দাম নিল না বটে, কিন্তু নিরঞ্জন রোজ একবার করে আয়নাটার খোঁজ নিতে আসতে লাগল। জিনিসটা বিক্রি হয়েছে কিনা, কেউ এসে দর করে গেছে কিনা, রোজ এক প্রশ্ন।

মাসিমা আর একদিন খবর দিলেন, বললেন, নিরুর এবার একটা বিয়ে-টিয়ে দে।

কথাটায় আমি একটু আঘাত পেলাম। এই সেদিন মীরা বৌদি মারা গেলেন, তাও সাধারণ মৃত্যু নয়, আর এরই মধ্যে মাসিমা ছেলের বিয়ের প্রস্তাব করছেন!

মাসিমা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, একা এক-ঘরে থাকতে বোধ হয় ভয় হয়। সারারাত ঘুমোয় না। আমি বলি, আমি এসে তোর কাছে থাকি, কিন্তু তাতে ও রাজি হয় না। বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কী গতি আছে বল্? ও নাকি তাকে ভালোবাসে। তুই তাকেই একটু বুঝিয়ে বল।

এরপর সত্যিই আমি সেই রেখা চ্যাটার্জির সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। খুব বেশি ভূমিকা না করে বললাম, আপনি বোধ হয় দুর্ঘটনার কথা সব শুনেছেন?

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

আমি বললাম, মাসিমার ইচ্ছা আপনারা তাড়াতাড়ি বিয়ে করুন।

রেখা বলল, তা হয় না।

কেন? আপনিও কি ভূতের ভয় করেন নাকি?

রেখা এবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল; বলল, না, ভূত নয়, ভূতে-পাওয়া মানুষকে আমার ভয় সবচেয়ে বেশি।

আমার বন্ধু তার কাহিনী শেষ করল।

আমি চুপ করে রইলাম। রেখা চ্যাটার্জির কথা যে কত সত্যি, তা আমি একটু আগেই টের পেয়েছি।

বৃষ্টির জোরটা একটু কমে এলে আমি বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আশ্চর্য, তারপর থেকে রোজই আমার ইচ্ছা করতে লাগল, আয়নাটার একবার খোঁজ নিয়ে আসি। কিন্তু ও-পথ আমি কিছুতেই আর মাড়ালাম না। শেষে আমিও কি নিরঞ্জনের মতো হব? তবু বার বার আমার কৌতূহল হতে লাগল, কী হল সেই আয়নাটার, কী হল নিরঞ্জনের।

আজকের সকালের কাগজ আমার সেই কৌতূহল মিটিয়েছে। খবর বেরিয়েছে দমদম স্টেশনে কাল সন্ধ্যায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছে একজন লোক। নিরঞ্জন হালদার বলে তাকে শনাক্ত করা হয়েছে। রেল-পুলিশ যথারীতি তদন্ত করেছে। কেসটি আত্মহত্যা বলেই তাদের সন্দেহ।

BanglaBook.org

ভূত মানে ভূত

না রা'য় ণ গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

আয়, একটা ভীষণ ভূতের গল্প বলি।'

'আমি ভূত মানি না।'

'তবে যা—তোর শুনে কাজ নেই।'

'না—না বল্। শুনি, কত বাজে গল্প বানাতে পারিস তুই।'

'আমি গল্প বানাই না। সদা সত্য কথা বলে থাকি। অবিশ্বাস হলে উঠে যা না, কে তোকে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে বলেছে?'

'না—মানে সত্যি কথা বললে আর অবিশ্বাস করব কেন? তুই বল্।'

'অইদিকে ভূত মানি না, ওদিকে ভূতের গল্প শুনলেই জাঁকিয়ে বসা? আছিস বেশ।'

'মানে শুনতে বেশ মজা লাগে কিনা, তাই—'

'মজা লাগে? এমন সত্যি ঘটনা বলব না যে শুনে তোর গায়ে কাঁটা দেবে।'

'নাকি? তবে বলে যা ভাই।'

'শোন—আমাদের গাঁয়ে একটা বেজায় পাজি বুড়ো থাকত। লোকে বলত, উপোস মামা। মানে মুখ দেখলে উপোস করতে হয়—এ্যায়সা কিপ্‌টে। মস্ত একটা পোড়োমতন বাড়িতে একা থাকত—চারদিকে তার আম কাঁঠালের ঘন বাগান। এমন জায়গা না যে—দিনের বেলা গেলেও গা ছমছম করত সেখানে। বুড়োর কেউ ছিল না—বুড়ি মরে গিয়েছিল—মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিল, তিন ছেলে চাকরি নিয়ে পালিয়েছিল এখানে ওখানে। ছেলেমেয়েরা কেউ বুড়োর আছে আসত না—কার দায় পড়েছে কচুঘণ্ট আর লালচালের ভাত খেতে?

সে যা হোক—উপোস মামা তো প্রায় উপোস করেই মারা গেল একদিন। ছেলেরা এল, শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ করে—টাকাপয়সা ভাগ করে নিয়ে—জমি-টমি বিক্রি করে দিয়ে—চলে গেল যার যে-দিকে খুশি। পড়ে রইল জংলা বাগানের ভেতর সেই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৯১৮--১৯৭০

জন্ম দিনাজপুরের বালিয়াডিঙ্গি গ্রামে। পিতৃদত্ত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে স্নাতক, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বিভিন্ন কলেজের ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। *সাহিত্যে ছোটগল্প* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ-এর জন্য পি এইচ ডি পান। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাতিমান। ইতিহাসবোধ ও স্বাদেশিকতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার উপজীব্য। *উপনিবেশ*, *পদসঞ্চার*, *শিলালিপি*, *অমাবস্যার গান*, *বিদূষক* তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। *স্বনির্বাচিত গল্প*, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, *গল্প সংগ্রহ*, *সাপের মাথার মণি* তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প গ্রন্থ। ছোটদের প্রিয় চরিত্র টেনিদার স্রষ্টা। ছোটদের জন্য হাসির গল্পের অনবদ্য লেখক।

পোড়ো বাড়িটা।

আর লোকে বলতে লাগল, ওই বাড়িতে উপোস মামা ভূত হয়ে আছে। জষ্ঠিমাসের হাওয়ায় পাকা আম পড়লেও কেউ তা কুড়োতে যেত না ওখানে, শেয়ালে-টেয়ালে খেত।'

'বাহ্‌, খাসা ভূতের বাড়ি বানালি দেখছি।'

'বানালুম? উঠে যা—তোর গল্প শুনে কাজ নেই।'

'না—না চটিস্‌নি। মানে বেশ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে কিনা। বলে যা ভাই—প্লিজ।'

'সেবার দেশে গিয়ে ঠিক করলুম—কাল অমাবস্যার রাত আছে—ঠিক বারোটার সময় ও-বাড়িতে ভূত দেখতে যাব। সবাই বারণ করলে—উপোস মামা ধরে ঘাড় মটকে দেবে। বললুম—বেঁচে থেকে তো রোগা পট্‌কা ছিল—আমি জিমনাস্টিক করি—জোরে পারবে কেন? দেখিই না—ভূত হয়ে উপোস মামার কীরকম তাগদ হয়েছে গায়ে।'

'গেলি?'

'কেন যাব না? ঠিক বারোটায় পৌঁছে পেলুম। একে অমাবস্যা, তায় মেঘ করেচে আবার। বাগানটায় ঢুকতে—সত্যি বলতে কি ভাই—গা ছমছম করতে লাগল। যেই খানিক এগিয়েছিল, ঝর্‌ ঝর্‌—ঝরাৎ!'

'অ্যাঁ—কী?'

'টর্চের আলোয় দেখি, হাওয়ায় একটা শুকনো ডাল খসে পড়েছে।'

'অ।'

'মন খারাপ হল বুঝি? শোন না—আসল রোমাঞ্চই তো বাকি রয়েছে।'

'বল ভাই। একটু কাছে ঘেঁষে বসছি, কিছু মনে করিস নি।'

'না—না, মনে করব কেন? তুই তো আর ভূতে বিশ্বাস করিস নে। তারপর শোন্‌—কী অন্ধকার, আর চারদিকে চামচিকে আর কী সবের কী বিচ্ছিরি গন্ধ!'

'তার পরে?'

'যেই বারান্দা ধরে একটু এগিয়েছি না—ঝটপট—ঝটপট—'

'অ্যাঁ, কী ঝটপট?'

'কিছু না। বাদুড়।'

'অ!'

'দাঁড়া না, আরো আছে। বাদুড় তো পালাল—কিন্তু একটা দরজা-ভাঙা খালি ঘরে যেই ঢুকেছি না—'

'কী?'

'দুটো চোখ। জ্বলজ্বলে করছে।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ। হিংস্রভাবে জ্বলছে। যেত প্রেতলোকের বিভীষিকা। কাছে আসছে—এগিয়ে আসছে—আরো আসছে—আহ্‌, জাপটে ধরছিস কেন? টর্চের আলোয় দেখি—'

'ক্‌—কী?'

'একটা হুলো বেড়াল। হ্যাঁ, স্রেফ হুলো বেড়াল। মুখে নেংটি ইঁদুর নিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।'

'ধেৎ!'

'দমিস্‌ নি—দমিস নি—আরো আছে।'

'তারপর?'

BanglaBook.org

'ঘরের বারান্দায় শুনি কে যেন আসে। পা টিপে টিপে—সাবধানে। বুক চমকে উঠল। কে—কে আসে অমন করে? কার পদধ্বনি? এত রাতে—এই অন্ধকারে—এই পোড়োবাড়িতে—কে আসে এত সাবধানে? সে কি ভূত? সে কি হত্যাকারী? কে?'

'কে?'

'একটা শেয়াল আসছিল। যেই বলেছি ভাগ্—দৌড়ে হাওয়া।'

'যাহ্!'

'ঘাবড়সনি। আরো আছে। তারপর—'

'তারপর?'

'ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।'

'তারপর?'

'ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।'

'তারপর?'

'ঘুরঘুট্টি, অন্ধকার।'

'তারপর?'

'ঘুরঘুট্টি—'

'আহ্, জ্বালালি! তোর ঘুরঘুট্টির নিকুচি করেছে। কী হল তাই বল্ না।'

'কী আর হবে? হয়রান হয়ে বাড়ি চলে এলুম।'

'আর ভূত?'

'ভূতই তো। ভূত মানে ভূত। মানে অতীত। মানে উপোস মামা অতীত হয়ে গেছেন—তিনি আর বর্তমান নেই। তাই তাঁর বাড়িতে আর তাঁকে দেখতে পেলুম না।'

'এই তোর ভূতের গপ্পো?'

'এই তো আসল ভূতের গল্প। ভূত মানে ভূত—মানে অতীত।

'ইস্টুপিড!'

'যা যা—ভাগ এখান থেকে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

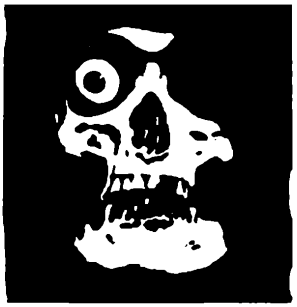

ভূতো

স ত্য জি ৎ রা য়

নবীনকে দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। অক্রূরবাবুর মন ভেজানো গেল না।

উত্তরপাড়ার একটা ফাংশনে নবীন পেয়েছিল অক্রূর চৌধুরীর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। খেলার নামটা নবীনের জানা ছিল না। সেটা বলে দেয় দ্বিজপদ। দ্বিজুর বাবা অধ্যাপক, তাঁর লাইব্রেরিতে নানান বিষয়ের বই। দ্বিজু নামটা বলে বানানটাও শিখিয়ে দিল। ভি-ই-এন-টি-আর-আই-এল-ও-কিউ-ইউ-আই-এস-এম। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। অক্রূর চৌধুরী মঞ্চে একা মানুষ কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আরেকজন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে। সেই মানুষ যেন হলের সিলিঙের কাছাকাছি কোথাও শূন্যে অবস্থান করছে। অক্রূরবাবু তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, তারপর উত্তর আসে উপর থেকে।

'হরনাথ, কেমন আছ?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি।'

'শুনলাম তুমি নাকি আজকাল সংগীতচর্চা করছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।'

'রাগ সংগীত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাগ সংগীত।'

'গান করো?'

'আজ্ঞে না।'

'যন্ত্র সংগীত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী যন্ত্র? সেতার?'

'আজ্ঞে না।'

'সরোদ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে কী বাজাও?'

'আজ্ঞে গ্রামোফোন।'

হাসি আর হাততালিতে হল মুখর হয়ে ওঠে। প্রশ্নটা উপর

সত্যজিৎ রায়

১৯২১--১৯৯২ জন্ম কলকাতায়। পৈত্রিক নিবাস কিশোরগঞ্জে; চলচ্চিত্রকার হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত। পিতা সুকুমার রায়, পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশুসাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতিমান। *পথের পাঁচালী, অপরাজিত, চারুলতা, অপুর সংসার, জনঅরণ্য, মহানগর, হীরক রাজার দেশে, আগন্তুক* তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র। শিশুসাহিত্যিক হিসাবে দারুণ জনপ্রিয়। গোয়েন্দা কাহিনী, অ্যাডভেঞ্চার সহ বিচিত্র ছোটদের গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তরুণদের কাছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ফেলুদা খুবই বিখ্যাত। চলচ্চিত্রের জন্য বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে বিবেচিত 'অস্কার' লাভ করেছেন।

দিকে চেয়ে করে উত্তরটা শোনার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু হেঁট করে নেন অক্রূরবাবু, কিন্তু তিনি নিজেই উত্তর দিচ্ছেন সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। ঠোঁট একদম নড়ে না।

নবীন তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এ জিনিস শিখতে না পারলে জীবনই বৃথা। অক্রূর চৌধুরী কি ছাত্র নেবেন না? নবীনের পড়াশুনায় আগ্রহ নেই। হাইয়ার সেকেন্ডারি পাস করে বসে আছে বছর তিনেক। আর পড়ার ইচ্ছে হয় নি। বাপ নেই, কাকার বাড়িতেই মানুষ সে। কাকার একটা প্লাইউডের কারখানা আছে; তাঁর ইচ্ছে নবীনকে সেখানেই ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু নবীনের শখ হল ম্যাজিকের দিকে। হাত সাফাই, রুমালের ম্যাজিক, আংটির ম্যাজিক, বলের ম্যাজিক—এসব সে বাড়িতেই অভ্যাস করে বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছে। কিন্তু অক্রূর চৌধুরীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম দেখার পরে সেগুলোকে নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে।

ফাংশনের উদ্যোক্তাদের কাছেই নবীন জানল যে অক্রূরবাবু থাকেন কলকাতায় অ্যামহার্স্ট লেনে। পরদিনই ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসে সে সোজা চলে গেল যাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে তাঁর বাড়িতে। গুরু কিন্তু বাদ সাধলেন।

'কী করা হয় এখন?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভেন্‌ট্রিলোকুইস্ট। কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখে হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল নবীনের। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়, চাড়া দেওয়া ঘন কালো গোঁফ, মাথার কালো চুলের ঠিক মধ্যিখানে টেরি, তার দুদিক দিয়ে ঢেউ খেলে চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, যদিও স্টেজে এই চোখই স্পটলাইটের আলোতে ঝিলিক মারে।

নবীন বলল সে কী করে।

'এইসব শখ হয়েছে কেন?'

নবীন সত্যি কথাটাই বলল।—'একটু-আধটু ম্যাজিকের অভ্যাস আছে, কিন্তু এটার শখ হয়েছে আপনার সেদিনের পারফরম্যান্স দেখে।'

অক্রূরবাবু মাথা নাড়লেন।

'এ জিনিস সকলের হয় না। অনেক সাধনা লাগে। আমাকেও কেউ শেখায় নি। যদি পার তো নিজে চেষ্টা করে দেখ।'

নবীন সেদিনের মতো উঠে পড়ল, কিন্তু সাতদিন বাদেই আবার অ্যামহার্স্ট লেনে গিয়ে হাজির হল। ইতিমধ্যে সে খালি ভেন্‌ট্রিলোকুইজমের স্বপ্ন দেখেছে। এবার দরকার হলে সে অক্রূরবাবুর হাতেপায়ে ধরবে।

কিন্তু এবারে আরো বিপর্যয়। এবার অক্রূরবাবু তাকে একরকম বাড়ি থেকে বারই করে দিলেন। বললেন, 'আমি যে শেখাব না সেটা প্রথমবারেই তোমার বোঝা উচিত ছিল। সেটা বোঝনি মানে তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি না-থাকলে কোনোরকম ম্যাজিক চলে না— এ ম্যাজিক তো নয়ই।'

প্রথমবারে নবীন মুষড়ে পড়েছিল, এবারে তার মাথা গরম হয়ে গেল। চুলোয় যাক অক্রূর চৌধুরী। সে যদি না-শেখায় তবে নবীন নিজেই শিখবে, কুছ পরোয়া নেহি।

নবীনের মধ্যে যে এতটা ধৈর্য আর অধ্যবসায় ছিল সেটা সে নিজেই জানত না। কলেজ স্ট্রিটে একটা বইয়ের দোকান থেকে ভেনট্রিলোকুইজম সম্বন্ধে একটা বই কিনে নিয়ে সে শুরু করে দিল তার সাধনা।

মোটামুটি নিয়মটা সহজ। প-বর্গের অর্থাৎ প ফ ব ভ ম, কেবল এই কটা অক্ষর উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকে, ফলে ঠোঁট নাড়াটা ধরা পড়ে বেশি। এই কটা অক্ষর না থাকলে যে-কোনো কথাই ঠোঁট ফাঁক করে অর্থাৎ না-নাড়িয়ে বলা যায়। কোনো কথায় প-

BanglaBook.org

বর্গের অক্ষর থাকলে সেখানেও উপায় আছে। যেমন, 'তুমি কেমন আছ, কথাটা যদি 'তুঙি কেঙন আছ' করে বলা যায়, তাহলে আর ঠোঁট নাড়াবার কোনো দরকারই হয় না, কেবল জিভ নাড়ালেই চলে। প ফ ব ভ ম-এর জায়গায় ক খ গ ঘ ঙ —এই হল নিয়ম। কথোপকথন যদি হয় এই রকম—'তুমি কেমন আছে?' 'ভালো আছি,' 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' 'তা পড়েছে, দিব্যি ঠাণ্ডা।'—তাহলে কথাটা বলতে হবে এই ভাবে—'তুমি কেমন আছ?' 'ঘালো আছি' 'আজ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' 'তা কড়েছে, দিগ্যি ঠাণ্ডা'।

আরো আছে। উত্তরদাতার গলার আওয়াজটাকে চেপে নিজের আওয়াজের চেয়ে একটু তফাত করে নিতে হবে। এটাও সাধনার ব্যাপার, এবং এটাতেও অনেকটা সময় দিল নবীন। কাকা এবং কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে শুনিয়ে যখন সে তারিফ পেল, তখনই বুঝল যে ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম ব্যাপারটা তার মোটামুটি রপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

সেই অদৃশ্য উত্তরদাতার যুগ আর আজকাল নেই। আজকাল ভেন্ট্রিলোকুইস্টের কোলে থাকে পুতুল। সেই পুতুলের পিছন দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথা ঘোরায় এবং ঠোঁট নাড়ায় জাদুকর। মনে হয় জাদুকরের প্রশ্নের উত্তর বেরোচ্ছে এই পুতুলের মুখ দিয়েই।

তার আশ্চর্য প্রোগ্রেসে খুশি হয়ে কাকাই এই পুতুল বানাবার খরচ দিয়ে দিলেন নবীনকে। পুতুলের চেহারা কেমন হবে এই নিয়ে দিন-পনের ধরে গভীর চিন্তা করে হঠাৎ একসময় নবীনের মাথায় এল এক আশ্চর্য প্ল্যান। পুতুল দেখতে হবে অবিকল অক্রুর চৌধুরীর মতো। অর্থাৎ অক্রুর চৌধুরীকে হাতের পুতুল বানিয়ে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

একটা হ্যান্ডবিলে অক্রুর চৌধুরীর একটা ছবি ছিল সেটা নবীন সযত্নে রেখে দিয়েছিল। সেটা সে আদিনাথ কারিগরকে দেখাল।—'এইরকম গোঁফ, এই টেরি, এইরকম ঢুলুঢুলু চোখ, ফোলা ফোলা গাল।' সেই পুতুল যখন মুখ নাড়বে আর ঘাড় ঘোরাবে নবীনের কোলে বসে, তখন কী রগড়টাই না হবে! আশা করি তার শো দেখতে আসবেন অক্রুর চৌধুরী!

সাতদিনের মধ্যে পুতুল তৈরি হয়ে গেল। পোশাকটাও অক্রুর চৌধুরীর মতো; কালো গলাবন্ধ কোটের তলায় কোঁচা কোমরে গোঁজা ধুতি।

নেতাজি ক্লাবের শশধর বোসের সঙ্গে নবীনের আলাপ ছিল; তাদের একটা ফাংশনে শশধরকে ধরে তার ভেন্ট্রিলোকুইজমের একটা আইটেম ঢুকিয়ে নিল নবীন। আর প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সেই যাকে বলে হিট। পুতুলের একটি নামও দেওয়া হয়েছে অবশ্য—ভূতনাথ, সংক্ষেপে ভূতো। ভূতোর সঙ্গে নবীনের সংলাপ লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভূতো হল ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, আর নবীন মোহনবাগানের। বাগ্‌বিতণ্ডা এতই জমেছিল যে ভূতো যে ক্রমাগত ইস্টগেংগল আর ঙোহনগাগান বলে চলেছে সেটা কেউ লক্ষই করে নি।

এর পর থেকেই বিভিন্ন ফাংশনে, টেলিভিশনে ডাক পড়তে লাগল নবীনের। নবীনও বুঝল যে ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আর কোনো চিন্তা নেই, রুজি-রোজগারের পথ সে পেয়ে গেছে।

অবশেষে একদিন অক্রুর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল নবীনের।

মাস তিনেক হল নবীন উত্তরপাড়া ছেড়ে কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রিটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছে। বাড়িওলা সুরেশ মুৎসুদ্দি বেশ লোক, নবীনের খ্যাতির কথা জেনে তাকে সমীহ করে চলেন। সম্প্রতি মহাজাতি সদনে একটা বড় ফাংশনে নবীন এবং ভূতো প্রচুর বাহবা

BanglaBook.org

পেয়েছে। ফাংশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আজকাল নবীনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। নবীনের নিজের ব্যক্তিত্বেও সাফল্যের ছাপ পড়েছে, তার চেহারা ও কথাবার্তায় একটা নতুন জৌলুস লক্ষ করা যায়।

হয়তো মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানেই অক্রুরবাবু উপস্থিত ছিলেন, এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নবীনের ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন। সেদিনের আইটেমে নবীন আর ভূতোর মধ্যে কথাবার্তা ছিল পাতাল রেল নিয়ে। যেমন—

'কলকাতায় পাতাল রেল হচ্ছে জান তো ভূতো?'

'কই, না তো।'

'সে কি, তুমি কলকাতার মানুষ হয়ে পাতাল রেলের কথা জান না?'

ভূতো মাথা নেড়ে বলল, 'উহু, তবে হাসপাতাল রেলের কথা শুনেছি বটে।'

'হাসপাতাল রেল?'

'তাই তো শুনি। একটা বিরাট অপারেশন, সারা শহরের গায়ে ছুরি চলছে, শহরের এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতাল ছাড়া আর কি?'

আজ নবীন তার ঘরে বসে নতুন সংলাপ লিখছিল লোডশেডিংকে কেন্দ্র করে। লোডশেডিং, জিনিসের দাম বাড়া, বাসট্রামে ভিড় ইত্যাদি যেসব জিনিস নিয়ে শহরের লোক সবচেয়ে বেশি মেতে ওঠে, ভূতোর সঙ্গে সেইসব নিয়ে আলোচনা করলে দর্শক সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এটা নবীন বুঝে নিয়েছে। আজকের নকশাটাও বেশ জমে উঠছিল, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। নবীন দরজা খুলে বেশ খানিকটা হকচকিয়ে দেখল অক্রুরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

'আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

নবীন ভদ্রলোককে ঘরে এনে নিজের চেয়ারটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

অক্রুরবাবু তৎক্ষণাৎ বসলেন না। তাঁর দৃষ্টি ভূতোর দিকে। সে অনড়ভাবে বসে আছে নবীনের টেবিলের এককোণে।

অক্রুরবাবু এগিয়ে গিয়ে ভূতোকে তুলে নিয়ে তার মুখটা বেশ মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। নবীনের কিছু করার নেই। সে যে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করছে না সেটা বললে ভুল হবে, তবে অক্রুরবাবুর হাতে অপমান হবার কথাটা সে মোটেই ভোলে নি।

'তোমার হাতের পুতুল বানিয়ে দিলে আমাকে?'

অক্রুরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

'হঠাৎ এ মতি হল কেন?'

নবীন বলল, 'কেন বানিয়েছি সেটা বোধ হয় বুঝতে পারছেন। আমি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে। সবটুকু ভেঙে দিয়েছিলেন আপনি। তবে এটুকু বলতে পারি— আপনার এই প্রতিমূর্তিই কিন্তু আজ আমাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। আমি খেয়ে-পরে আছি এর জন্যেই।'

অক্রুরবাবু এখনো ভূতোর দিক থেকে চোখ সরান নি। বললেন, 'তুমি জান কিনা জানি না—বারাসাতে সেদিন আমার একটা শো ছিল। স্টেজে নেমেই যদি চতুর্দিক থেকে 'ভূতো' 'ভূতো' বলে টিটকিরি শুনতে হয়, সেটা কি খুব সুখকর হয় বলে তুমি মনে কর? তোমার ভাত-কাপড় আমি জোগাতে পারি কিন্তু তোমার জন্য যে আমার ভাত-কাপড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে? তুমি কি ভেবেছ আমি এটা এত সহজে মেনে নেব?'

BanglaBook.org

সময়টা সন্ধ্যা। লোডশেডিং। টিমটিম করে দুটি মোমবাতি জ্বলছে নবীনের ঘরে। সেই আলোয় নবীন দেখল অক্রূরবাবুর চোখদুটো স্টেজে যেমন জ্বলজ্বল করে সেইভাবে জ্বলছে। ছোট্ট মানুষটার বিশাল একটা দোলায়মান ছায়া পড়েছে ঘরের দেয়ালে। টেবিলের উপর ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে বসে আছে ভূতনাথ—অনড়, নির্বাক।

'তুমি জান কি না জানি না,' বললেন অক্রূরবাবু, 'ভেনট্রিলোকুইজমে কিন্তু আমার জাদুর দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছর বয়স থেকে আটত্রিশ বছর পর্যন্ত আমাদের দেশের একজন অজ্ঞাতনামা অথচ অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জাদুকরের শিষ্যত্ব করেছি। কলকাতা শহরে নয়; হিমালয়ের পাদদেশে এক অত্যন্ত দুর্গম স্থানে।'

'সে জাদু আপনি মঞ্চে দেখিয়েছেন কখনো?'

'না। তা দেখাইনি কারণ সে-সব স্টেজে দেখানোর জিনিস নয়। রোজগারের পন্থা হিসেবে আমি সে জাদু ব্যবহার করব না এ প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম আমার গুরুকে। সে কথা আমি রেখেছি।'

'আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি শুধু সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমার মধ্যে সাধনার পরিচয় পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম যেমন তোমাকে আমি শেখাই নি, তেমনি আমাকেও কেউ শেখায় নি। পেশাদারি জাদুকররা তাদের আসল বিদ্যা কাউকে শেখায় না, কোনোদিনই শেখায় নি। ম্যাজিকের রাস্তা জাদুকরদের নিজেদেরই করে নিতে হয়—যেমন তুমি করে নিয়েছ। কিন্তু তোমার পুতুলের আকৃতি নির্বাচনে তুমি যে-ধৃষ্টতা দেখিয়েছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। শুধু এইটুকুই বলতে এসেছি তোমাকে।'

অক্রূরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার চুল আর গোঁফ এতদিন কাঁচা ছিল, এই সবে পাকতে শুরু করেছে। তুমি দেখছি সেটা অনুমান করে আগে থেকেই কিছু পাকা চুল লাগিয়ে রেখেছ।..যাক, আমি তাহলে আসি।'

অক্রূরবাবু চলে গেলেন।

নবীন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভূতনাথের সামনে এসে দাঁড়াল। পাকা চুল। ঠিকই। দু-একটা পাকা চুল ভূতনাথের মাথায় এবং গোঁফে রয়েছে বটে। এটা নবীন এতদিন লক্ষ্য করে নি। সেটাও আশ্চর্য, কারণ ভূতোকে কোলে নিলে সে নবীনের খুবই কাছে এসে পড়ে, আর সবসময় তার দিকে তাকিয়েই কথাবার্তা চলে, শাদা চুলগুলো আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

যাই হোক, নবীন আর এই নিয়ে ভাববে না। দেখার ভুল সব মানুষেরই হয়। মুখচোখের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছে নবীন, চুলটা তেমন ভালো করে দেখে নি।

কিন্তু তাও মন থেকে খটকা গেল না।

ভূতোকে বইবার জন্য নবীন একটা চামড়ার কেস করে নিয়েছিল, সেই কেসে ভরে সে পরদিন হাজির হল চিৎপুরে আদিনাথ পালের কাছে। তার সামনে কেস থেকে ভূতোকে বার করে মেঝেতে রেখে নবীন বললে, 'দেখুন তো, এই পুতুলের মাথায় আর গোঁফে যে শাদা চুল রয়েছে, সে কি আপনারই দেওয়া?'

আদিনাথ পাল ভারি অবাক হয়ে বলল, 'এ আবার কী বলছেন স্যার। পাকা চুলের কথা তো আপনি বলেন নি। বললে, কাঁচা-পাকা মিশিয়ে দিতে তো কোনো অসুবিধে ছিল না। দু-রকম চুলই তো আছে স্টকে; যে যেমনটি চায়।'

'ভুল করে দু-একটা শাদা চুল মিশে যেতে পারে না কি?'

BanglaBook.org

'ভুল তো মানুষের হয় বটেই। তবে তেমন হলে আপনি পুতুল নেবার সময়ই বলতেন না কি? আমার কী মনে হয় জানেন স্যার, অন্য কেউ এসে এ চুল লাগিয়ে দিয়েছে; আপনি টের পান নি।'

তাই হবে নিশ্চয়ই । নবীনের অজান্তেই ঘটনাটা ঘটেছে।

চেতলায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের ফাংশনে একটা মজার ব্যাপার হল।

ভূতোর জনপ্রিয়তার এইটেই প্রমাণ যে ফাংশনের উদ্যোক্তারা তার আইটেমটি রেখেছিলেন সবার শেষে। লোডশেডিং নিয়ে রসালো কথোপকথন চলেছে ভূতো আর নবীনে। নবীন দেখল যে ভূতোর উত্তরে সে যে সবসময় তৈরি-কথা ব্যবহার করছে তা নয়। তার কথায় অনেক সময় এমন সব ইংরিজি শব্দ ঢুকে পড়ছে যেগুলো নবীন কখনো ব্যবহার করে না—বড় জোর তার মানেটা জানে। নবীনের পক্ষে এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। অবিশ্যি তার জন্য শো-এর কোনো ক্ষতি হয় নি, কারণ কথাগুলো খুব লাগসই ভাবেই ব্যবহার হচ্ছিল, আর লোকেও তারিফ করছিল খুবই। ভাগ্যে তারা জানে না যে নবীনের বিদ্যে হাইয়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত।

কিন্তু এই ইংরিজি কথার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারটা নবীনের খুব ভালো লাগে নি। তার সব-সময়ই মনে হচ্ছিল অন্য একজন কেউ যেন অলক্ষ্যে তার উপর কর্তৃত্ব করছে। শো-এর পর বাড়ি ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নবীন টেবিলল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ভূতোকে রাখল বাতির সামনে।

কপালের তিলটা কি ছিল আগে? না। এখন রয়েছে। সেদিন তার ঘরে বসেই নবীন প্রথম লক্ষ্য করেছে অক্রূরবাবুর কপালের তিলটা। খুবই ছোট্ট তিল, প্রায় চোখে পড়ার মতো নয়। ভূতোর কপালেও এখন দেখা যাচ্ছে তিলটা।

আর সেইসঙ্গে আরো কিছু।

আরো খান দশেক পাকা চুল।

আর চোখের তলায় কালি।

এই কালি আগে ছিল না।

নবীন চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিল। তার ভারি অস্থির লাগছে। ম্যাজিকের পূজারী সে কিন্তু এ ম্যাজিক বড়ই অস্বস্তিকর। যে ম্যাজিকে সে বিশ্বাস করে তার সবটাই মানুষের কারসাজি। যেটা অলৌকিক, সেটা নবীনের কাছে ম্যাজিক নয়। সেটা অন্য কিছু। সেটা অশুভ । ভূতোর এই পরিবর্তনের মধ্যে সেই অশুভের ইঙ্গিত রয়েছে।

অথচ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও ভূতোকে পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। চোখে সেই ঢুলুঢুলু চাহনি, ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি, আর খেলার সময় তার নিজের হাতের কারসাজি ছাড়া যে-কোনো পুতুলের মতোই অসাড়, নির্জীব।

অথচ তার চেহারায় অল্প অল্প পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

আর নবীন কেন জানি বিশ্বাস করে এই পরিবর্তনগুলো অক্রূর চৌধুরীর মধ্যেও ঘটছে। তারও চুলে পাক ধরেছে, তারও চোখের তলায় কালি পড়ছে।

ভূতোর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলে টেকনিকটা ঝালিয়ে নেওয়ার অভ্যাস নবীনের প্রথম থেকেই। যেমন—

'আজ দিনটা বেজায় গুমোট করছে, না রে ভূতো?'

'হুঁ, গেজায় গুঙোট।'

BanglaBook.org

'তবে তোর সুবিধে আছে, ঘাম হয় না।'

'কুতুলের আগার ঘাঙ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।'

আজও প্রায় আপনা থেকেই নবীনের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল।—

'এসব কী ঘটছে বল্ তো ভূতো?'

উত্তরটা এল নবীনকে চমকে দিয়ে—

'কর্ডখল কর্ডখল ।'

কর্মফল।

নবীনের ঠোঁট দিয়েই উচ্চারণটা হয়েছে, যেমন হয় স্টেজে; কিন্তু উত্তরটা তার জানা ছিল না। এটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। কে বলিয়েছে সে সম্বন্ধে নবীনের একটা ধারণা আছে।

সে রাত্রে চাকর শিবুর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নবীন কিচ্ছু খেল না। এমনিতে রাত্রে ওর ঘুম ভালোই হয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই, তাই আজ একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিল। একটা নাগাদ বুঝতে পারল বড়িতে কাজ দেবে। হাত থেকে পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল-ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিতেই চোখের পাতা বুজে এল।

ঘুমটা ভেঙে গেল মাঝরাত্তিরে।

ঘরে কে কাশল?

সে নিজে কি? কিন্তু তার তো কাশি হয় নি। অথচ কিছুক্ষণ থেকেই যেন খুকখুক শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

ল্যাম্পটা জ্বালাল নবীন।

ভূতনাথ বসে আছে সেই জায়গাতেই, অনড়। তবে তার দেহটা যেন একটু সামনের দিকে ঝোঁকা, আর ডান হাতটা ভাঁজ হয়ে বুকের কাছে চলে এসেছে।

নবীন ঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। বাইরে পাহারাওলার লাঠির ঠকঠক । দূরে কুকুর ডাকছে। একটা প্যাঁচা কর্কশস্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল তার বাড়ির উপর দিয়ে। পাশের বাড়িতে কারুর কাশি হয়েছে নিশ্চয়ই। আর জানালা দিয়ে হাওয়া এসে ভূতোর শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের জনবহুল মির্জাপুর স্ট্রিটে তার এহেন অহেতুক ভয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

নবীন ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল, এবং আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ফিন্‌লে রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক ফাংশনে নবীন প্রথম ব্যর্থতার আস্বাদ পেল।

প্রকাণ্ড হলে প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান। যথারীতি তার আইটেম হল শেষ আইটেম। আধুনিক গান, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, কত্থক নাচ ও তারপর নবীন মুনসীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজম। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে নিজের গলার যত্ন নেবার জন্য যা করার সবই করেছে নবীন। গলটাকে পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার, কারণ সূক্ষ্মতম কন্ট্রোল না থাকলে ভেন্‌ট্রিলোকুইজম হয় না। স্টেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত সে দেখেছে তার গলা ঠিক আছে। এমনকি ভূতোকে প্রথম প্রশ্ন করার সময়ও সে দেখেছে গলা দিয়ে পরিষ্কার স্বর বেরোচ্ছে। কিন্তু সর্বনাশ হল ভূতোর উত্তরে।

এই উত্তর দর্শকের কানে পৌঁছাবে না, কারণ সর্দি-কাশিতে বসে গেছে সে গলা। আর এটা শুধু ভূতোর গলা। নিজের গলা সাফ এবং স্পষ্ট।

'লাউডার প্লিজ' বলে আওয়াজ দিল পিছনের দর্শক। সামনের দর্শক অপেক্ষাকৃত ভদ্র, তাই তাঁরা আওয়াজ দিলেন না, কিন্তু নবীন জানে যে তাঁরা ভূতোর একটা কথাও বুঝতে

BanglaBook.org

পারছেন না।

আরো পাঁচ মিনিট চেষ্টা করে নবীনকে মাপ চেয়ে স্টেজ থেকে বিদায় নিতে হল। এমন লজ্জাকর অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম।

সেদিনের পারিশ্রমিকটা নবীন নিজেই প্রত্যাহার করল। এ অবস্থায় টাকা নেওয়া যায় না। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই চিরকাল চলতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এ বিশ্বাস নবীনের আছে।

ভাদ্র মাস। গরম প্রচণ্ড। তার উপরে এই অভিজ্ঞতা। নবীন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সে রীতিমতো অসুস্থ বোধ করছে। এই প্রথম ভূতোর উপর একটু রাগ অনুভব করছে সে, যদিও সে জানে ভূতো তারই হাতের পুতুল। ভূতোর দোষ মানে তারই দোষ।

টেবিলের উপর ভূতোকে রেখে নবীন দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিল। হাওয়া বিশেষ নেই, তবে যেটুকু আসে; কারণ আজ শনিবার, রাত বারোটার আগে পাখা চলবে না।

নবীন মোমবাতিটা জ্বেলে টেবিলে রাখতেই একটা জিনিস দেখে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ভূতোর কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম।

শুধু তাই না। ভূতোর গালে চকচকে ভাবটা আর নেই। ভূতো শুকিয়ে গেছে। আর ভূতোর চোখ লাল।

এই অবস্থাতেও নবীন তার পুতুলের দিকে আরো দু-পা এগিয়ে না গিয়ে পারল না। কত বিস্ময়, কত বিভীষিকা তার কপালে আছে সেটা দেখবার জন্য যেন তার জেদ চেপে গেছে।

দু পা-র বেশি এগনো সম্ভব হল না নবীনের। একটি জিনিস চোখে পড়ায় তার চলা আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।

ভূতোর গলাবন্ধ কোটের বুকের কাছটায় একটা মৃদু উত্থান-পতন।

ভূতো শ্বাস নিচ্ছে।

শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি?

হ্যাঁ, যাচ্ছে বৈ কি। ট্রাফিকবিহীন নিস্তব্ধ রাত্রে নবীনের ঘরে এখন একটির বদলে দুটি মানুষের শ্বাসের শব্দ।

হয়তো চরম আতঙ্ক আর প্রচণ্ড বিস্ময় থেকেই নবীনের গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে পড়ল—

'ভূতো!'

আর সেই সঙ্গে এক অশরীরী চিৎকার নবীনকে ছিটকে পিছিয়ে দিল তার তক্তপোশের দিকে—

'ভূতো নয়! আমি অক্রুর চৌধুরী!'

নবীন জানে যে সে নিজে এই কথাগুলো উচ্চারণ করে নি। কণ্ঠস্বর ওই পুতুলের। অক্রুর চৌধুরী কোনো এক আশ্চর্য জাদুবলে ওই পুতুলকে সরব করে তুলেছেন। নবীন চেয়েছিল অক্রুর চৌধুরীকে তার হাতের পুতুল বানাতে। এ জিনিস নবীন চায় নি। এই জ্যান্ত পুতুলের সঙ্গে এক ঘরে থাকা নবীনের পক্ষে অসম্ভব। সে এখনই—

কী যেন একটা হল।

একটা শ্বাসের শব্দ কমে গেল কি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

BanglaBook.org

ভূতো আর নিশ্বাস নিচ্ছে না। তার কপালে আর ঘাম নেই। তার চোখের লাল ভাবটা আর নেই, চোখের তলায় আর কালি নেই।

নবীন খাট থেকে উঠে গিয়ে ভূতোকে হাতে নিল।

একটা তফাত হয়ে গেছে কেমন করে জানি এই অল্প সময়ের মধ্যেই।

ভূতোর মাথা আর ঘোরানো যাচ্ছে না, ঠোঁট আর নাড়ানো যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতিতে জাম ধরে গেছে। আর একটু চাপ দিলে ঘুরবে কি মাথা?

চাপ বাড়াতে গিয়ে মাথাটা আলগা হয়ে টেবিলে খুলে পড়ল।

পরদিন সকালে সিঁড়িতে নবীনের দেখা হল বাড়িওলা সুরেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে। ভদ্রলোক অভিযোগের সুরে বললেন, 'কই মশাই, আপনি তো আপনার পুতুলের খেলা দেখালেন না একদিনও আমাকে। সেই যে ভেন্টিকলোজিয়াম না কী!'

'পুতুল নয়,' বলল নবীন, 'এবার অন্য ম্যাজিক ধরব। আপনার যখন শখ আছে তখন নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?'

'আপনার এক জাতভাই যে মারা গেছে দেখলুম কাগজে। অক্রুর চৌধুরী।'

'তাই বুঝি?'—নবীন এখনো কাগজ দেখে নি।—'কিসে গেলেন?'

'হৃদরোগ', বললেন সুরেশবাবু, 'আজকাল তো শতকরা সত্তর জনই যায় ওই রোগেই।'

নবীন জানে যে খোঁজ নিলে নির্ঘাৎ জানা যাবে মৃত্যুর টাইম হল গতকাল রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শতাব্দীর ওপার থেকে

স ম রে শ ব সু

হুগলি জেলা সম্পর্কে, একটি প্রাচীন কাব্যে, এইরকম উল্লেখ আছে—'গঙ্গার পশ্চিম কূল—বানারসী সমতুল।'

কাব্যের উক্তিতে কতখানি স্থান-মাহাত্ম্যের কথা বলতে চাওয়া হয়েছে জানি না, তবে হুগলির প্রাচীনত্ব বিষয়ে, সংশয়ের কোনো কারণ নেই। কবি যদি এক্ষেত্রে, ত্রিবেণীর কথা মনে রেখে বলে থাকেন, তা হলে আলাদা। কিন্তু আদি সপ্তগ্রাম, যা একদা মুসলমান যুগেরও আগে অতি সম্পন্ন স্থান ছিল, তার কথাও মনে রাখা দরকার।

কিন্তু ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। যদিও একসময়ে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই, আমি হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি। সেই ঘুরে বেড়ানোর কাজটা সহজ ছিল না। শহরে-বন্দরে ঘোরাঘুরির অনেক সুবিধে। পকেটে টাকা থাকলে, সেখানে পান্থশালায় খাদ্য আর আশ্রয়ের অভাব হয় না। পান্থশালা বলতে আমি হোটেল-রেস্তোরাঁর কথাই বোঝাচ্ছি।

প্রায় বছর-পনের আগে, কলকাতার বিশিষ্ট পণ্ডিতব্যক্তির বাড়িতে, আমি একজনের সাক্ষাৎ পাই—যার একটি বিশেষ নেশা ছিল প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করা। সেই বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত ব্যক্তির বাড়িতে এই মুদ্রা-সংগ্রহকারী ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন তার কাছে আমি একটি লক্ষ্মণ সেন আমলের স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পাই। তিনি আমাদের কাছে অকপটেই স্বীকার করেন, মুদ্রাটি তিনি মহানাদ গ্রামের গঙ্গার ধার থেকে কিঞ্চিৎ দূরে, একটি পোড়ো ভিটার ধূলা থেকে আবিষ্কার করেন। ভদ্রলোকের এইরকম আরো কিছু সংগ্রহ আমি দেখেছি, অধিকাংশই গৌড়ের পাঠান আমলের মুদ্রা।

ভদ্রলোকের নাম প্রাণনিধি বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকাল সচরাচর এইরকম বড় একটা দেখা যায় না। প্রাণনিধিবাবুকে আমি প্রথমে নিতান্ত একজন মুদ্রা-সংগ্রহের নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি

সমরেশ বসু
১৯২৪--১৯৮৮
জন্ম মুন্সীগঞ্জ জেলায়। পুরনো ঢাকায় সূত্রাপুরে শৈশব কাটে। ডিম-মুরগি, শাকবজী বিক্রি করে এক সময় দিন চলত তাঁর। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে গ্রেপ্তার হন। এক পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। তিনি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একজন বিশিষ্ট রূপকার। হিংসাত্মক কার্যকলাপ মানবজীবনকে যেভাবে বিপর্যস্ত করে তার চিত্র নিখুঁতভাবে তাঁর কথাসাহিত্যে প্রস্ফুটিত। বামপন্থী রাজনীতির ধারা মানুষের ব্যক্তিসত্তার ওপর যে প্রভাব ফেলেছে তার চিত্র অংকনেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। আধুনিক জীবনের অনুষঙ্গ হিসাবে যৌনতাও তাঁর কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে। *গঙ্গা, প্রজাপতি, যুগযুগ জিয়ে, বিবর, বিটি রোডের ধারে, মহাকালের রথের ঘোড়া*, এবং কালকূট ছদ্মনামে লেখা *শাস্ব, প্রাচেতস* এবং অসমাপ্ত উপন্যাস *দেখি নাই ফিরে* উল্লেখযোগ্য।

বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনার পরেই বুঝতে পেরেছিলাম, তিনিও একজন পণ্ডিত ইতিহাসবেত্তা ব্যক্তি। এমনি সাধারণভাবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ জমানো খুবই কঠিন। কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে যান, দীর্ঘসময় অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন এবং ঘনঘন নস্যি টানেন। তার আচরণের মধ্যে আরো কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যার থেকে মনে হয়, তিনি কিছুটা ছিটগ্রস্ত লোক। যদিচ তিনি আদৌ তা নন। আসলে তার চিন্তার গভীরে, নানা বহমান অন্তস্রোতের জটিলতাই এর কারণ, মনেমনেই তিনি যার জট খুলতে সচেষ্ট হন।

প্রাণনিধিবাবু, মহানাদেরই এক প্রাচীন পরিবারের একমাত্র বংশধর। তাঁর চল্লিশোর্ধ্ব বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করেন নি। ইতিপূর্বেই আমার জানা ছিল, মহানাদ গ্রামের গঙ্গার ধারে নাকি বিশাল এক শঙ্খ সমুদ্র থেকে ভেসে আসে, তার ভিতর বায়ু প্রবেশ করলেই মহানাদ ধ্বনিত হত, সেই থেকেই গ্রামের নাম মহানাদ। কিংবদন্তির সত্যিমিথ্যা যাচাই করা কঠিন। আমি হুগলি জেলার নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রাণনিধিবাবু, আমাকে তাঁর মহানাদ গ্রামের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন, আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলাম।

প্রাণনিধিবাবুর সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাতের মাসখানেক পরে, আমি বিনা সংবাদেই একদিন তার গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ভেবেই রেখেছিলাম প্রাণনিধিবাবুর দেখা পাই ভালো, নয়তো গুপ্তিপাড়া অঞ্চল ঘুরে রাত্রের মধ্যেই কলকাতা ফিরে আসব। পরে আবার পত্রে যোগাযোগ করে যাওয়া যাবে।

মহানাদ অতি প্রাচীন গ্রাম এবং একসময়ে বিশেষ সম্পন্ন ছিল। অতি প্রাচীন হলে যা হয় তাই, ধ্বংসাবশেষের বহু চিহ্ন ছড়ানো। পোড়ো অট্টালিকা, ভাঙা মন্দির, বট অশত্থের আক্রমণে সবকিছু ধ্বংসোন্মুখ। বেলা দশটাতেই ঝিঁঝির ডাকে নিঝুম মনে হল। বিশাল ভগ্ন ইমারতগুলো দেখলেই অনুমান করা যায়, গৃহবাসীরা এখন প্রবাসী, যারা দেশের নানা জায়গায় চাকরি ও ব্যবসা উপলক্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাঙা পোড়ো বাড়ি এখন বাস্তু সাপ, গোখরোর নিশ্চিন্ত বিচরণ ক্ষেত্র। দু-চারটি ভাঙা পোড়ো বাড়িতে দেখা গেল দরিদ্র বংশধরেরা এখনো কেউ-কেউ টিকে আছে। তাও নিতান্ত যেন দায়ে পড়ে। অন্যান্য দরিদ্র গৃহস্থের কুটিরও কিছু কম নেই। সম্ভবত তারা কৃষি ও মৎস্যজীবী শ্রেণীর। সমস্ত প্রাচীন বাড়িই যে একেবারে ভেঙে পড়েছে, এমন কথা বলা যায় না। এবং সে-সব প্রাচীন অট্টালিকাসমূহে এখনো মানুষের বাস আছে বোঝা যায়। বড় বড় পুকুর, অধিকাংশ ঘাট ভাঙা, শ্যাওলায় বিবর্ণ। ফাটলে ফাটলে সাপের অস্তিত্ব যেন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। জলও সবুজ পানায় ভর্তি।

কিন্তু প্রাণনিধিবাবুর বাড়ি কোন্‌টি এবং কোন্ পাড়ায়? আমি খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে রাখি নি। গ্রামের পথে লোকজনের দেখাও তেমন পাচ্ছি না যাকে জিজ্ঞেস করা যায়। এক-আধজন যাদের দেখছি, তারা ঘোমটা-টানা স্ত্রীলোক, নাহয় তো ঘাটে-মাঠে খাটা মানুষ। ভদ্রগোছের লোক পেলে সুবিধে হয়। চলতে চলতে ইতিমধ্যেই কয়েকবার চমকে উঠেছি, রাস্তার দু-পাশের ঝোপে হঠাৎ সড়সড় শব্দে। তারপরে তাকিয়ে দেখেছি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গোসাপ হিলবিল করে চলে যাচ্ছে।

গা-টা একটু শিউরে উঠছে না, তা নয়, কিন্তু গোসাপকে ভয় পাবার কিছু নেই।

একটি লোকের দেখা পেলাম, ছাতা মাথায়, ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, চশমা চোখে—প্রৌঢ়। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রাণনিধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন?'

চৈত্র মাসে রোদের তেজ নিশ্চয়ই আছে। ছাতা থাকলে আমিও হয়তো মাথায় দিতাম। ভদ্রলোক অনুসন্ধিৎসু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক দেখলেন। দেখবার কিছু ছিল না,

BanglaBook.org

আমারও ধুতি-পাঞ্জাবিই সম্বল, বাড়তির মধ্যে চোখে সানগ্লাস, ঘাড়ে কাপড়ের ব্যাগ ঝোলানো।

ভদ্রলোক আমাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'প্রাণনিধি—মানে পানুর কথা জিজ্ঞেস করছেন?

'প্রাণনিধি—হয়তো ডাক নামে পানু হতে পারেন তা আমার জানবার কথা নয়। তা বলতে পারি না, প্রাণনিধি বন্দ্যোপাধ্যায় তার নাম, এ-গ্রামেই বাড়ি। আমি কখনও আসি নি, বাড়িটা চিনি না, তার সঙ্গে কলকাতায় পরিচয় হয়েছিল।'

ভদ্রলোক এক হাত তুলে, আমাকে কথার মাঝেই নিরস্ত করে বললেন, 'বুঝেছি বুঝেছি আপনি পানুর কথাই বলছেন। মাথাটা একটু ইয়ে তো—মানে বায়ুগ্রস্ত—তার ওপর বেশি লেখাপড়া শিখলে যা হয়। ছেলে অবিশ্যি ভালো।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'ছেলে না, উনি একজন—'

ভদ্রলোক আবার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভদ্দরলোক, এই তো? তা আপনাদের কাছে যাই হোক, পানু আমাদের কাছে ছেলেমানুষই। কিন্তু আপনি একটু ভুল রাস্তায় এসেছেন। এ কি আর ছোটখাটো গ্রাম? চলুন, আপনাকে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকেও ওদিকেই যেতে হবে।

ভদ্রলোকের কথা যথাযথই মনে হল। গাঁয়ের ছেলেদের বয়স বড়দের কাছে কোনোদিনই বাড়ে না। পথ চলতে চলতে ভদ্রলোক আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কোথা থেকে আসছি, কী কার্যোপলক্ষে, কী করি ইত্যাদি। যতটা সম্ভব তার কৌতূহল নিবারণ করলাম। তিনি নিজেই তাঁর নাম বললেন, বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। প্রাণনিধিবাবুর বিষয়ে বললেন—পানু ছেলেটি পণ্ডিত, এম এ পাশ করেছে কিন্তু মাথাটা তেমন ঠিক নেই। বিয়ে-থা করে নি, বিরাট ভূতুড়ে বাড়িতে একলা পড়ে আছে। তবে হ্যাঁ, গুণী ছেলে। ওর যা সঞ্চয়, তা একটা জাদুঘরের মতো। কত পুরনো জিনিস যে জোগাড় করেছে, তার ঠিক নেই। তার মধ্যে বিস্তর সোনারুপো, দামি পাথরও পাবেন। তবে ও সে-সব কারোকে দেখাতে চায় না। একটা ঘরের মধ্যে সব বন্ধ করা আছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, 'একদিন হয়তো দেখা যাবে, ডাকাতরা ওকে মেরে রেখে সব নিয়ে চম্পট দিয়েছে, কিছুই বলা যায় না। যা দিনকাল পড়েছে। বুঝলেন তো?' বুঝেছি, এবং বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায় মহাশয় খুব একটা অন্যায়ও বলেন নি বোধহয়। প্রাচীন দামি সংগৃহীত বস্তু যদি এ-রকম গ্রামের কোনো ঘরে থাকে, তবে বিপদ-আপদ ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাণনিধিবাবু, প্রাণ ধরে কিছুতেই সে-সব সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিতে রাজি নন, তার বক্তব্য, ওসব জায়গায় নাকি আরও বড় শিক্ষিত ডাকাতদের ভিড়।

যাইহোক, বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে আমি সুদীর্ঘ প্রাচীর বেষ্টিত একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। মনে হয় দশ-বারো বিঘা জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, যার অনেক জায়গায়ই নোনা ধরে, অশত্থের চারা গজিয়ে ক্ষয় হতে বসেছে। তার ভেতরে, নানান গাছপালা ঘেরা, দরজা-জানালা বন্ধ দোতালা বাড়ি চোখে পড়ছে। আমাদের সামনেই, অর্ধবৃত্তাকার খিলানের নিচে, মোটা মোটা গজাল পোঁতা। সেকালের ভারী পাল্লার বড় দরজা। ভেতর থেকে বন্ধ। বৃন্দাবনবাবু সন্দেহ প্রকাশ করলেন, 'পানু কি বাড়িতে আছে? কড়া নেড়ে দেখা যাক। পাগলের ডিম, কোথায় হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

বৃন্দাবনবাবু বড় লোহার কড়া ধরে, জোরে শব্দ করলেন। কিন্তু আমার মনে হল, সে শব্দ বন্ধ স্তব্ধ বাড়ির ভেতরে পৌঁছানো বোধহয় সম্ভব নয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রাণনিধিবাবু কি একেবারেই একা থাকেন? তাঁর রান্নাবান্না ঘরের কাজকর্ম করে কে?'

বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'সে-সব কাজের জন্য একটা লোক আছে, মাঝবয়েসী বুড়ো, এ গাঁয়ের একটা লোক, কড়ি বৈরাগী নাম। সে-ই পানুর সব কাজ করে, খায়, থাকে।'

BanglaBook.org

তিনি আবার জোরে কড়া নাড়া দিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, 'পানু আছ নাকি হে, অ পানু!

তাঁর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরের ভারী হুড়কো খোলার শব্দ হল। প্রথম কড়া নাড়া শুনেই বোধহয় দরজা খুলতে এসেছিল।

দরজা খোলার পর দেখতে পেলাম, ছোটখাটো ধুতি পরা, গায়ে শুকনো গামছা জড়ানো বয়স্ক লোক। মাথায় বড় বড় বাবরি, কাঁচাপাকা চুল। গোঁফ-দাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠি, কপালে ও নাকে তিলক কাটা। বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'এই যে কড়ি, পানু আছে? উনি কলকাতা থেকে এসেছেন পানুর সাথে দেখা করতে।'

কড়ি বৈরাগী ঘাড় কাত করে, অতি কোমলভাবে বলল, 'আছেন। আপনি আসুন।'

বৃন্দাবনবাবু বিদায় নিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে, আমি বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকে, ডান দিকের প্রায়-ভগ্ন ইমারতের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ঠাকুরদালান। সম্ভবত একদা দুর্গোৎসব ইত্যাদি হত। ঠাকুরদালানের পাশেই অতিপ্রাচীন একটা চারচালা মন্দির, সংলগ্ন আরো দুটি ছোট ছোট মন্দির, সবই বট অশত্থের আক্রমণে ধ্বংসোন্মুখ। আশেপাশে কিছু আম-জাম-নারকেল গাছ। কড়ি বৈরাগী দরজা বন্ধ করে আমাকে ডাকল, 'আসুন বাবু।'

কড়ি বৈরাগীর কথার উচ্চারণ পরিচ্ছন্ন, স্বর কোমল। তাকে ভক্ত মানুষ বলে মনে হয়। সে আমাকে ঠাকুরদালানের উত্তর দিকে, একটি একতলা বাড়ির দিকে নিয়ে গেল। মূল দোতলা বাড়ি থেকে সেটি বিচ্ছিন্ন। একতলা বাড়িটির সামনের বারান্দা ছাদ ঢাকা। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই, একটি খোলা দরজা দিয়ে প্রাণনিধিবাবু বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে, খুব একটা বিস্মিত হলেন না। একটু হেসে বললেন, 'ওহ আপনি! কোনো চিঠিপত্র দিয়েছিলেন না কি?'

সংকুচিত হয়ে বললাম, 'না, চিঠি না-দিয়েই চলে এলাম। ভাবলাম আপনার সাথে যদি দেখা হয়ে যায় ভালোই, তা না-হলে আজ অন্য দিকে ঘুরে চলে যেতাম।'

প্রাণনিধিবাবু গেঞ্জি ছাড়া পাঞ্জাবি পরেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ঘরে বিশেষ কিছু নেই। পুরনো বিরাট ঘর, দেয়াল আর মেঝের পলেস্তারা খসে পড়েছে অনেক জায়গায়। পূর্বদিকের জানালা ঘেঁষে একপাশে একটা বড় টেবিল, খানকয়েক পুরনো চেয়ার। টেবিলের উপর লেখবার কাগজ-কলম, কিছু বইপত্র দেখে মনে হল, প্রাণনিধিবাবু বোধহয় লেখাপড়া করছিলেন। আবার সংকুচিত হয়ে বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমি এসে ব্যাঘাত করলাম।'

প্রাণনিধিবাবু বললেন, 'এমন কিছু না, আমার কাজ তো সারা দিন-মাস-বছরই আছে। ক-দিন ধরে ভাবছি একটু গৌড় আর পাণ্ডুয়া যাব। সময় পেলে, আপনাদের কুকড়াকাটা গ্রামেও একটু ঘুরে আসতে পারি।'

কামরূপ জেলার কুকড়াকাটা গ্রামের নাম আমার জানা, নবকাসুর আর কামাখ্যা দেবীর একটি কিংবদন্তি, সেই গ্রামকে নিয়ে প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রাণনিধি সেখানে যাবেন কেন? জিজ্ঞাসাটা মনেমনেই রাখলাম।

তিনি আবার বললেন, 'তবে এখনই কোনো ব্যস্ততা নেই। বসুন।'

কড়ি বৈরাগীর দিকে ফিরে বললেন, 'উনি খাবেন, সেইমতো ব্যবস্থা করো।'

আমি ভদ্রতা করে বললাম, 'থাক না, আমি একটু দেখেশুনে ...'

প্রাণনিধি বলে উঠলেন, 'এসেছেন যখন দু-একদিন থেকে, আশেপাশে ঘুরে যান। অসুবিধে তো কিছু নেই। খাওয়া-দাওয়ার একটু কষ্ট হবে, আমরা এখানে নিয়মিত ডাল-ভাত ছাড়া কিছু পাবেন না।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'যথেষ্ট।'

কড়ি বৈরাগী ঘর থেকে চলে গেল। প্রাণনিধিবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে, তিনি আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। কাঠের পাল্লায় নিশ্ছিদ্র আলমারি খুলে, অতি সাবধানে রক্ষিত, তার কয়েকটি পুঁথি-পুস্তকের সংগ্রহ দেখালেন। বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে আপনার মনোমতো বিষয়ের বইপত্র পড়তে পারেন।'

আমি আনন্দিত হয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

'অ্যাঁ।'

প্রাণনিধি ভ্রুকুটি বিস্ময়ে যেন চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'ওহ হ্যাঁ বুঝেছি।'

তার কথার ভঙ্গিতে আমারই চমকে ওঠার অবস্থা। তারপরে, তিনি আমাকে নিয়ে একতলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে গেলেন। সেদিকে বিশাল বাগান এবং পুকুর। মূল বাড়ির এটা পেছন দিক, পেছন দিক দিয়েই তিনি—আমাকে নিয়ে ছোট একটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'একটু অন্ধকার, দেখে আসবেন। প্রায় দু-শ বছরের পুরনো বাড়ি। এখনো যে টিকে আছে, সেটাই যথেষ্ট।'

অতি যথার্থ কথা। অন্ধকার কেবল না, বেশ ঠাণ্ডা, ভেজা-ভেজা নোনা ইটের গন্ধ ছড়ানো। তিনি বিভিন্ন সরু দালানের ভেতর দিয়ে চলেছেন। আবছায়াতে দেখতে পাচ্ছি অনেক ঘর, এবং সব ঘরেরই দরজা বন্ধ। একটি বড় দালানের প্রান্তে, দোতালায় ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'কড়ি, কড়ি?'

মনে হল, দেয়ালের অন্য পাশ থেকে কড়ি বৈরাগীর গলা শোনা গেল, 'যাই বাবা।'

দেখলাম, ডানদিকের একটা দরজা খুলে কড়ি বৈরাগী ঢুকল। প্রাণনিধি বললেন, 'দোতলার সব ঘর খোলা আছে তো, তালা-চাবি বন্ধ নেই?'

কড়ি বৈরাগী বলল, 'না। শিকল তোলা আছে।'

প্রাণনিধি সিঁড়িতে পা দিয়ে আমাকে ডাকলেন, 'আসুন।'

আমি তাকে অনুসরণ করলাম। দোতালায় ওঠার সিঁড়ি। কিন্তু তার মধ্যেই গোটা কয়েক পাক দিতে হল। দোতালায় উঠে, চৈত্রদিনের আলো দেখতে পেলাম। প্রাণনিধিবাবু বড় চওড়া দালানের দরজা খুলে দিতেই দক্ষিণের বাতাস ঢুকল এবং সেই বাতাসে একটি মৃদু-মধুর গন্ধ পেলাম। কনকচাঁপার গন্ধ।

প্রাণনিধিবাবু বড় দালানের মাঝামাঝি একটা দরজা খুলে স্বল্প-পরিসর আর একটি দীর্ঘ দালানে ঢুকলেন। দু-পাশে ঘর, দরজা বন্ধ। সবই শিকল তালা বন্ধ, কেবল মাঝামাঝি একটি ঘরের কড়ায় ও শিকলের সঙ্গে গোটা কয়েক তালা ঝোলানো দেখতে পেলাম। তিনি সেই স্বল্প-পরিসর দালানের শেষপ্রান্তে গিয়ে, আর একটি দরজা খুললেন। সামনেই বারান্দা। উত্তর দিকে বাগান আর পুকুর দেখা যাচ্ছে। শেষপ্রান্তের পাচিলের ওপারে পোড়ো জমি, ঝোপ-জঙ্গল আর গ্রামের পথও চোখে পড়ে।

আবার আমার ঘ্রাণে একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম। এটিও চেনা গন্ধ, বাতাবিলেবুর গন্ধ, এখন মৃদু। কিন্তু সন্ধেবেলা এ-গন্ধ নিশ্চয়ই অনেক তীব্রতর হবে। প্রাণনিধিবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'অর্থহীন!'

বারান্দা থেকে আবার ঢুকে, পূর্বের একটি দরজার শিকল খুললেন। অন্ধকার ঘর। প্রাণনিধিবাবু ভেতরে ঢুকে, দুটি জানালা এবং উত্তর দিকের একটি দরজা খুলে দিতেই ঘরে আলো ঢুকল। সেই আলোয় দেখলাম, ঘরের একপাশে প্রাচীন উঁচু খাট, তার ওপরে বিছানা পাতা, এবং তা মোটামুটি

BanglaBook.org

বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রাণনিধিবাবু বললেন, 'কয়েকটি ঘর নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। আপনি এ-ঘরে শোবেন। উত্তর দিকের বারান্দা দিয়ে পায়খানায় যাওয়া যাবে। আমি থাকি বড় দালানের পূর্ব দিকের ঘরে। এ-ঘরে আপনার অসুবিধে হবে না তো?'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না, না,অসুবিধে আবার কী? কিন্তু আপনি তখন অর্থহীন কথাটা বলেছিলেন কেন?'

প্রাণনিধি বললেন, 'অর্থহীন না? এত বড় বাড়ি করবার মানে হয় মশাই! ইঁট কাঠের স্তূপ।'

আমি হেসে বললাম, 'আপনার পূর্বপুরুষরা হয়তো বংশধরদের সুখে থাকার জন্যই এসব করেছিলেন। তখন জানতেন না বাড়ি এ-রকম খালি পড়ে থাকবে।'

প্রাণনিধি বললেন, 'বংশধরদের সবাই থাকলে অবশ্যি খালি পড়ে থাকবার কথা না। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ জ্ঞাতি-বংশধররাই আজ চার পুরুষ ধরে উত্তর প্রদেশের নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে।'

কিন্তু তিনি কেন এখনো এই গ্রামের বাড়ি আগলিয়ে বসে আছেন, তা বললেন না। হতে পারে এখানেই তিনি ভালো আছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাণনিধি উত্তর দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'আপনি যখন বারান্দায় যাবেন, তখন ঘরের ভেতর দিয়েই যাবেন। ইচ্ছে হলে এই দালানের দরজাও খুলতে পারেন।'

আমাকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে, প্রাণনিধি আবার নিচে গেলেন। তার সংগ্রহশালা আমাকে দেখালেন না। কিছু বললাম না। কলকাতা থেকে স্নান করেই বেরিয়েছিলাম। প্রাণনিধিবাবু আমাকে বাইরে একতালা বাড়িতে রেখে স্নান করে কাপড়-জামা বদলে এলেন। তারপরে খেতে গেলাম। একান্তই নিরামিষ। প্রথমে পাতে ঘি দিয়ে নিমপাতা ভাজা, তারপর মুগ ডাল, মোচার ঘণ্ট, কচি আমের অম্বল। কড়ি বৈরাগীর হাতের রান্নাটি ভালো। অতঃপর বিশ্রাম। দোতালায় যাবার আগে, আলমারি থেকে আমি একটি তুলোট কাগজে হাতে-লেখা প্রাচীন পুঁথি পড়বার জন্য নিলাম, নাম 'আত্মা পরলোক সম্বন্ধ।'

চৈত্রের নিদাঘের একটি বিশেষ মাদকতা আছে। পুবের জানালা দিয়ে হাওয়া আসছিল। ঘরের খাটের বিছানায় তুলোট কাগজে হাতে-লেখা পুঁথি পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ একটি শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল, ঘরের মধ্যে কেউ পায়জোড় পায়ে, ঝুমুর ঝুমুর শব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখ তাকিয়ে দেখলাম ঘরে দিনের আলো কিন্তু শব্দটা যেন তখনো, মেঝের ওপর দিয়ে, ঝুমঝুম শব্দে হেঁটে, খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি বালিশ থেকে মাথা তুলে তাকালাম। কিছুই দেখতে পেলাম না, শব্দও স্তব্ধ হয়ে গেল।

উঠে বসে ভাবলাম, হয়তো কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু কিছু মনে করতে পারলাম না। দেখলাম বালিশের কাছে পুঁথিটি তেমনি রয়েছে। তারপর মনে হল আদৌ কিছু শুনেছি কি? নিশ্চয়ই না। বাঁ হাতের মনিবন্ধে ঘড়িটা পরাই ছিল। সময় দেখলাম, তিনটে বেজেছে।

এখনো একটু তন্দ্রার ভাব আছে। আবার বালিশের ওপর মাথাটা দিলাম। একটু পরই মনে হল, সেই ঝুমঝুম শব্দটা কানে আসছে, কিন্তু অনেক দূর থেকে। যেন সামনের চওড়া দালানে পায়জোড় বা বাজুবন্ধ পায়ে, কেউ ঝুমঝুম শব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে। শব্দ বেশ হালকা, যেন শিশুর পায়ের মতো। কিন্তু এ-বাড়িতে শিশু বা নারীর কোনো অস্তিত্ব আছে বলে শুনি নি। তবে এ-শব্দ কিসের, কার? আমি এখন পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত, শুনতে ভুল হবার কোনো কারণ নেই।

মুহূর্তেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সচকিত করে দিয়ে, দক্ষিণের বড় ঘর থেকে দালানে ঝুমঝুম শব্দ, স্বল্প-পরিসর দালান দিয়ে, এ-ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলাম। কে আসছে বা কে আসতে পারে, এইরকম ঝুমঝুম শব্দে?

BanglaBook.org

আমি স্পষ্ট টের পেলাম, ঝুমঝুম শব্দ যেন আমার ঘরে দরজার সামনে এসে চুপচাপ দাঁড়াল। আমি আস্তে আস্তে মাথা তুলে, দরজার দিকে তাকালাম। আশ্চর্য। কেউ নেই। খোলা দরজা, দক্ষিণ দিক থেকে দালানে দীর্ঘসরু আলো এসে পড়েছে।

শুয়ে থাকতে পারলাম না, উঠে বসলাম। একটু অপেক্ষা করে, খাট থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে দক্ষিণ দিকে উঁকি দিলাম। কেউ নেই। মুখোমুখি বন্ধ-ঘরগুলোর মাঝখানের সরু দালানে দক্ষিণের বাতাস ঢুকে, নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে না পেয়ে, যেন একরকমের হাহাশ্বাস তুলছে।

আমি সরু দালান পেরিয়ে দক্ষিণের বড় দালানে গেলাম। আমার বাঁ দিকেই, একটি ঘরের দরজা খোলা; এবং অংশত দৃষ্ট খাটে প্রাণনিধিবাবুর শায়িত শরীরের অংশবিশেষ চোখে পড়ল। কাছে গিয়ে দরজার সামনে থেকে দেখলাম, তিনি গভীর দিবানিদ্রায় মগ্ন।

দরজার কাছ থেকে ফিরতে উদ্যত হতেই, সরু দালানে ঝুমঝুম হালকা ধ্বনি শুনতে পেলাম। অথচ আমি বড় দালানের, দক্ষিণ খোলা জানালার আলোতে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে সরু দালানের ভেতর দিয়ে, সেই শব্দ যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। দৃষ্টি সরু দালানের দরজার দিকে। ঝুমঝুম শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। আমার বুকের ওঠানামা দ্রুত হয়ে উঠল, কিছু একটা দেখবার প্রত্যাশায় আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয়, আমার দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত হল।

কিন্তু সরু দালানের দরজার কাছে এসেই আড়ালে সে-শব্দ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি দ্রুত পায়ে দরজার কাছে গেলাম। কেউ নেই, দালান শূন্য। অভাবিত ব্যাপার! আমি ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে দেখলাম। কোথাও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। যেন জেগে স্বপ্ন দেখার মতো। মুখ ফিরিয়ে প্রাণনিধিবাবুর ঘরের দিকে দেখলাম। একই দৃশ্য!

সেই মুহূর্তেই সিঁড়ির মুখে ঝুমঝুম শব্দ জেগে উঠল। এবং শব্দ যেন সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। আমি এগিয়ে গেলাম। শব্দ অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। ঝুমঝুম শব্দ, সিঁড়ির নিচে অবধি গিয়েই স্তব্ধ হল, আর আমি শুনলাম টং টং করে একতারা বাজছে, সিঁড়ির পাশের দেয়ালের আড়ালে। সেদিকে একটা দরজা আছে, সেটা ভেজানো। আমি এবার ঝংকারের সঙ্গে গম্ভীর কিন্তু কোমল স্বরের গান শুনতে পেলাম :

'ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে
বধূরানী যায় অভিসারে
কী বা অপরূপ সাজে।'...

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা আস্তে ঠেলে খুললাম। দেখলাম, কড়ি বৈরাগী চোখ বুজে, একতারা বাজিয়ে গান করছে। ঘরটিতে পেতল-কাঁসার রান্নার সাজসরঞ্জাম সাজানো। কড়ি আমার উপস্থিতি টের পেল না। আমিও তাকে না-ডেকে দরজা আস্তে টেনে দিয়ে ফিরে দাঁড়ালাম।

নিচের সবকিছুই বন্ধ এবং প্রায়-অন্ধকার। দরজা-জানালার ফুটোফাটা দিয়ে যা সামান্য আলো আসছে। নিচের বড় দালানের মাঝখানে দোতালার মতোই একটি ছোট দরজা রয়েছে, এদিক থেকে শিকল টেনে বন্ধ করা। বাড়ির পেছন দিয়ে ওই দরজা দিয়েই প্রাণনিধিবাবুর সঙ্গে এদিকে এসেছিলাম।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আর কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না। আবার উপরে উঠলাম। দীর্ঘ-সরু দালানের দরজা দিয়ে ঢুকে, নিজের ঘরে গেলাম, এবং ঘরের উত্তর দিকের দরজা খুলে দিয়ে আবার পুঁথিটি নিয়ে বসলাম।

খানিকক্ষণ বাদেই, প্রাণনিধিবাবু এলেন। সদ্য ঘুম-ভাঙা, ফোলা-ফোলা মুখ, জিজ্ঞেস করলেন, 'একটু কি দিবানিদ্রা দিলেন, নাকি সেই থেকে পড়ছেন?'

বললাম, 'না, একটু ঘুমিয়েছিলাম।'

BanglaBook.org

প্রাণনিধি বললেন, 'আমি আবার একটু না-ঘুমিয়ে পারি না। একটু চা চলবে তো?'

বললাম, 'চলবে।'

তিনি বললেন, 'তাহলে চলুন মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পরে একটু নিচে যাই। চা খেয়ে, একেবারে বেরিয়ে পড়ব, ঘুরেটুরে ফিরব।'

বললাম, 'তাই চলুন।'

সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই আমি আর প্রাণনিধিবাবু বাড়ি ফিরে এলাম। গ্রামের কোন্ পাড়ায় তিনি স্বর্ণমুদ্রাটি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তা দেখিয়েছেন। প্রাচীন গ্রাম এবং গঙ্গার ধারেই আমাদের বেড়ানো সীমাবদ্ধ রইল।

বাড়ির মধ্যে হারিকেনের আলো। একতলা বাইরের বাড়িতে বসে প্রাণনিধিবাবু তাঁর নানাবিধ বস্তুর সংগ্রহের কাহিনী শোনালেন। অবিশ্যি তাঁর কাহিনী শোনাও মুশকিল। কথা বলতে বলতে প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে ন-টার সময়ে, কড়ি বৈরাগী আমাদের খেতে ডাকলেন। দেখা গেল, রাত্রে লুচির ব্যবস্থা, তার সঙ্গে কুমড়োর ছেঁচকি, ডাল আর কচি পটলের সঙ্গে আলুর ডালনা এবং দুধ। পরের দিন সকালে গুপ্তিপাড়া, বেহুলা ইত্যাদি গ্রাম ঘুরতে যাবার প্রোগ্রাম করে শুতে গেলাম। কড়ি বৈরাগী জানাল, উত্তরের বারান্দায়, বাথরুমে বালতিতে জল দেওয়া আছে।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, খাটে মশারি টাঙানো, চারদিক গোঁজা। হারিকেন জ্বলছে। একপাশে একটি জলের কুজো, মুখে ঢাকা কাঁসার গেলাশ। রাত্রি তেমন বেশি না হলেও, শুয়ে পড়লাম। তার আগে হারিকেনটা একটু কমিয়ে রাখলাম, একেবারে অন্ধকার করলাম না।

শুয়েও বেশ খানিকক্ষণ ঘুম এল না। বাইরের গাছপালায় চৈত্র-বাতাসের হু হু শব্দ, কনকচাঁপা আর লেবুফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে। ঘুমটা ঠিক এসেছিল কি না, বুঝে ওঠার আগেই আবার সেই ঝুমঝুম শব্দ ঘরের মেঝেয় শোনা গেল। ঘরের মঝেয় শুধু না, মনে হল হেঁটে সেই শব্দ খাটের সামনে এসে থামল।

আমি বালিশ থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে, স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোটখাটো একটা ছায়ামূর্তি মশারির বাইরে আমার দিকেই যেন তাকিয়ে আছে। আমি উঠে বসতে বসতেই কমানো হারিকেনের আলোয় সেই মূর্তি যেন অনেকটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করল। দেখলাম, একটি সাত-আট বছরের ফরসা মেয়ে লাল-পাড় শাড়ি পরা। কপালে এবং সিঁথিতে সিঁদুর। গায়ে কোনো জামা নেই কিন্তু হাতে-ডানায়-গলায়-কানে সোনার অলংকার। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, ডাগর-কালো চোখের স্থিরদৃষ্টি আমার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত সেই চোখের দিকে তাকিয়ে, আমি কেমন যেন আচ্ছন্নবোধ করলাম। দেখলাম সাত-আট বছরের বিবাহিতা বালিকা, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দেখে আমি মন্ত্রচালিতের মতো মশারির বাইরে খাট থেকে নেমে দাঁড়াতেই, বালিকাবধূ দরজার কাছ থেকে হাতছানি দিয়ে ডেকে আমাকে খিল খোলবার ইঙ্গিত করল। আমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম। বালিকা আমাকে হাতছানি দিয়ে দক্ষিণের বড় দালানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। বালিকা আমার আগে ঝুমঝুম শব্দে এগিয়ে চলেছে, আমি তাকে অনুসরণ করে চলেছি।

বড় দালানে পৌঁছে, সে সিঁড়ির মুখে গিয়ে, হাতছানি দিয়ে আমাকে নিচের দিকে যাবার ইঙ্গিত করল। অন্ধকারে বালিকার মূর্তি কেমন করে এত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সে প্রশ্ন আমার মনে একবারও জাগল না।

নিচে নেমে বড় দালানের মাঝামাঝি, সরু দালানের দরজার কাছে ঝুমঝুম শব্দে গিয়ে বালিকা

BanglaBook.org

দাঁড়াল এবং আমাকে আবার হাতছানি দিয়ে সরু দালানের দিকে অনুসরণ করতে ইশারা করল নিজের সম্পর্কে কোনো চেতনাই আমার নেই। বালিকাকে অনুসরণ করলাম। একটা ঠাণ্ডা বাতাসের ভেজা স্পর্শ অনুভব করলাম। সরু দালানের ভেতরে খানিকটা গিয়ে বালিকা আমাকে একটি বাঁ-দিকের ঘরের মধ্যে ডাকল।

সেই ঘরে ঢুকে দেখলাম, হারিকেন জ্বলছে এবং কটি নারীমূর্তি—সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত। আমি ঢুকতেই, সকলে আমার দিকে তাকাল। দেখলাম, দশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে বয়স, সকলেই বিবাহিতা। কপালে ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর। কারোর শুধু লাল-পাড়, কারোর লালের ওপর ফলকা দেওয়া, জলধাক্কা শাড়ি-পরা। কারোরই জামা নেই। হাতে, গলায়, কানে ও পায়ে সকলেরই নানান অলংকার সাত-আট বছরের বালিকার মতো। কিশোরী আর যুবতীরা সকলেই ফরসা আর সুন্দরী। বালিকাটিকে নিয়ে, সর্বসাকুল্যে সাতজন।

সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে, নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে যেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। তারপরই দেখলাম, তারা যে-যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ শিলনোড়ায় কিছু বাঁটছে, কেউ হামানদিস্তায় কিছু গুঁড়ো করছে, কেউ জলের পাত্রে পাথরের গেলাশ নিয়ে জল ঢালা-তোলা করছে।

তাদের মধ্যে ষোল-সতের বছরের একটি তরুণী হঠাৎ যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, এবং তার বুকের আঁচল খসে পড়ল। কান্নার কোনো শব্দ শ্রুত হল না। সে তার স্বাস্থ্যোদ্ধত তরুণী-বুকে হাত দিয়ে সজোরে চাপড়াতে লাগল। কেন সে কাঁদছে? একটু বয়োজ্যেষ্ঠ আর-একজন তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, নানারকমে যেন সান্ত্বনা দিতে লাগল। সেই সাত-আট বছরের বালিকাও ওদের মাঝখানে পড়ে কাঁদতে লাগল। অথচ কান্নার কোনো শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে না। কেবল রুদ্ধ কান্নার দমকা নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ এইরকম কান্নাকাটির পরে সকলেই আবার থামল। আবার তারা যে-যার কাজে ব্যাপৃত হল। তারা একান্ত নিজেদের মধ্যে শিথিল এবং স্খলিত ও উদাম উন্মুক্ত অঙ্গের জন্য কেউ লজ্জিত না। তারা নিজেদের মধ্যে, নিঃশব্দে কথা বলাবলি করছে, হাসাহাসি করছে। তাদের সুবর্ণমণ্ডিত যৌবনোচ্ছল শরীরগুলো যেন বিবসনা সুন্দরীদের মতো, আমার সামনে জীবন্ত প্রতিমাবৎ আচরণ করছে। তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ আমার খুব স্বাভাবিক লাগছে না। আমি বুঝতে পারছি, আচ্ছন্নতার মধ্যে একটা মুগ্ধতা আমার প্রাণের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। নানা বয়সের এই বিবাহিতা নারীরা কী করছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তারা আমার খুবই নিকটে, তথাপি যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। একটা তীব্র গন্ধ আমার ঘ্রাণকে অতিমাত্রায় রুদ্ধ করে তুলতে লাগল।

তারপরে, আবার তারা পরস্পরকে জড়িয়ে কান্নাকাটি শুরু করল। তাদের দীর্ঘ কালো কেশ আলুলায়িত, শাড়ির কোনো স্থিরতা রইল না। এতক্ষণের প্রস্তুত তরল পদার্থ তারা পাথরের পাত্র ভরে পান করল। সকলেই পান করল, এবং ক্রমে তাদের মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে লাগল। তারা সকলেই যেন যন্ত্রণায় ছটফট করে, কুঁকড়ে, বুক চাপড়াতে লাগল। সকলের আগে, সাত-আট বছরের বালিকাটি প্রায় নগ্নাবস্থায় সম্পূর্ণ স্থির হয়ে গেল এবং তার সোনার মতো শরীর নীলবর্ণ ধারণ করল। একে-একে সকলের দশাই একরকম হল। আমার চোখের সামনে সাতটি বিভিন্ন বয়সের বালিকা, কিশোরী, যুবতী, চোখ বুজে মৃতবৎ পড়ে রইল এবং সকলের বর্ণই নীল হয়ে উঠল।

সহসা একতারার ঝংকার শুনে চমকে উঠলাম, এবং মুহূর্তেই আমার চোখের সামনের দৃশ্য অপসারিত হল। দেখলাম, আমি একটি অন্ধকার ঘরে ভূতগ্রস্তের মতো, যেন সদ্য স্বপ্ন ভেঙে

BanglaBook.org

জেগে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কেবল একটা চামচিকা ফরফর করে আমার চারপাশ প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল, তৎক্ষণাৎ ঘরের বাইরে এলাম। সরু দালানে পা দিতেই, দক্ষিণের বড় দালানে নজর পড়ল। ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে, সেখানে ভোরের আলোর ইশারা চোখে পড়ছে। একতারার শব্দও ওদিক থেকেই আসছে। আমি দ্রুত পায়ে বড় দালানে গেলাম এবং দেখলাম, কড়ি বৈরাগী দালানের বড় দরজার সামনে বসে একতারা বাজিয়ে গান করছে। তার চোখ বোজা, সে আমাকে দেখতে পেল না। তার গানের কথাগুলো শুনলাম :

'আমার রাইবিনোদিনী,
সখী সঙ্গে যাবে মথুরা
এ বৃন্দাবন গোকুল রাইগোপিনী হারা।...'

আমি প্রায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে তার গান শুনলাম। আবার বড় দালানের ভেতর দিয়ে বাঁ-দিকে তাকালাম। আলো নেই, কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই; সাতটি স্বর্ণপ্রতিমাবৎ নারী তো দূরের কথা। অথচ সারারাত আমার একভাবে দাঁড়িয়ে কেটে গেছে।

আমি আমার শোবার ঘরের চেহারা দেখবার জন্য কৌতূহলিত হয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে বড় দালান পেরিয়ে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম, রাত্রের সেই ঘর। হ্যারিকেন তেমনি কমানো। আমি যেখান দিয়ে মশারি ফাঁক করে বেরিয়েছিলাম, সেখানে মশারি এখনো তেমনি আলগা করা। আমার চোখের সামনে সেই বালিকার মূর্তি ভেসে উঠল। তারপরে বাকি কজনের মূর্তিও। আমি অভাবিত বিস্ময় নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলাম না। মনে হল চোখদুটো জ্বালা করছে, বুজে আসছে। আমি মশারির মধ্যে গিয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসলাম। রাত্রের সমস্ত কথাই মনে পড়ল, যদিচ কোনো কূলকিনারাই পাচ্ছি না এবং এখন সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অবাস্তব আর অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আমি উত্তরের দরজা খুলে, বাথরুমে গিয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ঘরে গিয়ে দেখলাম, মশারি তোলা হয়ে গেছে। প্রাণনিধিবাবু বসে আছেন খাটের ওপর। জিজ্ঞেস করলেন, 'রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল?'

আমি নির্দ্বিধায় বললাম, 'প্রথম রাতে তেমন হয় নি। নতুন জায়গা তো। তাই বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল!'

প্রাণনিধি এ-বিষয়ে আর কোনো কথা না বলে, অন্য কথা বললেন, 'তা হলে চলুন একটু কিছু খেয়ে ঘুরে আসা যাক।'

আমি বললাম, 'চলুন।'

আমরা দুপুর পর্যন্ত ঘুরে এসে স্নান খাওয়া-দাওয়া করলাম। স্বভাবতই রাত্রে ঘুম হয় নি বলে দিনের বেলা ঘুম পেল এবং আবার সেই ঝুমঝুম শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। শব্দ ছাড়া দিনের বেলা কিছু দেখতে পেলাম না। কেবল নিচের দালানে গিয়ে সেই শব্দ হারিয়ে গেল এবং কড়ি বৈরাগীর একতারার গান শোনা গেল।

এ-বিষয়ে প্রাণনিধিবাবুকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও পারলাম না। আরো একটা অবাক লাগল, তিনি তাঁর সংগ্রহশালা একবারও আমাকে দেখাবার কথা বললেন না।

রাত্রে ঘুমাতে যাবার পরে আবার সেই বালিকার আবির্ভাব ঘটল এবং গতরাত্রের মতোই হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল। আজ যেন আমার নিশিঘোরের কৌতূহলই বেশি। আজো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাত সোনার প্রতিমার সেই একই আচার-আচরণ এবং নিদ্রাভিভূতা অবস্থায় নীল

BanglaBook.org

হয়ে যেতে দেখলাম কিন্তু তার আগেই আমি ব্যাকুলভাবে বলে উঠলাম, 'তোমরা কে? তোমরা কারা? তোমরা কী করছো?...'

জবাবে আমি কড়ি বৈরাগীর একতারার ঝংকার শুনলাম এবং অন্ধকার দেখলাম।

বাইরে সেই ভোরের আলো।

ঘুম ভাঙল তেমনি বেলাতেই। আজ আমার কলকাতা ফেরার দিন। অথচ সাতটি স্বর্ণ-প্রতিমার আকর্ষণ যেন কিছুতেই কাটাতে পারছি না। মনে হচ্ছে সারাজীবন দুপুর ও রাত্রিগুলোর অন্ধকারে আমি সাত প্রতিমার সান্নিধ্য খুঁজে ফিরি।

কিন্তু সে-কথা প্রাণনিধিবাবুকে বলতে পারলাম না। তবে আজ বলেই ফেললাম, আপনার সংগ্রহশালাটি দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল।

প্রাণনিধি বললেন, চলুন দেখবেন।

তিনি একগোছা চাবি নিয়ে, দোতালার সরু দালানের মধ্যে সেই তালাবন্ধ ঘরের তালা খুললেন। দরজা খুলে, জানালা উন্মুক্ত করতেই দীর্ঘ টেবিলের উপর নানারকম স্বর্ণ ও রৌপ্য দেখতে পেলাম। নানারকম দামি ও মহার্ঘ্য পাথরও রয়েছে। সবকিছুরই পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পাশে পাশে কাগজের বোর্ডে লেখা আছে। আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। শুধু নেশা নয়, অতি নিষ্ঠা না থাকলে এ-রকম সংগ্রহ কেউ করতে পারে না।

একপাশে, একটা বড় কাঠের বাক্সের ঢাকনা খুলে চমকে উঠলাম। দেখলাম, কতগুলো লাল এবং লালের ওপর কল্কা দেওয়া শাড়ি, তার উপরে স্তূপীকৃত সোনার গহনা। আমার খুবই চেনা গহনা এবং শাড়ি, যা আমি সেই সাত প্রতিমার গায়ে দেখেছিলাম।

আমি প্রাণনিধির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কিসের সংগ্রহ প্রাণনিধিবাবু?

তিনি বললেন, ওগুলো আমাদের পারিবারিক সংগ্রহ, এক ট্রাজেডির সাক্ষী।

আমি ব্যাকুল বিস্ময় ও কৌতূহলে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের ট্রাজেডি?

প্রাণনিধিবাবু একটু চুপ থেকে বললেন, ট্রাজেডিটা ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। আমার প্রপিতামহের সাত বোনকে এক রাত্রে এক বৃদ্ধ কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাত বছর বয়স থেকে কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে তাদের সকলের বয়স ছিল।

প্রাণনিধিবাবু থামলেন।

আমি রুদ্ধশ্বাস হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

তিনি বললেন, কুলীনদের ব্যাপার তো সবই জানেন। কিন্তু ঘটনাটি যদি উনবিংশ শতকের গোড়ায় ঘটত, কী হত জানি না, কিন্তু শেষের দিকের হাওয়া একটু অন্যরকম ছিল। প্রপিতামহের বোনেরা সে বিয়ে মেনে নিতে পারেন নি। সকলেই এক রাত্রে, বিষ খেয়ে একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছিলেন। এসব চিহ্ন তাদেরই।

আমি অপলক চোখে সেই বাকসের শাড়ি আর গহনাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার কানে বাজতে লাগল ঝুমঝুম শব্দ ও চোখের সামনে ভাসল সাতটি স্বর্ণ জীবন্ত প্রতিমা।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমি কাঠের বাকসের ঢাকনা বন্ধ করলাম, শতাব্দীর ওপারের সাতটি প্রাণের যন্ত্রণা আমাকে আহ্বান করছিল। জাতির এক অভিশপ্ত খেলার সেই করুণ চিহ্ন আমি দেখেছি।

দুপুরের খাওয়ার পরেই আমি কলকাতা রওনা হয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

ছক্কা মিয়ার টমটম

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এ মুলুকে রাতবিরেতে বাস ফেল করলে ছক্কা মিয়ার টমটম ছাড়া আর উপায় ছিল না। ঝড়-বৃষ্টি হোক, মহাপ্রলয় হোক, রাতের বেলা ভীমপুর গদাইতলা দশমাইল পিচের সড়কে যদি কষ্ট করে একটু দাঁড়িয়ে থাকা যায়, ছক্কা মিয়ার টমটমের দেখা মিলবেই মিলবে। অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে ঠাহর হবে একচিলতে টিমটিমে আলো। তারপর আলোটা এগিয়ে আসবে, আর এগিয়ে আসবে মেঘের ডাকাডাকি যতই থাক, কানে বাজবে অদ্ভুত এক আওয়াজ টং লং. টং. লং. লং।

বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ চোখে পড়বে কালো এক এক্কাগাড়ি—তেরপলের চৌকা একটা টোপর চাপানো। সামনে কালো এক মূর্তি আর নড়বড় করে দৌড়ানো এক টাট্টু!

মুখে কিছু বলার দরকার নেই। ছক্কা মিয়ার টমটম সওয়ারি দেখামাত্র থেমে যাবে। তখন একলাফে পেছনের তেরপল চালিয়ে চৌকা টোপরে ঢুকলেই নিশ্চিন্ত। আবার টলতে টলতে চলতে থাকবে ছক্কা মিয়ার টমটম—টং ... লং..... টং লং।

টমটম কথাটা এসেছে ইংরেজি 'ট্যান্ডেম' থেকে—যে গাড়ির সামনে কয়েক সার ঘোড়া যেত। কিন্তু ভীমপুরের ছক্কা মিয়ার এক্কাগাড়ির ঘোড়া মোটে এক। তবু আদর করে লোকে নাম দিয়ে দিয়েছিল টমটম।

ছক্কা মিয়ার চেহারাটি কিন্তু ভারি বদরাগী। ঢ্যাঙা, টিঙটিঙে রোগা, একটু কুঁজো গড়ন। লম্বাটে মুখের বাঁকানো নাকের তলায় পেল্লায় গোঁফ। চামড়ার রঙ রোদপড়া তামাটে।

তেমনি তার টাট্টুও। যেমন মনিব, তেমনি ঘোড়া। হাড়-জিরজিরে লম্বাটে গড়ন। ঠ্যাং চতুষ্টয় যেন চারখানি কাঠি। মাথাটা দেখে সময় সময় ঠাহর করা কঠিন, এই প্রাণীটি সিংঙ্গি, না প্রকৃত একটি ঘোড়া। হ্রেষাধ্বনি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
১৯৩০--

জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে। শৈশব থেকেই সাহিত্য চর্চার পরিবেশ পেয়েছেন। ১৯৫০-৫৬ সাল সময় পরিসরে অলকাপ থিয়েটার দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ষাটের দশকের প্রথমভাগে পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রচুরসংখ্যক উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন। লিখেছেন প্রবন্ধও। *রানীঘাটের বৃত্তান্ত*, *তৃণভূমি*, *অলীক মানুষ* তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস।

করলেই পিলে চমকে ওঠে। ভীমপুর বাজারের তাবৎ নেড়িকুকুর দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায় লেজ গুটিয়ে।

লোকে আজকাল রাস্তা চলতে বাস-রিকশাই পছন্দ করে। ছক্কা মিয়ার টমটম চড়লে হাড়মাংস দলা পাকাতে থাকে বলেও না। কালের রেওয়াজ আসলে।

কিন্তু ওই-যে বলেছি, রাতবিরেতে বাস ফেল করলে তখন উপায়? ছক্কা মিয়া এটা বোঝে এবং দিনে তার টমটমের বাহনটিকে নিয়ে বনজঙ্গল বা ঝিলে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। রাতের বেলা ছোট্ট বাজারের চৌরাস্তায় শিরীষ গাছের তলায় ঘাপটি পেতে বসে থাকে। পাশেই টমটম রেডি।...

সেবার পুজোর সময় কলকাতা থেকে ছোটমামার সঙ্গে আসছি। মাঝপথে একখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল তো রইল। আর নড়ার নাম নেই। ব্যাপার কী? না—আগের স্টেশনে মালগাড়ি বেলাইন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর যখন ট্রেনের চাকা গড়াল, ছোটমামা বেজার মুখে বললেন, 'বরাতে আবার হতচ্ছাড়া ছক্কা মিয়ার টমটম আছে। বাপ্‌স্!'

ওই টমটমে কখনও চাপি নি। তাই কথাটা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। বললুম, 'খুব মজা হবে, তাই না ছোটমামা?'

ছোটমামা দাঁতমুখ খিচিয়ে বললেন, 'মজা হবে! বুঝবে ঠ্যালাটা'খন।'

ঠ্যালাটা কিসের বুঝলাম না আগেভাগে। দেখলাম, ছোটমামা ট্রেনের জানলা দিয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে বারবার যেন আকাশ দেখছেন। একটু পরে বললেন, 'খুব ঝড়বৃষ্টি হবে! কার মুখ দেখে যে বেরিয়েছিলাম। বড়দা অত করে বললেন, তবু থাকলুম না। ছ্যা ছা, আমার কী আক্কেল!'

ভীমপুর স্টেশনে যখন নামলুম, তখনও কিন্তু ঝড়বৃষ্টির পাত্তা নেই। রাত একটা বেজে গেছে। বাজার নিশুতি। চৌমাথায় শিরীষতলায় গিয়ে দেখি, ছক্কা মিয়ার টমটম দাঁড়িয়ে আছে। বলা-কওয়া নেই, দরদস্তুর নেই, ছোটমামা টমটমের পেছনদিকে তেরপল তুলে ঢুকে ডাকলেন, 'হাঁ, করে দেখছিস কী? উঠে আয়। এক্ষুনি একগাদা লোক এলে ভালো জায়গা দখল করে ফেলবে যে।'

ভেতরে খড়ের পুরু গাদার ওপর তেরপল পাতা। কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ। অন্ধকারও বটে। যেন এক গুহায় ঢুকেছি। সামনে সরে গিয়ে ছোটমামা পর্দাটা ফাঁক করে রাখলেন। একটু পরে আরও জনা-দুই লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে এক ঠাসাঠাসি অবস্থা।

আর তারপরই আচমকা চিক্কুর ছেড়ে ছেড়ে মেঘ ডাকল এবং শনশন করে এসে গেল একটা জোরালো হাওয়া। ছোটমামা বললেন, 'ওই যা বলেছিলুম। হল তো?'

ছক্কা মিয়া সামনের আসন থেকে ঘোষণা করল, 'আরাম করে বসুন বাবুমশাইরা! এবার রওনা দিই।' তার ঘোড়াটাও মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিঁহিঁহি ডাক ছেড়ে যখন পা বাড়াল, তখন টের পেলাম কেন ছোটমামা 'বাপ্‌স্' বলে মুখখানা তুম্বো করেছিলেন।

সত্যি 'বাপ্‌স্'। হাড়গোড় ভেঙে যাবার দাখিল। বাইরে হাওয়ার হইচই আর মেঘের হাঁকডাক যত বাড়ছে, ছক্কা মিয়ার ঘোড়াটাও তত যেন তেজি হয়ে উঠছে। একটু পরেই চড়বড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টোপরের তেরপলে পড়তে শুরু করল। ছোটমামা ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিলেন। আমি তখন অবাক। ছক্কা মিয়া বাইরে বসে চাবুক হাঁকাচ্ছে। ওর বৃষ্টির ছাট লাগবে না?

রাস্তাটা ঘুরে রেললাইন পেরুলে দুধারে বিশাল আদিগন্ত মাঠ। ফাঁকা জায়গায় ঝড়বৃষ্টিটা ছক্কা মিয়ার টমটমকে বেশ বাগে পেল। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি উল্টে গিয়ে

BanglaBook.org

রাস্তার ধারের গভীর খালে নাকানিচুবানি খাবে। আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেও ভাববার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, টমটম সমান তালে নড়বড়িয়ে টলতে টলতে চলেছে। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টির শব্দের ভেতর শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত এক শব্দ—টং লং...টং লং.. টং লং।

কখনও ছক্কা মিয়ার টাট্টুঘোড়া বিকট চিঁহি করে চেঁচিয়ে উঠছে। তারিফ করে আমার পেছন থেকে এক সওয়ারি বলে উঠলেন, 'পক্ষিরাজের বাচ্চা!'

এতক্ষণে তেরপলের টোপর থেকে ফুটো দিয়ে জল চোঁয়াতে থাকল। সওয়ারিরা নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সরবে কোথায়? বেহদ্দ ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছিল জামাকাপড়। একসময় ছোটমামা হঠাৎ বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললেন, 'আহ্! হচ্ছে কী, হচ্ছে কী মশাই? আমার ওপর পড়ছেন কেন?'

'আপনার ওপর আমি পড়লুম, না আপনি আমার ওপর পড়লেন?'

'কী বাজে কথা বলছেন? আমায় ঠাণ্ডা করে দিয়ে আবার তক্ক? আপনি মানুষ, না বরফ?'

'আমি বরফ? আপনিই তো বরফ। ইস। কী ঠাণ্ডা! হাড় অব্দি জমে গেল দেখছেন না!'

আমার পিছনের সওয়ারি চাপা খিকখিক করে হেসে আমার কানের ওপর বলল, 'ঝগড়া বেধে গেছে। বরাবর যায়, বুঝলেন তো মশাই? ছক্কা মিয়ার টমটমের এই নিয়ম। খিকখিক খিকখিক।'

এমন বিদঘুটে হাসি কখনও শুনি নি। কিন্তু এঁর শ্বাসপ্রশ্বাসও যে বরফের মতো হিম। বললুম, 'ইস! একটু সরে বসুন না। বড্ড ঠাণ্ডা করে যে!'

লোকটা ভারি অদ্ভুত! সে ওই বিদঘুটে খিকখিক খিক হাসতে হাসতে আরও যেন ঠেসে ধরল আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ছোটমামা! ছোটমামা!'

কিন্তু ছোটমামার কোনো সাড়া পেলাম না। টোপরের ভেতরটা ঘন অন্ধকার। ফের ডাকলুম, 'ছোটমামা! কোথায় তুমি?'

লোকটা সেই খিক খিক হাসির মধ্যে বলল, 'আর ছোটমামা বড়মামা! মামারা এখন রাস্তায় পড়ে কুস্তি করছে।'

হতভম্ব হয়ে হাত বাড়িয়ে ছোটমামাকে খুঁজলুম। সুটকেসটা হাতে ঠেকল। কিন্তু সত্যিই ছোটমামা নেই। তারপর পেছনের দিকে চোখ পড়ল। ওদিককার পর্দাটা যেন ফর্দাফাঁই। বৃষ্টির ছাট এসে ঢুকছে। আমি প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বললাম, 'ছক্কা মিয়া! ছক্কা মিয়া! গাড়ি থামাও! গাড়ি থামাও!'

পেছনের সওয়ারি ফের সেই বিদঘুটে হাসি হেসে উঠল। এবার আমি সামনের পর্দা ঠেলে সরিয়ে ছক্কা মিয়ার ভেজা জামা খামচে ধরলুম। 'গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও বলছি!'

এতক্ষণে যেন ছক্কা মিয়া আমার কথা শুনতে পেল। ঘুরে বলল, 'কী হয়েছে বাবুমশাই?'

'ছোটমামা পড়ে গেছেন কোথায়।'

ছক্কা মিয়া বলল, 'বালাই ষাট! পড়বেন কোথায়? ঠিকই আছেন। খুঁজে দেখুন না।'

'নেই। তুমি গাড়ি থামাবে কিনা বলো!'

'সামনে একটা মন্দির আছে! সেখানে থামাব।' ছক্কা মিয়া চাবুক বেড়ে ঘোড়াটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে বলল, 'যেখানে-সেখানে থামলে ঝড়বৃষ্টিতে কষ্ট পাবেন বাবুমশাই। বুঝলেন না? ওইখানে থামিয়ে আপনার ছোটমামাকে খুঁজবেন বরঞ্চ।'

মন্দিরের আটচালার সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ছক্কা মিয়ার পাশ দিয়ে

BanglaBook.org

লাফ দিলাম। তারপর আটচালায় ঢুকে পড়লাম। বুদ্ধি করে ছোটমামার সুটকেস আর মামার কিটব্যাগটাও দুহাতে নিয়েছিলাম।

কিন্তু আটচালায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, ছক্কা মিয়ার টমটম বৃষ্টির মধ্যে আচমকা গড়াতে শুরু করেছে। ঘোড়াটা চিহিঁহিঁ ডাক ডেকে তেমনি নড়বড়ে পায়ে দৌড়তে লেগেছে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। মুখে কথাটি পর্যন্ত ফুটল না। ভারি অদ্ভুত লোক তো ছক্কা মিয়া!

এখন ঝড়টা প্রায় কমে এসেছে। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। নির্জন আটচালায় দাঁড়িয়ে আছি। প্যান্টশার্ট ভিজে চবচব করছে। প্রায় কেঁদে ফেলার আবস্থা আর কি!

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুতের আলোয় দেখি, কে যেন আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'কে--কে?'

ছোটমামার সাড়া এল। 'অন্তু নাকি রে?'

আমি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললুম, 'হ্যাঁ। তোমার কী হয়েছিল ছোটমামা?'

ছোটমামা আটচালায় ঢুকে বললেন, 'কী হবে আবার। যা হবার, তাই হয়েছিল। তবে ব্যাটাকে এবার যা জব্দ করেছি, আর কক্ষনো ছক্কা মিয়ার টমটমে ভুলেও চড়তে আসবে না।'

ছোটমামা আমার কাছে সুটকেস দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'জানতুম, তুই ঠিকই নেমে পড়ে আমার অপেক্ষা করবি কোথাও।'

'কিন্তু লোকটা কোথায় রইল?'

হাসলেন ছোটমামা। 'ওকে তুই লোক বলছিস এখনও। ওটা কি লোক নাকি?'

'তবে কে?'

'বুঝলিনে? ওর ঘাড়ে একটা চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দে, তাহলে বুঝবি। থাকগে, এখন রাতবিরেতে ও-নিয়ে আলোচনা করতে নেই। ব্যাপারটা কী জানিস অন্তু? রাতবিরেতে অমন দু-একজন সওয়ারি ছক্কা মিয়ার টমটমে উঠে পড়বে। তারপর কী করবে জানিস? অন্ধকারে ঘাড় মটকানোর তাল করবে। যেই টের পেয়েছি আমার পেছনের লোকটার মতলব কী, অমনি ওকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যাটা পড়বার সময় অ্যায়সা হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে আমিও ওর সঙ্গে তেরপলের ফাঁক দিয়ে নিচে পড়েছি।'

'তারপর? তারপর ছোটমামা?'

'তারপর আর কী? ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় কুংফু জুডো যা সব অ্যাদ্দিন কষ্ট করে শিখেছি, চালিয়ে গেলুম। এক প্যাঁচে ওকে এমন করে ছুড়লুম যে একেবারে বিশ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণ কোনো বাজ-পড়া ন্যাড়া গাছের ডগায় বসে হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছে।' ছোটমামা হাসতে হাসতে গায়ের জামা খুলে নিঙড়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'ঘণ্টা তিনেক কাটাতে পারলেই ফার্স্ট বাস পেয়ে যাব। জামাটা নিঙড়ে নে। ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে মাথা মুছে ফেল। বাপ্‌স্!'

আমি শুধু ভাবছিলুম, তাহলে আমার পেছনকার সেই সওয়ারিও কি লোক নয়, সেই লোকটিও কি আমার ঘাড় মটকানোর তালে ছিল? অন্য লোকটার মতো?

আমার মুখ দিয়ে ছোটমামার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে গেল, 'বাপ্‌স্!...'

ছক্কা মিয়ার টমটমে তারপর আর ভুলেও চাপার কথা ভাবতুম না। কিন্তু বছর দশেক পরে, যখন কিনা আমি পুরোপুরি সাবালক, একরাতে ভীমপুর স্টেশনে নেমে শুনলুম, লাস্ট বাস

BanglaBook.org

চলে গেছে।

স্টেশনবাজার তখন নিঃঝুম। সময়টা শীতের। আকাশে একটুকরো চাঁদও আছে। কিন্তু কুয়াশার ভেতর তার দশা বেজায় করুণ। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল। শীতের রাত বারোটায় চা-ওলা সবে ঝাপ ফেলার জোগাড় করছিল, আমাকে দেখে বুঝি তার দয়া হল। এক কাপ চা খাইয়ে দিল। শেষে বলল, 'বাবুমশাই তাহলে যাবেন কিসে গদাইতলা?'

'কিসে আর যাব? বরং দেখি যদি ওয়েটিংরুমে রাতটা কাটানো যায়।'

চা-ওলা মুচকি হেসে বলল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।'

ছক্কা মিয়ার টমটমের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। সেবার ঝড়বৃষ্টি ছিল, ছোটমামাও বড় গল্পে-মানুষ ছিলেন।

হন হন করে চৌমাথায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, শিরীষতলায় আগুন জ্বেলে বসে আছে সেই আদি অকৃত্রিম ছক্কা মিয়া। পাশেই তার টমটম তৈরি। ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। শীত বাঁচাতে তার পিঠে একটুকরো চটের জামা। বললুম, 'গদাইতলা যাবে নাকি ছক্কা মিয়া?'

ছক্কা মিয়া ইশারায় টমটম চড়তে বলল।

আজ আর কোনো সওয়ারি এল না দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। টমটম তেমনি নড়বড় করে চলতে শুরু করল। ঘোড়াটাও বিকট চিঁহিহি ডাকতে ভুলল না। অবিকল সব আগের মতোই আছে। এমনকি ছক্কা মিয়ার পেল্লায় গোঁফটারও ভোল বদলায় নি। আর সে অদ্ভুত ঘণ্টার শব্দ, টং লং. টং লং. টং লং।

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তেরপলের ঘেরাটোপের ছেঁদা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে উত্ত্যক্ত করছিল। জড়সড় হয়ে কোণা ঘেঁষে রইলুম। সামনেকার মোটা ছেঁদা দিয়ে বাইরে কুয়াশা-মাখানো জোছনায় ঝিমধরা মাঠঘাট চোখে পড়ছিল। গাছগুলো আগাপাছতলা কুয়াশার আলোয়ান চাপিয়েছে; আর মাথায় পরেছে কুয়াশার টুপি। টুকরো চাঁদখানা ছেঁড়া ঘুড়ির মতো একটা ন্যাড়া তালগাছের ঘাড়ে আটকে গেছে দেখতে পাচ্ছিলুম।

মাইলটাক চলার পর রাস্তার ধার থেকে কে বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল, 'রোখো, রোখো!' অমনি টমটম থেমে গেল। ঘোড়াটাও স্বভাবমতো সামনে দু-ঠ্যাং তুলে একখানা চিঁ-হিঁ ছাড়ল। তারপর ছক্কা মিয়ার গলা শুনুলম। 'দারোগাবাবু নাকি? সেলাম, সেলাম।'

মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিশাল এক ওভারকোট পরা মূর্তি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোনো এক দারোগাবাবু। বললেন, 'রোসো।' সাইকেলখানা তুলে দিলেন। তারপর যখন টোপরের ভেতর ঢুকলেন, মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। আমাকে টের পেয়ে চমকানো গলায় বলে উঠলেন, 'কে? কে?'

বললুম, 'আমি।'

'আমি? আমি কি মানুষের নাম হয় নাকি?' বলে দারোগাবাবু টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিলেন। নামধাম বলতেই হল। পুলিশের লোক বড় কথা। সব শুনে উনি বললেন, 'আমি আপনাদের গদাইতলা থানার চার্জে। কিন্তু আপনাকে কখনও দেখি নি।'

বেগতিক দেখে বললুম, 'কলকাতায় আছি বহুকাল, তাই দেখেন নি। তা আপনার নামটা জানতে পারি স্যার?'

'বংকুবিহারী রায়।'

'আসামি ধরতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?' ওঁকে খুশি করার জন্যই বললুম।

BanglaBook.org

বংকু দারোগা জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'হুম! ব্যাটা এক দাগী বেগুনচোর ভীষণ ভোগাচ্ছে। আজ একটা বেগুনক্ষেতে দুজন সেপাই নিয়ে ওত পেতে ছিলুম। তাড়া খেয়ে সটান একটা তালগাছের ডগায় উঠে গেল। তাকে আর নামাতে পারলুম না। তখন সেপাই দুজনকে তালগাছের গোড়ায় বসিয়ে রেখে এলুম। আসতে আসতে হঠাৎ সাইকেলের বেয়াদপি।'

দাগী বেগুনচোর এই শীতকালে সারারাত তালগাছের ডগায় বসে আছে! কিন্তু তার জন্য নয়, হতভাগা সেপাই দুজনের কথা ভেবে আমার উদ্বেগ হচ্ছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আহা!'

'আহা মানে?' আমাকে ফের টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ নজরে দেখে বংকু দারোগা বললেন, 'হুম! আপনি মশাই এই মড়া-বওয়া গাড়িতে এতরাতে চাপলেন যে! আপনি জানেন, আজকাল সওয়ারি জোটে না বলে ছক্কা মিয়া মড়া বয়ে নিয়ে যায় গঙ্গার ঘাটে!'

'বলেন কী! তাহলে তো ভয়ের কথা।' অবাক হয়ে বললুম, 'সত্যি ভয়ের কথা। আগে জানলে...'

কথা কেড়ে বংকু দারোগা বললেন, 'হয়তো জেনেশুনেই চেপেছেন। কিচ্ছু বলা যায় না।'

'কেন এ কথা বলছেন?'

'বলছি আপনার চেহারা দেখে। এমন শুঁটকো রোগা চিমসে বাসি মড়ার মতো লোক সচরাচর দেখা যায় না কি না।'

এবার, আমার খুব রাগ হল। 'কী বলতে চান আপনি?'

'রাতবিরেতে আজকাল ছক্কা মিয়ার টমটমে কে জ্যান্ত, কে মড়া বোঝা যায় না মশাই!'

হাত বাড়িয়ে বললুম, 'এই আমার হাত! পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমি মড়া না জ্যান্ত!'

বংকু দারোগা আমার হাত সরিয়ে দিলেন জোরে। 'বাপস্! এ যে বেজায় ঠাণ্ডা!'

'ঠাণ্ডা হবে না? শীতের রাতে এই মাঠের মধ্যে হাত কি গরম থাকবে?'

'না মশাই। এমন রাতে বিস্তর সিঁদেল চোরের হাত পাকড়েছি। তারা কেউ এমন ঠাণ্ডা ছিল না।'

'কী ? আমায় সিঁদেল চোর বললেন!'

বংকু দারোগা গলার ভেতর থেকে বললেন, 'সিঁদেল চোরের ভূত হতেও পারেন। কিচ্ছু বলা যায় না। তখন আহা বলা শুনেই সন্দেহ জেগেছে।'

আর সহ্য হল না। খাপপা হয়ে চেঁচালুম, 'পুলিশ হোন, আর যাই হোন, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি মশাই।'

দারোগাবাবু ফের মুখের ওপর টর্চ জ্বেলে বললেন, 'উহুঁহুঁ। বড্ড এগিয়ে এসেছেন। সরে বসুন! সরে বসুন বলছি!'

মুখের ওপর টর্চের আলো কারই বা সহ্য হয়! 'টর্চ নেভান!' বলে টর্চটা ঠেলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলুম। টর্চটা নিভে গেল। এবং কোথায় ছিটকে পড়ল। কিন্তু এটাই বোধ হয় ভুল হল। আর বংকু দারোগা বিকট গলায় 'ভূত! ভূত!' বলে চিক্কু ছেড়ে আমাকে এক রামধাক্কা মারলেন। টোপরের একপাশের জরাজীর্ণ তেরপলের ওপর কাত হয়ে পড়লুম। তেরপলটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল এবং টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলুম।

BanglaBook.org

কানের পাশ দিয়ে চাকা গড়িয়ে গেল প্রচণ্ড বেগে। পলকের জন্য দেখলুম কুয়াশা-ভরা নীলচে জোছনায় কালো টমটম দূরে সরে যাচ্ছে। ভেসে আসছে অদ্ভুত এক শব্দ টং লং.. টং লং...টং লং !

ভাগ্যিস, রোডস দফতরের লোকেরা রাস্তা মেরামতের জন্য কিনারায় বালির গাদা রেখেছিল। আঘাত টের পেলুম না। সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। লোকেরা লণ্ঠন লাঠিসোটা নিয়ে বেরিয়ে এল। তখন ঘটনাটা তাদের আগাগোড়া বলতে হল।

কিন্তু সব শুনে ওরা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একজন বলল, 'কী বলছেন বাবু? ছক্কা মিয়ার টমটম পেলেন কোথায়? কাল ভীমপুরের কাছেই একটা ট্রাকের ধাক্কায় ছক্কা মিয়া আর তার ঘোড়াটা মারা পড়েছে যে ! ভাগ্যিস, টমটমে একটা মড়া ছিল শুধু। সঙ্গের লোকেরা বাসে চেপে গঙ্গার ধারে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড দেখুন, মড়াটা একেবারে আস্ত ছিল। তুলে নিয়ে গিয়ে ভালোয় ভালোয় চিতেয় তুলতে পেরেছে।'

বংকু দারোগার ওপর সব রাগ সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেল। বরং উনি আমাকে বাঁচিয়েই দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর নিজের ভাগ্যে কী ঘটল কে জানে ! আহা বেচারা !

কী ঘটল, তা পরদিন শুনলুম। বংকুবাবু তখন হাসপাতালে। লোকে বলছে, আসামি ধরতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে কোমরের হাড় ভেঙেছে। সাইকেলও অক্ষত নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো আমি জানি। তবে যাই হোক, আমার ওপর যেটুকু ফাঁড়া গেছে, তার জন্য দায়ী স্টেশন বাজারের সেই ধড়িবাজ চা-ওলা। কেমন হেসে বলেছিল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।' সব জেনেশুনেও কী অদ্ভুত রসিকতা।

অবশ্য এমনও হতে পারে, সে বলেছিল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারতেন।' আমিই হয়তো ভুল শুনেছিলুম। ক্রিয়াপদের গোলমাল স্রেফ !

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পানিমুড়ার কবলে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা মস্তবড় পুকুরের ওপাশে একটু একটু জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় মুসলমানদের একটা কবরস্থান। তার পর থেকে বেশ ঘন জঙ্গল।

সে-বছর আমার বাবা কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন আলিপুর দুয়ার। আমাদের বাড়ি পাওয়া গেল শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। বছরের মাঝখানে আমাকে চলে আসতে হল বলে এখানকার স্কুলে ভর্তি হতে পারলাম না। নতুন বছরে ভর্তি হতে হবে।

তাই দুপুরবেলা আমার কিছুই করার থাকে না। বাবা অফিসে চলে যান, মা খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন। আমার একদম ঘুমোতে ইচ্ছে করে না দুপুরে। একটাও নতুন গল্পের বই নেই, আর পড়ার বই তো বেশিক্ষণ ভালো লাগে না পড়তে। তাই আমি চুপিচুপি বাড়ির পেছনে পুকুরটার পাড়ে চলে যাই।

একা একা জঙ্গলে যেতে আমার ঠিক সাহস হয় না। এখানকার জঙ্গলে বাঘ আছে, কিন্তু আমার তো বন্দুক নেই। আমার তীর-ধনুক আছে অবশ্য, তা দিয়ে বাঘ মারা যায় না। তবু আমি জঙ্গলের মধ্যে একটু একটু গেছি দু-একবার। কিন্তু ঐ কবরখানাটার পাশ দিয়ে যেতেই বেশি গা ছমছম করে। বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ বলেছিল, ঐ কবরখানায় নাকি ভূত আছে।

আমি এদিক-ওদিক তাকাই, কখনো ভূত দেখতে পাই না। কিন্তু কীরকম যেন একটা বোটকা গন্ধ পাই। আর থাকতে ইচ্ছে করে না, একছুটে ফিরে আসি। আমার যদি আর একটা বন্ধু থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দুজনে মিলে ভূত দেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখানে এসে এখনো যে আমার কোনো নতুন বন্ধু হয় নি। একা একা ভূত দেখতে যেতে বড্ড খারাপ লাগে।

আমি তাই পুকুরটার ধারে গিয়ে বসে থাকি। ছোট ছোট

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৩৪—
ফরিদপুরে জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। কর্মজীবনের শুরু হয় প্রাইভেট টিউশনির মাধ্যমে। ষাটের দশকের শুরুতে কবিতা লিখে সাহিত্য চর্চার শুরু। কবি হিসাবে বিশিষ্ট শারদীয় *দেশ* পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ উপন্যাস প্রকাশের মধ্য দিয়ে কথাসাহিত্য চর্চার শুরু। নীললোহিত এবং সনাতন পাঠক তাঁর ছদ্মনাম। *সেই সময়, একা এবং কয়েকজন, পূর্ব পশ্চিম, প্রথম আলো* তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। *গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প, শাহজান ও তার নিজস্ব বাহিনী* ছোটগল্পের বই।

ইটের টুকরো বা পাথর ছুড়ে মারি জলের মধ্যে।

পুকুরটা বিরাট বড়, আর এখন বর্ষাকাল বলে কানায়-কানায় ভরা। দুপুরবেলা পুকুরটা দেখলে খুব গম্ভীর মনে হয়। কোথাও কোনো লোকজন নেই, আমি শুধু একা।

এক-এক সময় আমার মনে হয়, আমাকে যেন কেউ দেখছে। যদিও কোথাও আর কেউ নেই, তবু যেন মনে হয়,আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ আমাকে লক্ষ করছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখি, আর কাউকে দেখতে পাই না।

এই পুকুরটায় বেশ মাছ আছে। মাঝে মাঝে তারা ঘাই মারে, অমনি জলের ওপর গোল গোল ঢেউ ওঠে। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখলাম, পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জল ফুলে ফুলে উঠছে। যেন ঠিক ঐখানটায় কোনো বিরাট কিছু প্রাণী দাপাদাপি করছে। এত বড় তো মাছ হতে পারে না! কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

তারপর থেকে আমি সবসময় পুকুরের মাঝখানটায় তাকিয়ে থাকি। কিন্তু কিছু আর দেখা যায় না। আবার পুকুরটা শান্ত আর গম্ভীর।

পুকুরের ঘাটটা অনেক দিনের পুরনো। পাথর দিয়ে তৈরি, কিন্তু কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা জায়গাগুলোয় গর্ত হয়ে সেখানে জল জমে থাকে, সেই জলেও ছোট ছোট মাছ দেখা যায়।

আমি ঘাটের কাছে এসে সেই মাছগুলো ধরার চেষ্টা করি। আমার তো বড়শি নেই, আর বড়শি দিয়ে আমি মাছ ধরতেও জানি না। তাই হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি। এক ধরনের মাছ, জলের তলায় মাটিতে চুপচাপ শুয়ে থাকে—ওগুলোর নাম বেলেমাছ। সেই মাছগুলো আমাকে কাছাকাছি দেখেও ভয় পায় না। মাছগুলো অবশ্য দারুণ চালাক। আমি আস্তে আস্তে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করি, ওদের একেবারে গায়ের কাছে হাত দেবার পর সুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়। পাথরের তলার মধ্যেও অনেকখানি গর্ত আছে, সেইখানে লুকিয়ে পড়ে।

মাছ ধরার ঝোঁকে আমি জলের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় কে যেন ডাকল, এই বাবলু!

আমি চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই তো! তা হলে আমায় কে ডাকল? স্পষ্ট শুনলাম, অনেকটা ঠিক আমার মায়ের মতন গলা। মা তো ঘুমোচ্ছেন, তা হলে কে ডাকল! খুব কাছ থেকে। মা-ই কি আমাকে ডেকে চট্ করে কোথাও লুকিয়ে পড়লেন?

জল থেকে উঠে এসে আমি ঘাটের চারপাশে খুঁজলাম। কেউ নেই। কাছেই একটা মস্ত কদম ফুলের গাছ, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাও নেই।

অমনি আমার খুব ভয় করতে লাগল। কেউ কোথাও নেই, তা হলে আমায় ডাকল কে? আমি যে স্পষ্ট শুনেছি!

দৌড়ে চলে এলাম বাড়িতে। দোতালায় এসে দেখলাম, মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আমি তবু মাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলাম , মা তুমি কি এই পুকুরঘাটে গিয়েছিলে?

মা তো খুব অবাক। বিছানার উপর উঠে বসে বললেন, কেন, পুকুরঘাটে যাব কেন? তুই বুঝি গিয়েছিলি?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি সেখানে খেলা করছিলাম, মনে হল পেছন থেকে কে আমাকে ডাকল। ঠিক তোমার মতন গলা।

মা বললেন, তুই বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছিস!

BanglaBook.org

—না মা! আমি স্পষ্ট শুনলাম।

মা রেগে গিয়ে বললেন, তুই কেন পুকুরঘাটে গিয়েছিলি একলা একলা? দুপুরবেলা কেউ একলা যায়?

—কেন, কী হয় তাতে?

—না, কক্ষনো দুপুরে একলা জলের ধারে যেতে নেই। আর কোনোদিন যাবি না। পড়াশুনো নেই?

—পড়াশুনো তো হয়ে গেছে!

—তা হলেও যাবি না! খবরদার!

মা আমাকে টেনে নিয়ে তাঁর পাশে শুইয়ে দিলেন। পুকুরধারে যে কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে, মা এ-কথা বিশ্বাসই করলেন না।

বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ প্রায়ই সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আসে। কীসব অফিসের কাজ নিয়ে। মুনাব্বর কাঁ খুব দারুণ দারুণ গল্প বলতে পারে। সে-ই তো আমাকে কবরখানার ভূতের তিনটে গল্প বলেছিল।

সেদিন সন্ধেবেলা আমি মুনাব্বর খাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এই পুকুরটার মধ্যে কত বড় মাছ আছে বল তো? তুমি জান?

মুনাব্বর খাঁ জিজ্ঞেস করল, কেন বল তো খোকাবাবু?

আমি বললাম, একদিন দুপুরবেলা আমি দেখেছিলাম পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জিনিস জলের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। সেটা যদি মাছ হয়, তা হলে নিশ্চয়ই সেটা এই ঘরের সমান হবে।

মুনাব্বর খাঁ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, খোকাবাবু, দুপুরবেলা পুকুরধারে কক্ষনো একলা যেও না। যেতে নেই।

—কেন, গেলে কী হয়?

—অনেক রকম বিপদ হয়। তুমি জান না, এইসব পুরনো পুকুরে পানিমুড়া থাকে?

—পানিমুড়া কী?

—পানিমুড়া জান না? পানিমুড়া হচ্ছে জলের ভূত!

—ধ্যাৎ! জলের মধ্যে আবার ভূত থাকে নাকি?

—ওমা, তুমি পানিমুড়ার কথা শোন নি, এ তো সবাই জানে! পানিমুড়া বড়দের কিছু বলে না, কিন্তু ছোটদের জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়।

—মোনাব্বর খাঁ, তুমি পানিমুড়া দেখেছ?'

—হ্যাঁ, তিনবার দেখেছি। তাদের মাথাটা হয় কুমিরের মতন, আর গা-টা মানুষের মতন। এইসব পুকুর জান তো, খুব পুরনো, আগেকার দিনের রাজাদের আমলের। এইসব পুকুরের মাঝখানে গাদ্দি থাকে।

—গাদ্দি কী?

—গাদ্দি মানে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ চলে গেছে অনেক দূরে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত। যারা পানিতে ডুবে মরে, তারা পানিমুড়া ভূত হয়ে যায়। ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে উপরে উঠে আসে। পানিমুড়াদের সঙ্গে আবার কবরখানার ভূতদের খুব ঝগড়া। পানিমুড়ারা উপরে উঠে এলেই কবরখানার ভূতরা তাড়া করে যায়। আমি একবার দেখেছিলাম একটা পানিমুড়া আর একটা কবরখানা ভূত খুব ঝটাপটি করে লড়াই করছে।

এই সময় মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গল্প হচ্ছে?

BanglaBook.org

আমি বললাম, মা , তুমি পানিমুড়া ভূত দেখেছ কখনো? মুনাব্বর খাঁ দেখেছে!

মা বললেন, বসে বসে বুঝি ভূতের গল্প হচ্ছে এই সন্ধেবেলা! মুনাব্বর, তুমি বাবলুকে বানিয়ে বানিয়ে ওসব গল্প বোলো না। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? ভূত হচ্ছে মানুষের কল্পনা।

মুনাব্বর বলল, না মেমসাব, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি!

মা হেসে বললেন, ছাই দেখেছ!

আমার মায়ের খুব সাহস। মা একদিন রাত্তিরবেলা একা একা কবরখানায় গিয়েছিলেন ভূত দেখার জন্য। কিছু দেখতে পান নি। মাকে দেখে ভূতেরা ভয় পেয়েছিল। বাবা বলেছিলেন, তোমার হাতে টর্চ ছিল তো, সেই আলো দেখে ভূতেরা পালিয়ে গেছে । তুমি অন্ধকারে একবার গিয়ে দেখো তো!

মা বলেছিলেন, ওখানে অনেক সাপখোপ আছে। অন্ধকারে গেলে যদি সাপে কামড়ায়? আমি ভূতের ভয় পাই না, কিন্তু সাপকে ভয় করি।

দু-তিন দিন আমি আর পুকুরধারে যাই নি। কিন্তু আমার মন ছটফট করে, দুপুরবেলা কি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে কারুর! মা ঘুমিয়ে পড়েন, আমার যে ঘুম আসে না! পড়া গল্পের বইগুলিই আরও কয়েকবার করে পড়তে লাগলাম।

তারপর আবার একদিন, মা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম আবার। আজ আমার সঙ্গে একটা ছোট লাঠি। যদি ভূত-টুত আসে তা হলে লাঠি দিয়ে মারব।

পুকুরের কাছে এসে দেখি, ঘাটের উপর একটা লোক বসে আছে। লোকটার গায়ে একটা লাল রঙের ডোরাকাটা গেঞ্জি আর মাথায় এমন টাক যে একটাও চুল নেই। লোকটা জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে জলে ঢেউ তুলছে। সারা গা ভেজা। লোকটা এল কোথা থেকে? আমাদের এই পুকুরে তো বাইরের কোনো লোক স্নান করতে আসে না!

আমি খুব কাছে চলে আসার পর লোকটি পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখল। দেখেই যেন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফ মেরে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। তারপর ডুবে গেল।

আমিও খুব অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা আমাকে দেখে ও-রকম ভয় পেল কেন? আমার হাতের লাঠিটা দেখে?

চোর-টোর নয় তো? যদি চোর হয়, লোকটা তা হলে সাঁতার কেটে পুকুরের ওপাশে উঠে জঙ্গল দিয়ে পালাবে।

আমি জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা সেই যে ডুব দিয়েছে, আর উঠছে না। এতক্ষণ কেউ ডুব দিয়ে থাকতে পারে! আমি মনে মনে এক দুই তিন করে পাঁচশ পর্যন্ত গুনে ফেললাম, তবু লোকটাকে আর দেখা গেল না। এই রে, লোকটা মরে গেল না তো? আমাকে দেখে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে, হয়তো লোকটা সাঁতারই জানে না।

তা হলে কি এক্ষুনি ছুটে গিয়ে লোকজন ডাকা উচিত? কিন্তু আমার কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে? আরও একটুক্ষণ দেখবার জন্য আমি জলের পাশে এসে দাঁড়ালাম। তখন আমার মনে হল, ওটা ভূত নয় তো? ও-ই কি পানিমুড়া ? কিন্তু একদম মানুষের মতন দেখতে। মুনাব্বর খাঁ যে বলেছিল, পানিমুড়ার মুখটা কুমিরের মতন! এ যে একদম মানুষের মতন! শুধু টাক মাথা। শুধু তাই নয়, লোকটা যখন আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল তখন দেখেছি, ওর চোখের ওপর ভুরুও নেই। সারা গায়ে কোনো লোমও নেই। মুনাব্বর নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

মিথ্যে কথা বলেছিল। সে পানিমুড়া কোনোদিন দেখে নি।

তক্ষুণি ফিরে গিয়ে মাকে খবর দেব ভাবছি, এমন সময় জলের মধ্যে একটা হাত উঁচু হয়ে উঠল। শুধু একটা হাত। আমি ভাবলাম, লোকটা এবার উঠে আসবে। তা হলে পানিমুড়া নয়। কোনো চোরই নিশ্চয়ই।

শুধু হাতটাই উঁচু হয়ে রইলো, আর কিছু না। লোকটার মাথাও দেখা গেল না। তারপর মনে হল, সেই হাতটা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই হাতে লম্বা লম্বা আঙুল, তাতে বিচ্ছিরি নোখ। হাতটা ক্রমশ ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

হাতটা ঘাটের অনেক কাছে এসে আঙুল নাড়তে লাগল। ঠিক যেন আমায় ডাকছে।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

তখন দেখলাম, জলের মধ্যে দুটো চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। চোখ দুটো মাছের মতন, পলক পড়ে না। কিন্তু মাছের নয়, চোখ দুটো সেই লোকটার। আমার একবার ইচ্ছে হল, পালিয়ে যাই।

আবার ভাবলাম, দেখি না শেষ পর্যন্ত কী হয়। আমার তো হাতে লাঠি আছে। এবারে সেই হাতটা খুব কাছে চলে এল। মনে হল যেন আমার পা চেপে ধরবে। এই সময় কে যেন পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকল, বাবলু! বাবলু!

কিন্তু তখন আমার পেছনে তাকাবার সময় নেই। আমি লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারলাম সেই হাতটার ওপর। ঠিক লাগল কি না বুঝতে পারলাম না, হাতটা জলের মধ্যে ডুবে গেল।

আবার কেউ আমার নাম ধরে ডাকল, বাবলু!

পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। সামনে জলের ওপর সেই হাতটা আবার উঁচু হয়ে উঠেছে।

আমি লাঠি দিয়ে যেই আবার মারতে গেলাম, অমনি সেই হাতটা লাঠিখানা চেপে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল, আমি ঝপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম।

জলে পড়েই মনে হল, আমি আর বাঁচব না। আমি যে সাঁতার জানি না!

পানিমুড়া আমার পা ধরে সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে। আমি একবার চেঁচিয়ে উঠলাম, ওমা—! মা!

জলের মধ্যে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম। দম আটকে আসছে। পানিমুড়া এখনো আমার পা ধরে নি। আমি ছটফট করছি বলে খুঁজে পাচ্ছে না বোধ হয়।

এরই মধ্যে একবার কোনোরকমে জল থেকে একটু মাথা উঁচু করে দেখলাম, মাঠ দিয়ে ছুটে আসছেন আমার মা। আমি চিৎকার করতে চাইলাম, মা—। কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম। মা পাড় থেকেই এক লাফ দিয়ে জলে পড়লেন।

চোখ মেলে দেখলাম, আমি আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে শুয়ে আছি। মা আর আমাদের রাঁধুনি আমার গায়ে গরম জলের সেঁক দিচ্ছে। আমি চোখ মেলতেই মা বললেন, আমি বলেছিলাম না, ওর পেটে বেশি জল ঢোকে নি! এই তো সব ঠিক হয়ে গেছে!

মা ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে কী যে হত, ভাবতেও আমার আজও গা কাঁপে। মা ওখানে গেছেন কী করে সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। পরে শুনেছি সে-কথা। মা ঘুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কানের কাছে কে যেন ডাকল—মা, মা! ঠিক আমার গলা। মা চোখ মেলে দেখলেন, কেউ নেই। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তখন বাইরে থেকে আমার সেই 'মা' ডাক শোনা গেল। তারপর পুকুরঘাট থেকে।

BanglaBook.org

আমি জলে পড়ার সময় 'মা মা' বলে ডেকেছিলাম ঠিকই। কিন্তু এত দূর থেকে মায়ের তো সেটা শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবু মা শুনতে পেয়েছিলেন।

মা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, বাবলু, তোকে আমি এ একা পুকুর ঘাটে যেতে বারণ করেছিলাম, তবু গেলি কেন? কেন জলে নেমেছিলি?

আমি বললাম, মা, আমাকে পানিমুড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

মা বললেন, বাজে কথা।

আমি বললাম, না সত্যি।

মা বললেন, মোটেই না! তুই পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিলি!

মা কিছুতেই পানিমুড়ার কথা বিশ্বাস করলেন না। আমাদের রাঁধুনি বলল, হ্যাঁ গো দিদি, এসব পুরনো পুকুরে অনেক ভয়ের জিনিস থাকে।

মা বললেন, সাঁতার না জানলে লোকে জল দেখে ও-রকম অনেক ভয়ের জিনিস বানায়। আমি কাল থেকেই বাবলুকে সাঁতার শেখাব।

এরপর সাতদিনের মধ্যে আমি সাঁতার শিখে গেলাম। পানিমুড়াকে আর কখনো দেখি নি। তবে আমি সাঁতার কাটতে যেতাম নদীতে, ঐ পুকুরে আর নয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

টেলিফোনে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

টেলিফোন তুললেই একটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...সিক্স ফোর নাইন ওয়ান....।'

সকাল থেকে ডায়াল-টোন নেই। টেলিফোনের হরেক গণ্ডগোল থাকে বটে, কিন্তু এ-অভিজ্ঞতাটা নতুন। গলাটা খুবই যান্ত্রিক এবং গম্ভীর । খুব উদাসীনও।

প্রদীপের কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করার ছিল। করতে পারল না।

কিন্তু কথা হল, একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কেবল বারবার চারটে সংখ্যা উচ্চারণ করে যাচ্ছে কেন? এর কারণ কী? ঘড়ির সময় জানার জন্য বিশেষ নম্বর ডায়াল করলে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে সময়ের ঘোষণা শোনা যায় বটে, কিন্তু এ তো তা নয়। মিনিটে-মিনিটে সময়ের ঘোষণা বদলে যায়, কিন্তু এই ঘোষণা বদলাচ্ছে না।

অফিসে এসে সে তার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে টেলিফোনের ক্রটিটা এক্সচেঞ্জে জানাতে বলেছিল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় অফিসার। বহু বছর দিল্লিতে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। কোম্পানিই তাকে বাড়ি, গাড়ি ও টেলিফোন দিয়েছে। তার আগে এই পদে ছিলেন কুরুপ্পু নামে দক্ষিণ ভারতের একজন লোক। তিনি রিটায়ার করে দেশে ফিরে গিয়ে ফুলের চাষ করছেন বলে শুনেছে প্রদীপ। খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি। রিটায়ার করার বয়স হলেও কোম্পানি তাঁকে ছাড়তে চায় নি। বরং আরও বড় পোস্ট দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কুরুপ্পু কিছুতেই রাজি হন নি।

দুপুরে লাঞ্চের আগে সে একটি পার্টিকে একটা বকেয়া বিলের জন্য তাগাদা করতে টেলিফোন তুলে ডায়ালের প্রথম নম্বরটার বোতাম টিপতেই আচমকা সেই উদাসীন, গম্ভীর, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
১৯৩৫—
ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম। শৈশব কেটেছে পিতার নানা কর্মস্থলে। স্নাতক হয়েছেন কলকাতার কলেজে পড়ে। কলাকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ডিগ্রি নিয়েছেন। কর্মজীবনের শুরুতে ছিলেন স্কুল শিক্ষক। পরে দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। এখনও সেখানেই কর্মরত। কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উপন্যাস রচনায় নিবিষ্ট থাকলেও বেশ কিছু উন্নত ছোটগল্প লিখে পাঠক প্রিয় হয়েছেন। *ঘুণপোকা*, *ফজল আলী আসছে*, *মানবজমিন*, *দূরবীন*, *পার্থিব*, *পারাপার* তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। শিশুসাহিত্যেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

তারপরই অবশ্য কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

প্রদীপ খুবই অবাক হয়েছিল। সামলে নিয়ে বাকি নম্বর ডায়াল করতে রিং বাজল এবং ওপাশে একজন ফোনও ধরল। প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিয়ে প্রদীপ খুব চিন্তিতভাবে অফিসের ইলেকট্রনিক টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। এই ফোনেও কণ্ঠস্বরটা এল কী করে? এসব হচ্ছেটা কী?

কলকাতার বাড়িতে প্রদীপের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তার মা, বাবা, বোন, ভাই সব দিল্লিতে। সে বিয়ে করে নি। একা থাকে। একজন রান্নার ঠিকে লোক রেঁধে দিয়ে যায়। আর ঘরদোর সাফ করা, বাসন-মাজা ও কাপড় কাচার জন্য ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। তারা কেউ বাড়িতে থাকে না। আলিপুরের নির্জন অভিজাত পাড়ায় তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে প্রদীপ সম্পূর্ণ একা। তবু প্রদীপ হঠাৎ ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল এবং শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে।

মাত্র তিনবার রিং বাজতেই কে যেন ফোনটা ওঠাল। কিন্তু কথা বলল না।

প্রদীপ বলল, 'হ্যালো! হ্যালো!'

কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর ফোনটা কেউ আস্তে নামিয়ে রাখল।

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? যদি রং নম্বরই হয়ে থাকে তা হলেও তো ওপাশ থেকে কেউ-না-কেউ সাড়া দেবে!

বিকেলে পার্টি ছিল, ফ্ল্যাটে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল তার। আর ফেরার সময় মাথায় দুশ্চিন্তাটা দেখা দিল। সে অলৌকিকে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাও তো পাওয়া যাচ্ছে না।

দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর একটু গা-ছমছম করছিল। তবে আলো জ্বেলে ঝলমলে আধুনিক ফ্ল্যাটটার দিকে চেয়ে তার ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল। তবে ফোনটার ধারেকাছে সে আর গেল না।

প্রদীপের গভীর ঘুম ভাঙল রাত দুটো নাগাদ। হলঘরে ফোন বাজছে। ঘুমচোখে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দিল্লিতে মা-বাবার শরীর খারাপ হল না তো!

ফোন ধরতেই শিউরে উঠল সে। সেই যান্ত্রিক উদাসীন গম্ভীর গলা বলতে লাগল, 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।'

ফোনটা রেখে দিল সে। বাকি রাতটা আর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিল।

কলকাতার টেলিফোন-ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, তা প্রদীপ জানত। তবু সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই প্রদীপ যখন কম্পিত বক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরল, তখন একটি অমায়িক কণ্ঠস্বর বলল, 'সার, আপনি টেলিফোন খারাপ বলে কমপ্লেন করেছিলেন কাল। কিন্তু আমরা টেস্ট করে দেখেছি আপনার লাইনে তো কোনও গণ্ডগোল নেই। লাইন তো চালু আছে।'

'কিন্তু আমি যে টেলিফোনে একটা অদ্ভুত গলা শুনতে পাচ্ছি।'

'হয়তো ক্রস কানেকশন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যন্ত্রপাতি সব বহু পুরনো, তাই মাঝে-মাঝে ও-রকম হয়। আপনি ডায়াল করে দেখুন এখন, লাইন ঠিক আছে।'

বাস্তবিকই লোকটা কানেকশন কেটে দেওয়ার পর ডায়াল-টোন চলে এল এবং অফিসের নম্বরে ডায়াল করতেই লাইনও পেয়ে গেল প্রদীপ।

ফোন স্বাভাবিক হল বটে, কিন্তু প্রদীপের মাথা থেকে 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান..' গেল না। কাজকর্মের ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে নম্বরটা মনে পড়তে লাগল। এক-আধবার প্যাডে নম্বরটা লিখেও ফেলল।

বিকেলের দিকে কয়েকটা চিঠি সই করতে গিয়ে হঠাৎ চিঠির ওপরে টাইপ-করা তারিখটা দেখে সে একটু সচকিত হল। টু ফোর নাইন্টি ওয়ান। অর্থাৎ একানব্বই সালের দোসরা এপ্রিল।

BanglaBook.org

সিক্স ফোর নাইন ওয়ান মানে কি এপ্রিলের ছয় তারিখ?

কথাটা টিকটিক করতে লাগল মাথার মধ্যে। অফিস থেকে বেরিয়ে সে গেল একটা ক্লাবে টেনিস খেলতে। তারপর একটা হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। টেনিস খেলার ফলে ক্লান্ত শরীরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। শোওয়ার আগে সে সভয়ে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। দিল্লিতে ফোন করে মা-বাবার একটা খবর নেওয়া দরকার। ফোন করাটা উচিত হবে কি? যদি আবার..?

না, ফোন তুলে ডায়াল-টোনই পাওয়া গেল। দিল্লির লাইনও পাওয়া গেল একবারেই। মা, বাবা, ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা হালকা লাগল। আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন-চারদিন আর কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। টেলিফোন স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগটাও আস্তে-আস্তে সরে যেতে লাগল মন থেকে।

কিন্তু রবিবার সকালে গল্‌ফ খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। প্রদীপ অন্যামনস্কভাবে টেলিফোন তুলতেই সেই অবিস্মরণীয় যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে.. দিস ইজ দ্য ডে.. দিস ইজ দ্য ডে..'।

সকালের আলোর মধ্যেও ভয়ে হঠাৎ হিম হয়ে গেল প্রদীপ। চিৎকার করে বলল, 'হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব ইট?'

অবিচলিত কণ্ঠস্বর একইভাবে বলে যেতে লাগল, 'দিস ইজ দ্য ডে.. দিস ইজ দ্য ডে..'

প্রদীপ চিৎকার করে ধমকাল, দু-একটা নির্দোষ গালাগালও দিল, কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ওই একটা বাক্যই উচ্চারণ করে গেল।

এপ্রিলের কলকাতা এমনিতেই গরম। ফোনে চেঁচামেচির পর আরও ঘেমে উঠল সে। ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। এর মানে কী?

হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এপ্রিলের ছয় তারিখ। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান। আজকের দিনটা সম্পর্কে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে কি? কী বিশেষত্ব এই দিনটার?

আজ তো চমৎকার একটা দিন। আজ সারাদিন তার দারুণ প্রোগ্রাম। তাদের অফিসের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট মান্টু সিং সরখেরিয়ার আমন্ত্রণে তারা আজ যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লি হাইওয়ের কাছে সরখেরিয়ার বিশাল বাগানবাড়িতে। সকালে সেখানে গল্‌ফ আর টেনিসের আয়োজন, দুপুরে বিশাল লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় হাই টি। তারপরও গানবাজনা হবে। একেবারে ডিনার সেরে ফেরার কথা। এমন চমৎকার মজায় ভরা দিনটা নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?

ফুরফুরে হাওয়ায় হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোড হয়ে সরখেরিয়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছনোর সময় দুশ্চিন্তাটা কখন উবে গেল। অনেক অতিথি জড়ো হয়েছে, হাসি-হট্টগোল চলছে। গল্‌ফ কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ, এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েই।

সরখেরিয়ার খামারের পাশেই গল্‌ফের বিশাল মাঠ। মাঝেমধ্যে ঝোপ-জঙ্গল, জলা। অনেক গল্‌ফ-খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন। খেলতে খেলতে সব দুশ্চিন্তা সরে গেল মাথা থেকে।

বলটা একটা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ বল খুঁজতে সেখানে ঢুকল। জায়গাটা যেন অন্ধকার এবং দুর্গম। কিন্তু জঙ্গলটা এমন জায়গায় যে, গর্ত পর্যন্ত যেতে হলে এই জঙ্গলটি পেরোতেই হবে।

সেই জঙ্গলে নিচু হয়ে বলটা খুঁজবার সময়ে আচমকা একটা দূরাগত কণ্ঠ যান্ত্রিকভাবে হঠাৎ বলে উঠল, 'দিস ইজ দ্য ডে..'

একটা ক্লিক করে শব্দ হল কোথাও। সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ প্রদীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই যেন কিছু জানান দিল। সে বিদ্যুৎ-গতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে-

BanglaBook.org

সঙ্গেই বজ্রপাতের মতো একটা বন্দুকের শব্দ হল। গাছের গোটা কয়েক ডাল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটের ঘায়ে ভেঙে পড়ল। তারপরই একজোড়া পায়ের দ্রুত পালানোর শব্দ।

প্রদীপ যখন উঠে বসল তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখল সে। কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্যর জন্য বেঁচে গেছে।

উঠে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে চারদিকটা দেখল সে। তাকে মারতে চায়? কেনই বা?

বন্দুকের শব্দ শুনে কেউ ছুটে আসে নি। তার কারণ আশপাশে অনেকেই শিকারে বেরিয়েছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছেও আশপাশে।

সারাদিনটা খুব অন্যমনস্কতার মধ্যে কেটে গেল প্রদীপের। ঘটনাটার কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করল না। রাতে বাড়ি ফিরে সে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, টেলিফোনে এই দিনটার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কিন্তু কেন? কে দিচ্ছিল?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। সভয়ে টেলিফোন ধরল প্রদীপ।

'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে একটি ভরাট গলা তার নম্বরটা উচ্চারণ করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'এই নম্বর তো!'

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'আমি কুরুপ্পু। আপনি কে?'

'প্রদীপ রায়।'

'ও হ্যাঁ। আমি আপনার নাম জানি। দিল্লিতে ছিলেন। শুনুন, জরুরি একটা কথা আছে। সরখেরিয়ার এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকার একটা বিল আছে। আপনি কি সেটা পাস করে দিয়েছেন?'

'না। বিলটা একটু ইররেগুলার। ক্ল্যারিফাই করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বলেছি।'

'খুব ভালো। ওই বিলটা একদম জালি। কিন্তু বিলটা আটকালে আপনার বিপদ হতে পারে। সরখেরিয়া বিপজ্জনক লোক।'

'বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।'

'হ্যাঁ, এ-রকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, টেলিফোনটার দিকে মনোযোগী থাকবেন।'

এইবার প্রদীপ চমকে উঠে বলে, 'হ্যাঁ, টেলিফোনেও একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে...'

কুরুপ্পু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, 'জানি মিস্টার রায়, ভূত মাত্রই কিন্তু খারাপ নয়। অন্তত ওই ফ্ল্যাটটায় যে থাকে সে খুবই বন্ধু-ভূত। তাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। তা হলেই নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিপদের আগেই সে সাবধান করে দেবে। আমাকেও দিত। তার পরামর্শেই আমি রিটায়ার করে ফুলের চাষে মন দিয়েছি। আচ্ছা। গুড নাইট।'

প্রদীপ হাতের স্তব্ধ টেলিফোনটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

BanglaBook.org

দেখতে মানা ভূতের ছানা

শ ও ক ত আ লী

মধ্যে আবার কে কে, কে কে—এইরকম কথাও বলে যাচ্ছে ঘড়িটা। আবছা আলোয়, পেন্ডুলামটা ডাইনে বাঁয়ে দুলছে, বুড়ো লোকের মাথা দোলানোর মতো। সমুর মনে হল ঘড়িটা বলছে: যেও না, যেও না, যেও না।

কেন, বারণ করছ কেন? সে পাল্টা শুধাল।

ঘড়িটা কিরকির কিরকির শব্দ করে বোধহয় অল্প হাসল। তারপর টং টং করে দুবার বাজল। যেন বলল—না, না।

মানে?

মানে যেও না। ঘড়ির কাঁটা-দুটো ট্রাফিক পুলিশের মতো দুহাত দুপাশে মেলে বাধা দিতে চাইল।

কেন, যাব না কেন?

রাতের বেলা ঘুমোবার সময়। বাচ্চারা এখন ঘুমোয়।

বাহ্ তুমি যে জেগে আছ?

আমি কখনো ঘুমোই না।

কক্ষনো না? দিনেও না?

না।

বেশ ভালো তুমি, সমু বলল, আমিও ঘুমোব না।

ঘড়িটা সমুর কথায় গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, তুমি ঘুমোও, তুমি ঘুমোও।

বাহ্ কেন?

বাইরে ভয়, বাইরে ভয়, বাইরে ভয়।

ঘড়ির কথায় সমুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবু বলল, কিসের ভয়?

ভূতের।

সমু ঘাবড়ে গেল। ভাবল পালাবে, পালিয়ে নিজের বিছানায় বালিশে গিয়ে মুখ গুঁজবে। কিন্তু ঘড়িটার ঐরকম ভারিক্কি চাল দেখে রাগও হতে লাগল। শুধাল, তোমার ভয় করে না?

না, আমার ভয় করে না।

তাহলে আমারই বা কেন ভয় করবে? যাও আমারও ভয়

শওকত আলী

১৯৩৬—

দিনাজপুরের রামগঞ্জে জন্ম। শৈশব ও তারুণ্য দিনাজপুরে কেটেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সেখানেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। পেশায় অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে অবসর জীবন। ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় খ্যাতি অর্জন। *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, *দক্ষিণায়নের দিন*, *কূলায় কালস্রোত*, *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন*, *ওয়ারিশ*, *উত্তরের খেপ* তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। *লেলিহান সাধ*, *উন্মূল বাসনা* উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের বই। ছোটদের জন্য লেখাতেও তিনি বিশিষ্ট।

করে না—সমু বেপরোয়া হয়ে জবাব দিল।

ঘড়িটা সমুর কথা শুনে আরো গম্ভীর হয়ে গেল। অঙ্ক স্যারের মুখের মতো চেহারা হল। সে ততক্ষণ একপা একপা করে এগিয়ে এসেছে দরজার কাছে। ঐখান থেকে ঘড়ির দিকে তাকাল। তখনো পেন্ডুলাম ডাইনে বাঁয়ে দুলে দুলে বলছে—না, না, না।

সমু ঘুরে দাঁড়াল। শুনল ঘড়িটা বলছে, তাই রে না না, ভূতের ছানা, খেলছে এখন দেখতে মানা।

ভূতের ছানা আবার কি? সমু না-শুধিয়ে পারল না। বলল, ভূতের ছানা কোত্থেকে এল, ভূতেদের ছানা থাকে বুঝি?

বাহ্ থাকবে না? নানা আছে, ছানা আছে, দানাও আছে।

দানা কি জিনিস?

ও একটা জিনিষ। ও দিয়ে দানা বানানো হয়।

কথাটা শেষ না হতেই ঘড়িটা কিরকির কিরকির করে হাসল। তারপর শব্দ করল—টং।

ওটা কী হল?

আড়াইটা বাজল।

বাহ্ শব্দ তো হল মোটে একটা। আড়াইটা শব্দ কর।

ঘড়িটা ভীষণ ঘাবড়ে গেল সমুর কথা শুনে, বলল ঐ একটা শব্দেই আড়াইটা বাজানো যায়।

বাহ্ এ কেমন হিসেব, যখন সাড়ে তিনটে বাজবে তখন?

তখনো ঐ একটাই শব্দ হবে।

সাড়ে চারটায়?

তখনো এই একটাই—এখন ঘুমোতে যাও। ঘড়িটা ধমকে উঠল। বলল, মা জেগে উঠলে মুশকিল হবে।

সমু চুপ করল। সত্যিই মা জেগে উঠলে রক্ষে থাকবে না। একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শুইয়ে রাখবে। সে বলল, আস্তে করে কথা বলতে পার না!

না।

না কেন?

তাহলে ভূতেরা এসে ঘাড় মটকে দেবে।

ও তোমারও তাহলে ভয় আছে!

ঘড়িটা এ-কথার পরও মাথা নাড়াচ্ছে দেখে রাগ হল সমুর। বলল, মিথ্যুক!

না না—না না—না না। ঘড়ি তখনো মাথা দুলিয়েই চলেছে। বলে চলেছে, ভূতের ছানা দেখতে মানা, তাইরে না না, তাইরে নানা।

ঘোড়ার ডিম, সমু রেগে বলল। ভূতের ছানা আবার কোত্থেকে আসবে?

জানো না বুঝি? ঘড়িটা এবার শান্ত হয়ে বলল, বিনুদের বাগানের তালগাছে ছিল, তখন নেমে এসেছে।

সমু এবার জানালার দিকে এগিয়ে গেল, পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল—আর দেখল। লনে ফুটফুটে চাঁদের আলো। আর সেই চাঁদের আলোয় কয়েকটা বাচ্চা লাফিয়ে লাফিয়ে এককা দোককা খেলছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, উদোম গা, লিকলিকে হাত পা—আর কুচকুচে কালো। একজন সমুর দিকে মুখ করে একহাতে চুল সরিয়ে ফিকফিক করে হাসতে আরম্ভ করে দিল। তারপর ঐরকম হাসতে হাসতে হাতছানি দিয়ে সমুকে ডাকতে লাগল।

সমু ভয় পাবে কিনা বুঝতে পারছে না তখন। এরাই কি তাহলে ভূতের ছানা? নাকি সব

BanglaBook.org

বস্তির ছেলেমেয়ে গেটের ফাঁক গলে ভেতরে এসে খেলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। লনের যেদিকে বোগেনভেলিয়ার ঝোপ—বাতাসে ডাল দুলছে, সেখানে দেখল দুটো বাচ্চা। একটু দূরে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে আরো কয়েকজন। ওদিকে বাতাসে গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে। আর ঐ গাছের পাতায় শব্দ শুনতে শুনতেই সমুর মনে হল ওরা সবাই গান ধরেছে।

ভূতের ছানা গান গায়
মানুষের ছেলে শুনবি আয়
খেতে দেব চামচিকে
দাম নেব সাত সিকে
দুই গ্যালন মবিল খাবি
তিন টাকা মাইনে পাবি
গাছতলা শুতে দেব
পাঁচ তোলা মেপে নেব
গান যদি শুনবি না
নিশুত রাতে ইস্কুল যা
হোস যদি ভদ্দর লোক
এসে আমার ঘরে ঢোক
বাতিটাকে নিবিয়ে
মুণ্ডু খাব চিবিয়ে।

এই পর্যন্ত শুনল সশু। শুনে ভয় নয়, রাগ হল তার। মনে মনে বলল, ইস চিবিয়ে মুণ্ডু খাবে—মামাবাড়ির আবদার! সে একবার ভাবল মালীকে ডাকে। দোপাটির চারাগুলো বোধ হয় নষ্ট করে ফেলল। কথাটা ভেবেছে শুধু আর সঙ্গে সঙ্গে দেখল মালীই বোধহয়—কিম্বা মালী নয়, মালীর মতো কেউ হবে—কোত্থকে এসে হাজির হল। আর এসেই দুহাতে দুটি বাচ্চার চুলের মুঠি ধরে ওপরে তুলে চোখের সামনে নিয়ে দেখতে লাগল। বাচ্চাদুটি কিলবিল কিলবিল করে হাতপা ছুড়ছে তখন। কিন্তু লোকটা—নাকি লোক নয়—অন্যকিছু—সেদিকে খেয়ালই করছে না। সে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে তো দেখছেই। তারপর দেখা শেষ হলে সমুর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল। আর ঐ হাসি দেখে সমুর বুকের ভেতরে ছ্যাঁত করে উঠল। এ কি ভূতেদের বাবা? নইলে অমন চেহারায় কেউ তাকায়! সমু কী করবে ভেবে পেল না। তবে রক্ষে, লোকটা আর দাঁড়াল না। বাচ্চাদুটোকে পাঁচিলের উপরে রাখল, শেষে নিজেও পাঁচিলের উপর উঠে পাঁচিল ধরে হেঁটে হেঁটে বিনুদের বাগানের দিকে চলে গেল।

ভয়ে সমুর তখন কাঁপুনি ধরেছে। জানালার কাছ থেকে যে সরে যাবে সে খেয়ালটুকুও নেই। ঐ সময় বাইরের রাস্তায় পাহারাঅলা পুলিশের বুটের আওয়াজ আর হুইসেলের শব্দ শুনে তার হুঁশ হল। তক্ষুনি সে জানালার কাছ থেকে সরে এসে তাড়াতাড়ি বসবার ঘর পার হয়ে নিজের বিছানায় এসে বালিশে মুখ গুঁজল। একটু পরেই সে স্বপ্নে ভূতের ছানাদের সঙ্গে এককা দোককা খেলতে আরম্ভ করে দিল।

ওদিকে কিন্তু দাদুর নাক আর দেয়ালের ঘড়ি তখনো জেগে।

BanglaBook.org

ভূতে বিশ্বাস নেই

হা সা ন আ জি জু ল হ ক

আষাঢ়ে গল্প সবাই শুনতে চায়। কিন্তু আষাঢ় মাস কি আছে আগের মতো? সেই যে ঘন কালিবর্ণ মেঘে-ভরা আকাশ, আর সেই আকাশের অগুণতি ছ্যাঁদা দিয়ে অঝোর ধারায় বর্ষণ। বাড়ির পিছনের ডোবায় হাজার হাজার ব্যাঙের গ্যাঁ গোঁ ডাক, গাঁয়ের কাদায়-ভরা পিছল পথ, নিকষ অন্ধকারে ঢাকা গ্রাম, এখানে-সেখানে কালো কালো তেঁতুলগাছের ঝুপসি অন্ধকার। বিদ্যুতের কোনো কথা নেই, রেডিও নেই, টেলিভিশন নেই, ডাকে খবরের কাগজ আসে তিনদিন পরে। গাঁয়ে একজন ডাক্তারও নেই, রোগী নিয়ে সদরে যেতে হয় গরুর গাড়িতে। পোস্টঅফিস তিন ক্রোশ, থানা ছ-ক্রোশ, শহর পনের ক্রোশ— এমন না হলে আষাঢ়ে গল্প জন্মাবে কোথা থেকে! সবাই জানে ভূতেরা আলোতে থাকতে পারে না। বিদ্যুৎ এল তো ভূতেরা নিশ্চিহ্ন হল।

অথচ ভূত চাঁদের আলোয় ভালোই থাকে, হ্যারিকেনের ম্যাটমেটে আলো-ছায়াতেও তাদের কষ্ট নেই। দিব্যি তেঁতুলগাছের মাথায় এক পা আর পাঁচশ হাত দূরে তালগাছের মাথায় এক পা রেখে নানারকম খেলা দেখিয়ে অবসর কাটাতে তাদের অসুবিধে নেই। এসব যখন চলেই গেছে, তখন আর আষাঢ়ে গল্প কিছুতেই জমবে না। কাজেই জ্বলজ্যান্ত সত্যি একটা গল্প তোমাদের শোনাই।

আমার বয়স যখন চোদ্দ, রক্ত টগবগ করে ফুটছে, সেই সময়ে আমার বড় চাচা কঠিন অসুখে পড়লেন। ওঁর অসুখটা আজকাল অবশ্য অসুখই নয়, একেবারে ডালভাত হয়ে গেছে বলা চলে। ছোটখাটো অপারেশনেই ঠিক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রোগটা তখন অতি কঠিন বলেই গণ্য হত। গাঁয়ের একজনও রোগটার নাম জানত না। জানবার প্রয়োজন কী? ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর আর টাইফয়েডেই স্বচ্ছন্দে জুতসই মরতে পারত তারা, অন্য রোগের দরকারই ছিল না। কাজেই এ অজানা কঠিন রোগে আমার বড় চাচার নির্ঘাত মৃত্যু হবে তাতে কারো সন্দেহ ছিল না।

হাসান আজিজুল হক
১৯৩৯—
বর্ধমান জেলার যবগ্রামে জন্ম। স্কুলজীবন যবগ্রামে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন খুলনায়। দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক হন রাজশাহি কলেজ থেকে। স্নাতকোত্তর রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা তাঁর পেশা। ছোটগল্প লেখক হিসাবে খ্যাতিমান। কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থও রয়েছে তাঁর। *আত্মজা ও একটি করবী গাছ, জীবন ঘষে আগুন, পাতালে হাসপাতালে, নামহীন গোত্রহীন, আমরা অপেক্ষা করছি, মা-মেয়ের সংসার* তাঁর ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য বই। ছোটদের জন্যও লিখেছেন।

বড় চাচারও না। তিনি তো রীতিমতো তৈরি হয়েই মরবার জন্যে বিছানা নিলেন। এই অতি কঠিন ব্যামো দেখার জন্যে আমাদের গাঁ তো বটেই, আশপাশের গাঁ থেকে অনবরত লোক আসতে লাগল।

গাঁয়ে একজন হোমিওপ্যাথ, আর একজন ভয়াবহ অ্যালোপ্যাথ। সে লোকটা মাত্র একরকম মিকশ্চার তৈরি করতে আর কোমরে কুইনাইন ইঞ্জেকশন দিতে জানত। ঐ ইঞ্জেকশনে যাদের ম্যালেরিয়া সারত, তাদের অনেকেই চিরকালের জন্যে খোঁড়া হয়ে যেত। কেন হত আমি জানি না। কাজেই বিশেষ চিকিৎসার জন্যে এ দুজনকে বাদ দিয়ে সাত মাইল দূরের একজন বাতে ধরা এল.এম. এফ. ডাক্তারকে কল দেওয়া হল। ওষুধপত্তর তিনি কী দিলেন জানি না, তবে প্রস্রাবের কষ্ট দূর করার জন্যে ক্যাথেডার লাগিয়ে দিলেন। একটা পাত্রে ফোঁটায় ফোঁটায় প্রস্রাব পড়তে লাগল আর এই অভূতপূর্ব চিকিৎসা দেখার জন্যে দলে দলে মানুষ এসে ভিড় জমাতে শুরু করল।

একদিন দুপুরের পরে রোগীর অবস্থা হল সঙ্গিন। সাত মাইল দূরের গ্রামে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আজ খবর দিলে হয়তো কাল ডাক্তার আসবেন। অত দূরে খবর দিতে যায় কে? যার রক্ত টগবগ করছে, সে-ই যাবে। আমি তৈরি হয়ে গেলাম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ডাক্তারের গাঁয়ে যাবার পথ বলতে তেমন কিছু নেই। মাটির সড়কও তখন বিরল। আমাদের গাঁয়ের ভিতর দিয়ে সড়ক একটা ছিল বটে, কিন্তু সেটা গেছে ভিন্ন দিকে। কাজেই পায়ে পায়ে চলতি আলপথ ছাড়া এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে যাবার উপায় ছিল না। বর্ষার সময় সে-সব পথ কাদামাটিতে সত্যিই দুর্গম। ভাগ্যিস সময়টা তখন বর্ষা নয়। জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি, রোদে কাঠ ফাটছে, বিশাল বিশাল মাঠ ধান কেটে নেবার পর ধু-ধু করছে। এইসব মাঠের ভেতর দিয়ে শীতের জমির আল কেটে কেটে এই পথ বানিয়ে নেয় লোকেরা। পরের বর্ষা পর্যন্ত পথগুলো ভালোই থাকে, চমৎকার সাইকেল চলে। আমাদের একটা ফিলিপস্ সাইকেল ছিল। চড়ে বসতে পারলেই হল, প্যাডেল করার দরকার ছিল না, একরকম আপনাআপনিই চলত শাঁই শাঁই করে। সেই সাইকেলটা নিয়ে ডাক্তারের কাছে চললাম দুপুরের একটু পরে।

তিনটে গাঁ পেরিয়ে ডাক্তারের গাঁ। গাঁগুলোর পাশ কাটিয়ে বেশ বেলায় বেলায় পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। কিছু ওষুধপত্তর আর পরের দিন ডাক্তার আসবেন এই কথা নিয়ে মনের আনন্দে যখন ফিরতি পথ ধরেছি তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে। দ্রুত সাইকেল চালিয়ে বাঁ দিকের গাঁ-দুটি পেরিয়েছি, বাকি আছে ডান দিকের গাঁ-টি। শূন্য মাঠে জোর হাওয়া, রোদ ঝিকমিক করছে, এমন সময় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে একটা ঘন কালো মেঘ উঠে আসছে। কিছু বোঝার আগেই রে রে করে সেই মেঘ সারা আকাশ ঢেকে ফেলল আর মিনিট তিন-চারেকের মধ্যেই পুব দিক থেকে উঠে এল একটা প্রচণ্ড ঝড়। ফাঁকা মাঠের সেই ঝড়ের বর্ণনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি যাচ্ছিলাম পশ্চিমমুখো, আমার ঘাড়ে-পিঠে ধুলোবালি-কাঁকরের দু-তিনটে ঝাপটা এসে লাগতেই বুঝতে পারলাম সাইকেল প্যাডেল করার কোনো দরকার নেই, আমার কাজ হচ্ছে কোনোরকমে হ্যান্ডেল ধরে সাইকেলে বসে থাকা। নিমেষে সাইকেলসুদ্ধ উড়ে এসে আমি ডানদিকের গাঁ-টি পেরিয়ে এলাম। এইবার আমাকে উত্তরমুখো যেতে হবে। দেখা গেল সেটা অসম্ভব। আরো অসম্ভব হয়ে উঠল যখন ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামল মুষলধারায় বৃষ্টি। পৃথিবী অন্ধকারে ভরে গেল। ঝড়ের প্রচণ্ডতায়, বৃষ্টির তোড়ে সামনের পথ গেল হারিয়ে। তারপর সাইকেলের চাকাও গেল কাদায় আটকে। করার আর কিছু নেই। সাইকেলটাকে আঁকড়ে ধরে আমি দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম।

যে গাঁ-টিকে ডান হাতে রেখে পেরিয়ে এসেছি, সেই গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তে বড় বড় তিনটে দিঘি। তাদের পাড়গুলো তেঁতুলগাছের জঙ্গলে ভরা। কতক্ষণ আর খোলা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা যায়। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর শাদা আলোয় ভরে যাচ্ছে চারদিকের একেবারে ফাঁকা খোলা মাঠ। প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে দাঁড়িয়ে থাকাও যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কী আর করি! সাইকেলটাকে ঘাড়ে নিয়ে আমি সেই জঙ্গলে ঢুকে একটা বড় তেঁতুলগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াই। বৃষ্টি

BanglaBook.org

আর ঝড়টাকে যদি একটু আড়াল করা যায়।

কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই, বিশাল মাঠগুলো ঝড়ে-বৃষ্টিতে অন্ধকারে লণ্ডভণ্ড হচ্ছে, কড়কড় শব্দে মুহুর্মুহু বাজ পড়ছে আর বিদ্যুৎ কালো আকাশ চিরে ফালা-ফালা করে দিচ্ছে। বাঁচার আশা তখন ছেড়ে দিয়েছি। শুধু ভাবছি মৃত্যুটা কীভাবে হবে। এমন সময় আমার কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরে শাদা শার্ট গায়ে ফিটফাট এক ভদ্রলোককে দেখা গেল। একটু অবাক চোখে লোকটির দিকে তাকাতেই তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'এই ঝড়বৃষ্টিতে এখানে কেমন করে এসে পড়লে হে? ভিজে তো চুপসে গেছ। এস, এস আমার সঙ্গে। পাশেই আমার বাড়ি, ঝড়বৃষ্টি ধরে এলে তখন বাড়ি যেয়ো।'

এমন স্বাভাবিকভাবে কথাগুলো বললেন যে, আমার একবারও মনে হল না এই দারুণ দুর্যোগে লোকটি হঠাৎ এখানে উদয় হলই বা কী করে আর এত ঝড়বৃষ্টিতে লোকটির জামাকাপড়ই বা অত ফিটফাট আছে কীভাবে! ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি কিন্তু তখনো সমানে চলছে। একটিও কথা না বলে লোকটির সঙ্গে যাব বলে পা বাড়াতেই মনে হল সাইকেলটার কী হবে। সাইকেলটার দিকে তাকিয়েছি, লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ও সাইকেলের কথা ভাবতে হবে না। থাকুক এখানে পড়ে—কেউ নেবে না, সকালে ব্যবস্থা করা যাবে।'

এই বলে সে হাঁটতে শুরু করলে আমি নিশ্চিন্ত মনে তার পিছনে পিছনে চললাম। খুব স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে হাঁটছেন লোকটি। পা যেন মাটি স্পর্শ করছে না, বাতাসে জামাকাপড় একটুও নড়ছে না, বৃষ্টিতে যেন ভিজছেও না। খুবই অবাক কাণ্ড! কিন্তু আমার কাছে তখন সবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।

আমাদের ওদিকের গাঁগুলো যেমন হয়—গাঁয়ের শুরুতেই বড় বড় দিঘি, আম জাম কাঁঠাল তেঁতুলের বড় বড় জঙ্গল, ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে পথ, তারপর একটি-দুটি বাড়ি—তারপরেই রাস্তার দুপাশে ঠাসবুনুনি মাটির বাড়ির সারি। লোকটির সঙ্গে চলতে চলতে হঠাৎ-ই বড় তেঁতুলগাছের আড়ালে দেখা গেল ছোট্ট একটি মাটির বাড়ি। আমাকে নিয়ে ভদ্রলোক সেই বাড়িতে ঢুকলেন। লোকজন কেউ নেই। ঘরের উঁচু মাটির দাওয়া বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে। দাওয়া পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল একটি হ্যারিকেন জ্বলছে ঘরের এক কোণে। বাতিটা কমানো। লোকটি এগিয়ে বাতিটা একটু উস্কে দিয়ে দাওয়ায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'এই-যে ভাই, তোমার সাইকেল চলে এসেছে।' স্পষ্ট দেখলাম আমার কাদামাখা সাইকেলটা দাওয়ার ওপরে একটা দেয়ালে ঠেসান দেওয়া রয়েছে। এতেও আমি আশ্চর্য হলাম না, যেন ব্যাপারটা অতি স্বাভাবিক। লোকটি ঘরে ফিরে এসে একটা কাচা কাপড় আর একটা শাদা ফতুয়া আমার হাতে দিয়ে বলল, 'কাপড়টা ছেড়ে এই শুকনো কাপড় পরে নাও। আমি আসছি একটু।' বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। কাপড় হাতে নিয়ে দেখলাম উঠোনের একধারে একটা গোয়ালে গরু-ছাগল বাঁধা রয়েছে, আর একধারে একটা রান্নাঘরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে এই দুর্যোগের মধ্যেও নিশ্চিন্ত মনে উনুনে রান্না করছে একটি বউমানুষ। পরনে শাদা শাড়ি, মুখটা ঘোমটায় ঢাকা। কাপড়চোপড় ছেড়ে সুস্থ হয়ে বিছানায় বসেছি—লোকটি গরম ভাত, ডাল, ঘি, লবণ ইত্যাদি নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'নাও ছোকরা, খেয়ে নাও—বেশি কিছু জোগাড় করতে পারলাম না।'

ভদ্রলোক ঠায় আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালেন আমাকে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠতেই তিনি আমাকে চৌকির বিছানায় শুইয়ে, মশারিটা খাটিয়ে, হ্যারিকেনটা কমিয়ে দিয়ে বললেন, 'শুয়ে পড় ভাই, সকালে তোমাকে ডাকব।'—বলে তিনি চলে গেলেন। আমি মশারির ভিতরে ঢুকে চোখ বন্ধ করতেই গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম।

যখন ঘুম ভাঙল, দেখি তেঁতুলতলায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। কাদামাখা সাইকেলটা পড়ে আছে পাশে। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে, সকাল হচ্ছে আর পাখিরা কিচিরমিচির ডেকে চলেছে।

ব্যাপারটা কী বল তো?

চোর তাড়াতে ভূত

শেখর বসু

মধুসূদনবাবু চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে মনের মতো একটা বাড়ি বানালেন। দোতলা বাড়ি, ওপরে নিচে দুটো ফ্ল্যাট, সামনে এক চিলতে বাগান। কৃপণ হিসেবে মধুসূদনবাবুর দারুণ বদনাম ছিল, কিন্তু বাড়ি তৈরির ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য দেখান নি। সারাজীবনের জমানো টাকা দুহাতে খরচা করে ছবির মতো বাড়ি বানিয়েছেন। বাড়িটা যে দেখে সেই তারিফ করে, হ্যাঁ, রুচি আছে বটে গৃহস্বামীর।

মধুসূদনবাবুর ছেলেমেয়ে নেই, কর্তা-গিন্নির সংসার। তবে খুবই সুখের সংসার। আগে কর্তা-গিন্নির মধ্যে সামান্য চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি হত কিন্তু গিন্নি বদ্ধ-কালা হয়ে যাবার পরে সে অশান্তিটুকুও হয় না। একহাতে তালি বাজে না, এক গলায় ঝগড়া হয় না, সুতরাং ওদের সংসারে এখন কোনোরকম গোলমাল নেই।

বাড়ি তৈরির পেছনে মধুসূদনবাবুর একটা সোজা হিসেব ছিল। দোতলায় থাকবে কর্তা-গিন্নি, আর একতলাটা ভাড়া। ভাড়া আর ব্যাংকের সুদের টাকায় দুজনের সংসার দিব্যি হেসে-খেলে চলে যাবে।

অঙ্কের নিয়মে সবকিছুই হল, কিন্তু কোনো ভাড়াটেই মধুসূদনবাবুর বাড়িতে একমাসের বেশি টিকতে পারল না। শেষে বাড়িটার দুর্নাম হয়ে গেল। অত সুন্দর বাড়িতে ভাড়াটে আর আসতে চায় না।

মধুসূদনবাবুর কয়েকজন হিতৈষী ছিলেন, তাঁরা ওঁকে নানাভাবে বোঝালেন। কিন্তু মধুসূদনবাবু ওঁর যুক্তি থেকে একচুলও সরে এলেন না। সব পরামর্শের উত্তরেই এক কথা : বাড়িটা মশাই আমার রক্তজল-করা পয়সায় তৈরি। এ-বাড়ির প্রতিটি জিনিস আমার খাটনির টাকায় কেনা। আমার সারাজীবনের সব সঞ্চয় বাড়ির পেছনে ঢেলেছি, আর সে-বাড়ি আমি দেখাশোনা করব না?

হিতৈষীদের একজন তখন চটে উঠে বললেন : আপনি তাহলে আপনার বাড়িটা চোরদের দিন। চোররা রাত্তিরে

শেখর বসু
১৯৪০—
শিক্ষাজীবন কলকাতায় কেটেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। পেশায় সাংবাদিক। শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম কর্মী। ছোটগল্প ও উপন্যাস লেখেন। দশটি গল্প তাঁর ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য বই, *অন্যরকম* নামে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। অনুবাদও করে থাকেন। ছোটদের জন্যও প্রচুর লেখেন। *সোনার বিস্কুট* তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাস।

চুরি করার জন্যে বেরিয়ে সকালে ফিরে এসে ঘুমোবে। ওদের কোনো অসুবিধে হবে না আপনার এ-বাড়িতে থাকতে।

কথাটায় বেশ কষ্ট পেলেন মধুসূদনবাবু, কিন্তু উনি কোনো উত্তর দিলেন না। বাড়ি ফিরে এসে মনের দুঃখে গিন্নিকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমিই বল আমি কোনো অন্যায় করেছি! এদিকে যা চোরের উৎপাত,রাত্তিবেলায় পাহারা না দিলে চলে? চোররা যদি দেখে গৃহস্থ জেগে আছে, তারা চুরি করার জন্যে বাড়িতে ঢোকে না। কিন্তু আমি জেগে আছি, চোররা সেটা জানবে কী করে? আমি তাই তাদের জানাবার জন্যে একঘণ্টা অন্তর খড়ম পায়ে মাঝে-মধ্যে পায়চারি করি, ইচ্ছে করে জোরে-জোরে কাশি, তারপর একটা কাঠি দিয়ে জানলার গ্রিলে ক্রি-রিং ক্রি-রিং ক্রি-রিং করে শব্দ করি। এটা কি দোষের? চোরের হাত থেকে আমি বাড়ির সবাইকে বাঁচিয়েছি অথচ ভাড়াটেরা আমাকেই গালাগালি দিয়েছে। আমার জন্যেই নাকি ওরা রাতের পর রাত ঘুমোতে পারে নি, আমার জন্যেই নাকি ওরা বাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। তুমিই বল আমার দোষটা কোথায়?'

সব কথা শেষ হলে গিন্নি বললেন, 'এরজন্যে তুমি মন খারাপ করো না। তিনটে পেয়ারাগাছ নষ্ট হয়েছে তো হয়েছে, তুমি এবার তিনটের বদলে চারটা পেয়ারাগাছ লাগাও।'

কী কথার কী উত্তর! মধুসূদনবাবু কপাল চাপড়ে বললেন, 'কালার একটা কথা যদি কানে যায়।' তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

এইভাবেই দিন গড়াতে লাগল। মাসের পর মাস কেটে গেল কিন্তু মধুসূদনবাবুর বাড়িতে আর কোনো ভাড়াটে এল না। তার বদলে যাঁরা এলেন তাঁরা সাধারণত পোড়োবাড়িতে থাকেন। মধুসূদনবাবুর একতলার ফ্ল্যাটে ভাড়ার বাসিন্দা হলেন দুজন ভূত। এঁরা খুব পণ্ডিত, ভূতদের সমাজে সবাই এঁদের খুব মান্যিগন্যি করে। পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে এঁরা একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলেন, হঠাৎ এই ফ্ল্যাটটা পেয়ে গিয়ে ওঁদের আনন্দ আর ধরে না।

সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট, সব ঘরে দেয়াল-আলমারি। পণ্ডিত ভূত সেইসব আলমারিতে নিজেদের বইপত্র গুছিয়ে ফেললেন চটপট। এঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। বিষয়টি হল 'মানুষদের ভৌতিক ব্যবহার।' অনেক মানুষের কাণ্ডকারখানা অবিকল চ্যাংড়া ভূতদের মতো। এটা কেন হয়? এর পেছনে কোন্ ধরনের মানসিকতা কাজ করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাত একটু গভীর হলে গবেষক-ভূত দুজন পড়াশুনা করতে বসে গেলেন। চারদিক অসম্ভব নির্জন। লেখাপড়ার কাজ তরতর করে এগোতে লাগল। হঠাৎ দুজন ভূতই চমকে উঠলেন একসঙ্গে। মাথার ওপর খট-খট-খটাৎ। কী ব্যাপার? পাড়ার মস্তান-ভূতরা কি ওদের বিরক্ত করতে এসেছে? কিছুক্ষণ মন দিয়ে শব্দটা শোনার পর ওঁরা বুঝতে পারলেন, এ শব্দ ভূতের নয়। দোতলায় কোনো মানুষ শব্দ করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত তো।

কোনো শব্দ যদি একভাবে একটানা অনেকক্ষণ ধরে চলে, আস্তে আস্তে সেটা কানে সয়ে যায়। গবেষকরা আবার তাঁদের কাজে মন বসালেন কোনোমতে। কিন্তু কাজ এগোতে পারল না। হঠাৎ খকখক করে প্রচণ্ড জোরে কাশির শব্দ উঠল। কাশি আর থামতেই চায় না, নিশুতি রাতে বিকট কাশির দমকে সারা বাড়িটা প্রায় কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। শব্দটা ভেসে আসছে দোতলা থেকে।

এইরকম বিকট শব্দের মধ্যে কি কাজে মন বসানো যায়? কিন্তু বসাতেই হবে, গবেষণার মতো কাজ ফেলে রাখা যায় না। ভূত দুজন আবার নিজেদের কাগজপত্তরের ওপর ঝুঁকে

BanglaBook.org

পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদে ভয়ংকর একটা শব্দে ওদের হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। হাতের ধাক্কায় দরকারি কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। এটা আবার কিসের শব্দ। ক্রি-রিং ক্রি-রিং ঘঙ্, ক্রি-রিং ক্রি-রিং ঘঙ্। দোতলার ওই বিদঘুটে শব্দটা সারা পাড়া প্রায় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

এত গোলমালের মধ্যে কাজকর্ম করা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকাও অসম্ভব। ব্যাপারটা কী দেখার জন্যে গবেষক-ভূত দুজন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে শাঁ করে দোতলার ঘরে চলে এলেন; এখানে এসে তাঁদের চমকাতে হল আর একবার। মধুসূদনবাবুর পরনে লুঙি, গায়ে ফতুয়া, মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধা মাফলার; তিনি একমনে লাঠির ছড় টেনে যাচ্ছিলেন জানলার গ্রিলে।

গবেষক-ভূত দুজনের মধ্যে একজন মাস্টারমশাই আর একজন ছাত্র। মাস্টারমশাই ফিসফিস করে ছাত্রকে বললেন, 'আরে! এ-লোকটা তো আমাদের গবেষণার কাজে লেগে যাবে। একেই বলে মানুষদের ভৌতিক আচরণ। কিন্তু লোকটা এ-রকম করছে কেন?'

কারণটা জানার জন্যে ভূত দুজন মানুষের চেহারা ধরে মধুসূদনবাবুর সামনে গিয়ে হাজির হলেন। মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ঘরের মধ্যে লোক দেখে মধুসূদনবাবু 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই মাস্টারমশাই-ভূত বলে উঠলেন, 'আমরা চোর নই, ভূত, আপনি শুধু শুধু ভয় পাবেন না।'

মধুসূদনবাবু ভূতের চাইতে চোরকে অনেক বেশি ভয় পান। ভূতের কথায় সামান্য আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু মন থেকে সন্দেহ পুরোপুরি দূর হল না। চোখ ছোট করে বললেন, 'আপনারা যে ভূত তার প্রমাণ কী? আপনারা কি নিজেদের মাথা নিজেরাই চিবিয়ে খেতে পারেন?'

এই ধরনের বিশ্রী একটা প্রমাণ চাওয়ার জন্যে গবেষক-ভূত দুজন আহত হলেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে মাস্টারমশাই-ভূত বললেন, 'আমরা লেখাপড়া নিয়ে থাকি, চ্যাংড়া ভূতদের মতো ওসব কাণ্ডকারখানা দেখানো সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। তবে আপনি যখন প্রমাণ চাইছেন, আমরা একটু ভূতের নাচ দেখাচ্ছি।' এই-না বলে ভূত দুজন নাচ জুড়ে দিল। বিশুদ্ধ ভৌতিক নাচ। মাথা নিচে, পা ওপরে। ভূতেরা কখনো এপাশে কখনো ওপাশে, কখনো জানলায় কখনো সিলিঙে।

মধুসূদনবাবু ইদানীং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছেন। কালা গিন্নির সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই। এই অবস্থায় ভূতের নাচ দেখে অনেকদিন পরে বেশ মজা পেলেন তিনি।

নাচার ফলে দুজনেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সামান্য বিশ্রাম নেবার পরে মাস্টারমশাই-ভূত বললেন, 'আমরা ভূত, এবার বিশ্বাস হয়েছে তো?'

মধুসূদনবাবু অমায়িক হাসি হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এবার দয়া করে বলুন আপনাদের কী কাজে লাগতে পারি আমি।'

গবেষক দুজন ঘোরপ্যাঁচের ভূত নন। শাদা, সরল ভূত। এখানে আসার উদ্দেশ্য অকপটে বলার পরে মাস্টারমশাই-ভূত বললেন, 'আপনার আচরণ ভূতের মতো। আপনি আমাদের গবেষণার কাজে একটু সাহায্য করুন। এর বিনিময়ে আপনি যা চান আমরা তাই দেব।'

মধুসূদনবাবু বিষয়ী মানুষ। ভূতের কথায় শুধু গোঁফের ফাঁকে একটা ধূর্ত হাসি থেকে গেল। হাসতে হাসতে বললেন, 'এ আর কী এমন বড় কথা। তবে কাজ চালানোর সঙ্গে সঙ্গে

BanglaBook.org

আপনারা যদি আমার ছোট্ট একটা উপকার করেন—।'

'কী উপকার?'

'রাত্রিবেলায় চোরের ভয়ে ঘুমুতে পারি না, আপনারা তখন যদি একটু পাহারা দেন—।' এককথায় রাজি হয়ে গেলেন গবেষক-ভূত দুজন।

মাসখানেক বাদে বিস্তর চেষ্টা করে বাড়িতে আবার ভাড়াটে বসালেন মধুসূদনবাবু। একতলার একটা ঘর বাদে বাকি ঘরগুলোয় ভাড়াটে বসে গেল। ওই ঘরটা তালা দেওয়া থাকে সবসময়। মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলায় ওই ঘরে ঢুকে একা-একা কথা বলেন মধুসূদনবাবু। ভাড়াটেরা ভাবে, ভীমরতি ধরেছে বুড়োর। তা ধরুক, আগের মতো আর সারা রাত্তির ধরে বিদ্‌ঘুটে সব শব্দ করে না তো। নিরুপদ্রবে এখন রাত কেটে যায় এ-বাড়িতে।

আসল কথাটা কিন্তু মধুসূদনবাবু কারও কাছে ফাঁস করেন নি। বদ্ধঘরে ভূত দুজন গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে। বিরাট কাজ, এ-কাজটা শেষ হতে নাকি আরো দশ বছর লাগবে। মধুসূদনবাবু নিশ্চিন্ত। এক ঘুমে লম্বা-লম্বা রাত কাবার করে দিচ্ছেন। কারণ, তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে কোনো চোর যদি ভুল করেও এ-বাড়িতে ঢুকে পড়ে—আস্ত ঘাড় নিয়ে তাকে আর ফিরে যেতে হবে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এক্কা গাড়ি ও লক্ষ্মীছায়া

বুলবুল চৌধুরী

আমি শুনেছি, লক্ষ্মীছায়া সুন্দরী ছিলেন। সুন্দরী মানে কেমন সুন্দরী ! লক্ষ্মীছায়া দেয়ালের বাইরে বেরোতেন কম। নাচের সাথে সাথে গান গাইতেন মাসে একদিন। তাও এক পূর্ণিমায়। জলসায় শ্রোতা থাকত নির্বাচিত।

দীঘল কালো কেশ ছিল লক্ষ্মীছায়ার। চোখে কালো চিকন তিরতিরে ধারা। সে আবার কেমন ! আমার সঠিক জানা নেই। হয়তো লক্ষ্মীছায়ার চোখে পুরো লক্ষ্মীছায়াই ধরা থাকত। গাছকুড়োলি পাখির ঠোঁটের মতো ছিল তার নাকের ডগা। বুকে ছিল মৃদুমন্দ ঢেউ। নরম ছিলেন। পাকা টসটসে আঙুরও কি অত নরম হয় ! তার যে কী দু-খান পা ছিল— তাতে কোনোকালে ঘুঙুর বাঁধার দরকার হয় নি, নাচের মূর্ছনা তৈরি হত পায়ে পায়ে চলা থেকেই। এভাবে লক্ষ্মীছায়ার পাশে পাশে নৃত্য রূপ নিয়ে বেজে উঠত বোধহয়।

দেখিনি এসব। রূপ তো কত ধারায় চমৎকার হয় সব। তিনি নিশ্চয়ই কল্পনা ছাড়িয়েও অনেক অনেক সুন্দরী ছিলেন। সেই কবে থেকে লক্ষীছায়াকে ঘিরে জড়িয়ে আছে আমার হাজারো কল্পনা।

নদীঘেঁষা দূর সব গ্রামে গ্রামে আমার কাজ। নৌকোয় নৌকোয় ঘোরা। সেদিন গভীর রাতে আরিচা ঘাটে পৌঁছাই। তখন আর কোনো বাস নেই চড়বার। মানিকগঞ্জে আমার অফিস-কাম রেসিডেন্স। মাঝেমধ্যেই এমন দেরি হয়ে যায়। তবে দীর্ঘপথ হলেও আরিচা থেকে মানিকগঞ্জের এক্কাগাড়ি পেয়ে যাই। আজও খুঁজতে গিয়ে পেলাম একজনকে। ভালোই হল। এর ফলে ভোরের আগে আগেই ঘরে ফিরে বিছানায় কাত হতে পারব। তাহলেও মন্দ নয়, এই ছুটোছুটি আমাকে ছুঁতেই ইচ্ছে করে। স্বাদ পাই।

লক্ষ্মীছায়া রাস্তার দুপাশে অনেকগুলো বৃক্ষ লাগিয়ে গেছেন। আরিচা থেকে কিছুদূর এগুলেই সেই বৃক্ষসারির শুরু। অনেক দিন তো, বহুদিনে এক-একটা প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। একটার ডালপালা অন্যটার ডালপালা বেষ্টন করে

বুলবুল চৌধুরী
১৯৪৭—
জন্ম কলকাতায়। শিক্ষাজীবন ঢাকায়। বিচিত্র পেশায় কাজ করেছেন। কথাসাহিত্যিক। বিশেষ করে ছোটগল্প লেখক। ছোটগল্পের বই *টুকা কাহিনী*, *পর মানুষ* উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস *কহ কামিনী*, *পাপপুন্যি*, *জলটুঙ্গী* ইত্যাদি। ছোটদের জন্যও লিখেছেন। *লাল কমল নীল কমল* উল্লেখযোগ্য ছোটদের রূপকথার গল্পের বই।

আছে—এ-রকম চলে গেছে অনেকখানি পথ। এখন তো আমার আসা-যাওয়ার বেলায় দুপাশে বেশ খেয়াল করি। জোছনা থাকলে স্পষ্ট দেখি। অন্ধকার থাকলে অনুভব করি পাতাদের গায়ে গায়ে লেগে থাকার নানা রেশ। আর যদি বাতাস ওঠে তাহলে জলতরঙ্গ জাতীয় মৃদু সংগীত ধ্বনিত হতে থাকে পাতায় পাতায়। সেই কবে মারা গেছেন লক্ষ্মীছায়া--যার কথা গল্প হয়ে আজ পৃথিবীতে মানুষের মুখে মুখে। কিন্তু ঐ সমস্ত বৃক্ষপত্রে আজও তিনি সমান বেঁচে আছেন।

আমাদের অফিসে চাকরি মহিত পিয়নের। মাঝবয়েসী। প্রচণ্ড চুল-দাড়ির ভেতর শুধু জেগে থাকে দুটো চোখ। ওর হাতেই আমার রান্না-খাওয়া। সে জিজ্ঞেস করেছিল, যাবেন স্যার? গেলে লক্ষ্মীছায়ার বাড়িটা দেখে আসতে পারেন। মাইল দুই হাঁটতে হবে। কতজন যায়।

ইচ্ছে দারুণ, একবার যাই। সময় গুছোতে পারি না। সাপ্তাহিক ছুটি পেলেও কাজের চাপে সেটুকু একাকার হয়ে যায়। বাংলাদেশের নৌকো নিয়ে আমার গবেষণা। নদীর তীরবর্তী মাঝি-মাল্লা এবং জেলেদের সাথে চলাফেরা। উঠে অন্য কোথাও দম ফেলব সেই সময় এখন নেই। ফলে লক্ষ্মীছায়ার বাড়ি দেখা হয় না আমার।

তবু একবার যাব। কোনো-না-কোনো সময়ে একবার অবসর নিশ্চয়ই মিলবে। মহিত আমাকে ডিটেলস জানাতে পারে নি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত জিজ্ঞাসা তখন। ঝুলি বড় নয় মহিতের। কখনো কখনো যেন বানিয়ে বানিয়ে উত্তর দেয়। যে অনেক জানে ও জানাতে পারে তেমন কেউ পুরনো একজন হয়তো এখন অবধি বেঁচে আছেন এলাকায়। গেলে অনেক খবর তার কাছ থেকে পেতেও পারি।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহিত, এতদিনে বাড়িটা ভেঙে যায় নি তো? সেই কবেকার না কবেকার গাঁথুনি?

না। অন্যলোক এসেছে। কলকাতা থেকে বাড়ি বদল করে আসা দুই বুড়ো-বুড়ি মালিক। ছেলেরা বিদেশে। শুনেছি পলেস্তরা করান বছর-বছর। গাছপালা তেমনি আছে। ফুলের বাগানে মালী কাজ করে।

লক্ষ্মীছায়ার বাড়িতে সেই আগের বৈভব নিশ্চয়ই নেই। যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তখন চেহারা ছিল ভিন্ন। আলাদা পরশ। বিরাট এলাকা জুড়ে প্রাচীর। ভেতরবাড়িতে দাস-দাসির যাতায়াত। দারোয়ানের কাঁধে বন্দুক থাকত সবসময়। তিনি ফুল ভালোবাসতেন। মহিত জানিয়েছিল বাগানে বহু রকমের গোলাপফুলের চাষ। কালো গোলাপও ছিল। প্রিয়ও ছিল কেন যেন।

খুঁজলে সারা দেশের কোথাও-না-কোথাও কালো গোলাপ পাব নিশ্চয়ই। প্রথম যেদিন লক্ষ্মীছায়ার বাড়িতে ঢুকব সেদিন একটা কালো গোলাপ থাকতে পারে আমার হাতে। ফিরে আসবার সময় ওটা রেখে আসব বাঁধানো পুকুরঘাটলায়। হয়তো তিনি প্রিয় ফুলের জন্যে পরপার থেকে ছায়া-ছায়া হয়ে নেমে আসবেন পুকুরপাড়ে। ফের ফিরে যাবেন মৃতলোকে। কালো গোলাপ বোধহয় লক্ষ্মীছায়াকে মানায়।

জলসাঘরটায় ছিল চমৎকার ভরাট একটা ঝাড়বাতি। আর সারা মেঝে মখমলে মোড়া। গোলাপজলে রোজই বাড়ি ধোওয়া হত। ধূপের গন্ধ বাইরে থেকে পেত পথচারী। তারপর একদিন আকাশে পূর্ণিমা জুড়লে লক্ষ্মীছায়ার গান হত সেখানে।

দূর দূর থেকে শ্রোতা আসত আসরে। সবাই অঢেল পয়সার অধিকারী। হয়তো শিল্পের পৃষ্ঠপোষকও কেউ কেউ। সেই কতকাল আগের কাহিনী। আমি কি আর লক্ষ্মীছায়ার জীবন

BanglaBook.org

কল্পনা দিয়ে আঁকতে পারি? যখন জলসাঘরে ঢুকতেন তিনি—পরনে থাকত নীল রঙ শাড়ি, কানে ঝুমকো, তাতে রশ্মি ছড়ায় পাথর। গলায় স্বর্ণের পুরো কাজ করা হয়। হাতে মাত্র কয়েকটা কাচের চুড়ি। শ্রোতারা নত মাথায় আহ্বান জানাত—আসুন, লক্ষ্মীছায়া, আসুন। আমরা সকলেই আপনার গুণগ্রাহী।

যন্ত্রীরা একপাশে। ভিন্ন সারিতে অতিথির পালা। ঝাড়বাতিতে নানা রঙের বিচ্ছুরণ। লাল মখমলে মোড়া মেঝে। নীল শাড়িতে ঢাকা লক্ষ্মীছায়া। হাতে নীল সব কাচের চুড়ি। ভেতরে ঢুকে তিনি জলসার সামনে প্রথমে প্রণতি জানান সবাইকে। খোলা চুল। উপুড় ঢেলে দেন নিজের চারপাশে।

সুরের মূর্ছনা উঠত জলসাঘরে। বাইরে চাঁদ জেগে রয়। গানের সুরে এবং নূপুরের নিক্বণে বুঝি পাখিদেরও কান সজাগ হয়। তখন কোথায় থাকে নরক? স্বর্গেরই বা কেমন ঠিকানা? সব ছাড়িয়ে সবাই গান ও নাচে বিভোর ততক্ষণে। আকাশের চাঁদ প্রান্ত ছেড়ে উঠে আসে ছাদের উপর। সুরে আকৃষ্ট হয়ে যেন জলসাঘরে উঁকি দিতে চায়।

মহিত বলেছিল, স্যার, যদি স্বর্গ থাকে তাহলে লক্ষ্মীছায়া স্বর্গবাসী হবেন।

মনে আছে হেসে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি এ খবর জানলে কেমন করে?

স্যার, লক্ষ্মীছায়া সব পয়সা গরিবকে দিতেন। নিজের জন্যে কিছুই রাখতেন না তিনি। তার দুয়ারে দুখী এসে ফিরে গেছে এমন শুনি নি।

মহিতের মুখে আমি আরো নানা বর্ণনা শুনেছি। শুধু গরিবের জন্যে নয়; স্কুল, মসজিদ, মন্দিরেও ছিল লক্ষ্মীছায়ার দান।

আমাকে ভাবায় আরেকটি বিষয়। তিনি গাছপালা লাগিয়ে গেছেন অজস্র। এতদিনে সেগুলো বড় হয়ে ছায়া ও ফল দিচ্ছে। আমি এই জায়গাতেই মুগ্ধ হই বেশি। কবে না কবে লক্ষ্মীছায়া বুনেছিলেন মাটিতে। মানুষের জন্যে এও এক দান।

অনেকখানি রাত করে নৌকোয় নৌকোয় ফিরেছি ঘাটে। শুয়েছিলাম পাটাতনে। খোলে জমে থাকা পানি। নদীর ঢেউ এসে দুলিয়ে দিলে সেটুকুর কী ছলাৎছলাৎ আওয়াজ। দু-তীর অন্ধকারে ছাওয়া। আকাশে খুবই মৃদু কয়েকটি তারা। আর গাছপালা নড়ে উঠলে হাওয়া নদীর বুক জুড়ে কেমন খোলামেলা ছোটে। আমি এর চাইতেও গভীর পরশ পাই লক্ষ্মীছায়ার লাগানো বৃক্ষপত্রের পাশ দিয়ে চলতে গেলে।

আচ্ছা, তিনি কি কোনোদিন নদী দেখেছেন? পূর্ণিমা কিম্বা কোনো অমাবস্যা উপলক্ষে লক্ষ্মীছায়া একবারও কি গেছেন বাইরে কোথাও? হয়তো । হয়তো নয়। কেননা পুকুরেই ছিল তার স্নান। সখী পরিবেষ্টিত হবার মতো ছিলেন না স্বভাবে। একা, খুবই একাকিনী নারী।

ইচ্ছে, দারুণ ইচ্ছে জানতে তিনি ভালোবাসতেন কিনা কাউকে। সংসার করেন নি শুনেছি। মানুষের এমন হতেই পারে। তিনি কি পেতে চেয়েছিলন একজনকে? সেখানেই ছিল সব সমর্পণ? কাছে পান নি হয়তো। একজন যে সবচাইতে বেশি জানে, নিজে প্রত্যক্ষ করেছে অন্যদের চাইতে বেশি, তেমন কোনো লোকের সন্ধান কি মহিত দিতে পারে আমাকে? তাহলে যাই। তাকে জিজ্ঞেস করলে সত্য গল্প হয়তো অনেক পেতেও পারি।

নৌকোয় আসতে আসতে এসব ছবির পাশাপাশি পাতলা একটা ঘুম চোখে নেমেছিল। ঘাটে ঠেকতেই মাঝির ডাক আমাকে সজাগ করে।

পাড়ে উঠে দিয়াশলাই জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম। মাঝামাঝি প্রায় রাত। হেমন্তের আঁচল পেরিয়ে আসছে শীতের ছোঁয়া। ফেরিতে চলছে শুধু ট্রাক পারাপার। দোকানপাট সব বন্ধ।

BanglaBook.org

ঘুরে ঘুরে মিনিট দশেকের মাথায় পাই গাড়িটা। অবাকই হয়েছিলাম। সাধারণত যে-ধরনের এক্কার প্রচলন এলাকাটাতে, তা থেকে ভিন্ন ছিল এই বাহন। অন্ধকারে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করতে পারি না। তবুও উঠে বসেই টের পেলাম অনেক যত্নে তৈরি করা গাড়ি। পেছনে দুজন মাত্র বসতে পারে। বেশি জায়গা পেয়ে শরীর ছড়িয়ে দিলাম নরম গদিতে। নিশ্চিতি খুঁজে পাই। কোচওয়ান হঠাৎ বাতাসের গায়ে সপাৎ আওয়াজ করতেই ঘোড়া ছোটে। দ্বিতীয় দফা চমকালাম। এতবড় ঘোড়া আমাদের দেশে সরকারি খামার বা মিলিটারি ছাউনি ছাড়া দেখতে পাওয়ার কথা নয়। জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ দেশি ঘোড়া?

আরবি ঘোড়া হুজুর।

চালক অচেনা। লোকটা বেশ লম্বা। মাথায় বাবরি চুল। এমন রাতে সেটুকু কাঁচাপাকা নির্ণয় করা কঠিন। আলাপ জুড়বার চেষ্টা করি। বলি, তোমাকে আগে কখনো দেখেছি মনে হয় না।

খাঁটি কথা হুজুর, নাও দেখে থাকতে পারেন। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর গাড়ি চালাচ্ছি। ঘাটে কতজন গাড়ির মালিক। কত মানুষ। হয়তো আপনি আমার এই গাড়িতে প্রথম উঠলেন।

ঘোড়া চমৎকার তালে সামনে এগোচ্ছে। একই উচ্চতায় লাফ দিচ্ছে। খুরের শব্দ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। চাকা ঘুরছে তাতেও ঘুরঘুর টান। এত রাতেও ঘোড়া কী তাজা। কোচওয়ান কথা বলে, হুজুর, আপনার ঠিকানা?

সংক্ষেপে জবাব দিই, এদিকে চাকরি।

আরও এগিয়ে যাবার পর সেই বৃক্ষসারির মাঝখানে দিয়ে গাড়িচলা। বসে আছি চুপচাপ। গাছের পাতায় পাতায় চেনা সংগীত। অভিভূত হয়ে যাই। একবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি লক্ষ্মীছায়ার কথা জান?

এক মুহূর্ত। লোকটা ঘাড় বাঁকিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে সতর্কভাবে যেন কী দেখল। বলল, হুজুর, গাড়িটা আমি লক্ষ্মীছায়ার জন্যেই বানিয়েছিলাম।

জবাব শুনে, আমার সমস্ত ক্লান্তি কোথায় যেন উধাও হয়। সোজা হয়ে বসে জানতে চাইলাম, তাকে দেখেছ?

এক-দুবার। তার গান শুনেছি একদিন। লক্ষ্মীছায়া নাকি মৃদুল গোসাইয়ের মেয়ে। কেমন করে যে অমন গান গাইতে শিখে বাইজি হয়ে যান। ভবঘুরে মানুষ ছিলাম হুজুর, এখানে এসে আর যেতে পারলাম না।

ঘোড়া এবার সত্যি গতি কমায়। মনে হচ্ছে, যেন ওটারও কাহিনী শোনার তাড়না। তাজ্জব তো!

হুজুর, মিথ্যে বলব না। ছিলাম মাঝি। এক ভোরে লক্ষ্মীছায়া এসেছিলেন নদীতে স্নানে। সেই দেখা। নৌকো ছেড়ে নেমে এলাম মাটিতে।

আমার কৌতূহল বেজায় বেড়ে উঠেছিল। যে লোক এত জানে, এত কাছে থেকে দেখেছে তাকে পেয়ে গেলাম। ঘোড়া তখন আরও মন্দ্রগতিতে এগুচ্ছিল। জিজ্ঞেস করি, বাড়িতে ঢুকেছ কোনোদিন?

পূর্ণিমায় গান হয় জলসাঘরে। শোনেন ধনীরা সব। আমি ঢুকব কী করে হুজুর? কত বছর ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিলাম দেয়ালের বাইরে। একদিনও কি নদীতে স্নানে যাবেন না তিনি। লক্ষ্মীছায়া বাড়ির বাইরে বেরুলে না!

গল্পে আমি মিশে যাই। বলি, তুমি বেশ জান। তারপর?

হুজুর, গান গেয়ে লক্ষ্মীছায়া কত কী পেতেন। ভোরে কিন্তু ধনদৌলত দুহাতে বিলিয়ে

BanglaBook.org

দিতেন অন্যকে। দূর দেশে এতিমখানায় পর্যন্ত টাকা পাঠানো হত। চাটগাঁয়ে পাহাড়ের বুকে ওর নামে আশ্রমও আছে। গাড়িটা বানিয়েছিলাম যদি লক্ষ্মীছায়া কোনোদিন নদীতে যান—তাহলে ওঠাব তাকে। মন্দ ভাগ্য হুজুর, ওঠেন নি। দিনরাত বাড়ির বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করেছি। অনেক বছর হুজুর। নেপালি দারোয়ানদের শেষে একদিন দয়া হল।

জবাব দেই, তুমি দেখছি অনেকখানি জান।

লক্ষ্মীছায়ার কানে যায় খবর। কী মনে করে আমাকে তিনি একদিন দারোয়ান ডাকিয়ে ভেতর-বাড়িতে নিয়ে যান।

এরপর চুপচাপ সব। নীরবতা নামতেই অস্থির হয়ে উঠি। জানতে চাই, কী হল?

জোড় ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে। বলল, লক্ষ্মীছায়াকে অনুরোধ করেছিলাম নদীতে যাবার জন্য। আমার গাড়িতে করে এক ভোরে স্নানে যাবেন। অবাক! রাজি হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, পূর্ণিমা রাতে এসো। দেখবে চাঁদ যখন জলসাঘরের ওপর থেকে নেমে গেছে নিচের দিকে, তখনই সময়। বিশ্বাস করবেন না হুজুর, ওর গান শুনলাম ওই রাতে। শুনতে পাবার কথা ছিল না, দেয়ালের বাইরে কোনোদিন শুনতে পাবার কথা নয়। সেদিন শুনলাম। চাঁদ তো আর জলসাঘরের মাথা থেকে নামে না। গানের পর গান শুনি। সময় যায়। চাঁদ তাও থির।

আমার সিগারেটের তৃষ্ণা ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, সিগারেট খাও তো?

চট করে এক্কা থেমে গেল। সে বলল, হুজুর, একটু থামলাম।

তারপর কোচওয়ান গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা হাঁটতেই অন্ধকারের জন্যে তাকে আর দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া। কিন্তু সময় চলে যায়, লোক তো ফেরে না—

হল কী?

সিগারেট শেষ করলাম পরপর দুটো। তখন মনে হল, সে ফিরছে। দূরে পায়ের আওয়াজ। ছায়া ছায়া মানুষ কাছে আসে। কিন্তু একি! ঘোড়ার সামনে কে দাঁড়িয়ে! নীল রঙের শাড়ি, কানে ঝুমকো, তাতে রশ্মি ছড়ায় পাথর। এতো হুবহু তিনি!

লাফিয়ে নেমে কাছে গিয়ে ডাকলাম, লক্ষ্মীছায়া, আপনি?

তিনি হাসলেন। নির্ঘাৎ অমাবস্যা ছিল। তবুও দেখতে পেলাম কী অনায়াস তাঁর হাসি ও শুভ্র সুন্দর দাঁতগুচ্ছ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভয়

হুমায়ূন আহমেদ

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কীভাবে পরিচয় হল আগে বলে নিই। কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার এগজামিনার হয়ে পাড়াগাঁ ধরনের এক শহরে গিয়েছি (শহর এবং কলেজের নাম বলার প্রয়োজন দেখছি না। মূল গল্পের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। নামগুলি প্রকাশ করতেও কিছু অসুবিধা আছে)। এই অঞ্চলে আমি কখনো আসি নি। পরিত্যক্ত এক রাজবাড়িকে কলেজ বানানো হয়েছে। গাছ-গাছড়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। বিশাল কম্পাউন্ড । কিন্তু লোকজন নেই, পরীক্ষার জন্যে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম।

একটা সময় ছিল যখন এগজামিনারদের আলাদা খাতিরযত্ন ছিল। কলেজের প্রিন্সিপাল নিজের বাসায় রাখতেন। সকাল-বিকাল নানান ধরনের খাবার। জাল ফেলে পাকা রুই ধরা হত। যত্নের চূড়ান্ত যাকে বলে। এখন সেই দিন নেই। কেউ পাত্তাই দেয় না। বিরক্ত চোখে তাকায়।

আমার জায়গা হল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির পাশের একটা খালি কামরায়। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, আপনাকে হোস্টেলেই রাখতে পারতাম। কিন্তু বুঝতেই পারছেন চারদিকে থাকবে ছাত্র। আপনি অস্বস্তি বোধ করতেন। ছাত্ররা তো আর আগের মতো নেই। মদ টদ খায়। একবার বাজে মেয়ে নিয়ে এসে নানান কীর্তি করেছে। বিশ্রী ব্যাপার। তবে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার বাসা থেকে খাবার যাবে।

থাকার ঘর দেখে চমকে উঠলাম। আগে বোধহয় স্টোররুম ছিল। একটা মাত্র জানালা। রেলের টিকিট দেয়ার জানালার মতো ছোট। ঘরভর্তি মাকড়সার ঝুল। দুটি বিশাল এবং কুৎসিত মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে বসে আছে। এই নিরীহ প্রাণীটিকে আমি অসম্ভব ভয় পাই। এদের ছায়া দেখলেও আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঝাড়ুদারকে পাঁচটা টাকা দিলাম মাকড়সা এবং মাকড়সার ঝুল পরিষ্কার করার

হুমায়ূন আহমেদ

১৯৪৮—

জন্ম নেত্রকোণার মোহনগঞ্জে। বগুড়া জেলা স্কুল থেকে এস এস সি, ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ রসায়নে বি এস সি ও এম এস সি। সার্থ ডেকোটা ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি লাভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ। বর্তমানে লেখাই পেশা। *নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, এইসব দিনরাত্রি, আমার আছে জল, অনিল বাগচীর একদিন, দেবী, শ্রাবণ মেঘের দিন, জল জোছনা* ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। *নিশিকাব্য, ছায়াসঙ্গী, শীত ও অন্যান্য, আনন্দবেদনার কাব্য* উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প এবং *পিপলী বেগম, ভূত ভূতং ভূতৌ, সূর্যের দিন, পুতুল, বোতল ভূত, তোমাদের জন্য রূপকথা, নূহাস এবং আলাদীনের আশ্চর্য চেরাগ* উল্লেখযোগ্য ছোটদের গল্পগ্রন্থ। জনপ্রিয় লেখক। অনেকগুলো জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার পেয়েছেন।

BanglaBook.org

জন্যে। সে কী করল কে জানে, ঘর যেমন ছিল তেমনি রইল। দুটির জায়গায় এখন দেখছি তিনটি মাকড়সা। তৃতীয়টির গায়ের রঙ কালো। চোখ জ্বলজ্বল করছে।

সন্ধ্যাবেলা হারিস নামের একজন লোক একটা হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অথচ দিনের বেলায় ইলেকট্রিসিটি আছে দেখেছি। হারিস বলল, রাত দশটার পর কারেন্ট আসে। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। রাত দশটার পর আমি কারেন্ট দিয়ে করব কী?

সন্ধ্যার পর এলেন কেমিস্ট্রির ডেমনস্ট্রেটর সিরাজউদ্দিন। এঁর সঙ্গে আমার সকালে একবার দেখা হয়েছে। তখন বোধহয় তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখি নি। মুখভরতি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো চাপদাড়ি। মাথায় টুপি। চোখে সুরমা। গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। বেঁটেখাটো একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশের মতো হলেও চমৎকার স্বাস্থ্য। এই গরমেও গায়ে ঘিয়া রঙের একটা চাদর। তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালোই আছি।'

'আপনার খুব তকলিফ হল স্যার।'

'না, তকলিফ আর কী?'

'আগে এগজামিনার সাহেবরা এলে প্রিন্সিপাল স্যারের বাসায় থাকতেন। কিন্তু ওঁর এক ছেলের মাথার দোষ আছে। প্রিন্সিপাল এখন আর কাউকে বাসায় রাখেন না। ছেলেটা বড় ঝামেলা করে।'

আমি বললাম, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—স্যার, ভেতরে এসে একটু বসব?

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আসুন গল্প করি।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব বসতে বসতে বললেন, এখানে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একটা ডাকবাংলো আছে। আপনাকে সেখানে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে রেভিনিউর সি.ও. তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। কোয়ার্টারের খুব অভাব।

'বুঝতে পারছি। এই নিয়ে আপনি ভাববেন না। দিনের বেলাটা তো কলেজেই কাটবে। রাতে এসে শুধু ঘুমানো। বইপত্র নিয়ে এসেছি, সময় কাটানো কোনো সমস্যা না।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন— রাতে ঘর থেকে বেরুতে হলে একটু শব্দটব্দ করে তারপর বেরুবেন। খুব সাপের উপদ্রব।

'তাই নাকি?'

'জি স্যার। এখন সাপের সময়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত থেকে বের হয়। হাওয়া খায়।'

আমার গা হিম হয়ে গেল। এ তো মহাযন্ত্রণা! প্রায় দু-শ গজ দূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাথরুম। আমার আবার রাতে কয়েকবার বাথরুমে যেতে হয়।

'তবে স্যার ঘরের মধ্যে কোনো ভয় নেই। চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে দিয়েছি। সাপ আসবে না।'

'না এলেই ভালো।'

'যদি স্যার আপনি অনুমতি দেন পা উঠিয়ে বসি।'

'বসুন বসুন। যেভাবে আপনার আরাম হয় সেভাবেই বসুন।'

ভদ্রলোক পা উঠিয়ে বসলেন এবং একের পর এক সাপের গল্প শুরু করলেন। সেইসব গল্পও অতি বিচিত্র। রাতে ঘুম ভেঙেছে, হঠাৎ তাঁর মনে হল নাভির উপর চাপ পড়ছে। চোখ মেললেন। ঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোয় লক্ষ করলেন একটা সাপ কুণ্ডলী

BanglaBook.org

পাকিয়ে তাঁর নাভির উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আসল সাপ। শঙ্খচূড়।

একসময় আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, সাপের গল্প আর শুনতে ইচ্ছা করছে না। দয়া করে অন্য গল্প বলুন।

ভদ্রলোক সম্ভবত সাপের গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প জানেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করলেন সাপের সঙ্গমদৃশ্যের বর্ণনা। চৈত্রমাসের এক জোছনায় তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন। বর্ণনা শুনে আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সিরাজউদ্দিন সাহেব বললেন, সাপ যে-জায়গায় এইসব করে তার মাটি কবচে ভরে কোমরে রাখলে পুরুষত্ব বাড়ে।

বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের মুখে কী অদ্ভুত কথা! আমি ঠাট্টা করে বললাম, আপনি সেখানকার মাটি কিছু সংগ্রহ করলেন?

তিনি আমার ঠাট্টা বুঝতে পারলেন না। সরল ভঙ্গিতে বললেন, জি না স্যার।

লোকটি নির্বোধ। মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না। কিন্তু এই লোক উঠছে না। সাপ-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সে আমাকে দেবে বলে বোধহয় তৈরি হয়েই এসেছে। মুক্তি পাবার জন্যে একসময় বলেই ফেললাম, সারা দিনের জার্নিতে টায়ার্ড হয়ে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন বাতিটাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ব।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, কী বলছেন স্যার? ভাত না-খেয়ে ঘুমাবেন? ভাত তো এখনও আসে নি। দেরি হবে। আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসা থেকে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনার কাছে এসেছি। আমি যাওয়ার পর রান্না চড়িয়েছে। গোশ্ত রান্না হচ্ছে।

'তাই নাকি?'

'জি। আপনি গরু খান তো?'

'জি খাই।'

'এখানে কসাইখানা নাই। মাঝে মাঝে গরু কাটা হয়। আজ হাটবার। তাই গরু কাটা হয়েছে। প্রিন্সিপাল সাহেব দুই ভাগ নিয়েছেন।'

'ও আচ্ছা।'

'পঁচিশ টাকা করে ভাগ।'

'তাই বুঝি?'

'প্রিন্সিপাল স্যারের স্ত্রীর রান্না খুব ভালো।'

'তাই নাকি?'

'জি। তবে আজ রান্না করছে তাঁর ছেলের বৌ। যে-ছেলেটা পাগল—তার বৌ।'

'ও আচ্ছা।'

'বিরাট অশান্তি চলছে প্রিন্সিপাল স্যারের বাড়িতে। ছেলে বঁটি নিয়ে তার মাকে কোপ দিতে গেছে। বৌ গিয়ে মাঝখানে পড়ল। এখন ছেলেকে বেঁধে রেখেছে। এইজন্যেই রান্নার দেরি হচ্ছে।'

'কোনো হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেই হত। এদের দুঃসময়ে..'

'কী যে বলেন স্যার! আপনি আমাদের মেহমান না? তা ছাড়া ভদ্রলোকের খাওয়ার মতো হোটেল এই জায়গায় নাই। নিতান্তই গণ্ডগ্রাম, হঠাৎ সাবডিভিশন হয়ে গেল। ভালো একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নাই।'

রাত সাড়ে দশটায় খাবার এল। দুটো প্লেট, সিরাজউদ্দিন সাহেবও আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। হাত ধুতে ধুতে বললেন, প্রিন্সিপাল স্যার আমাকে আপনার সঙ্গে খেতে বলেছেন। আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহমান। আপনি একা একা খাবেন, তা কী হয়!

BanglaBook.org

প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের বৌ অনেককিছু রান্না করেছে। অসাধারণ রান্না। সামান্য সব জিনিসও রান্নার গুণে অপূর্ব হয়েছে। মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল। বেচারি হয়তো চোখের জল ফেলতে ফেলতে রেঁধেছে। আজ রাতে সে হয়তো কিছু খাবেও না।

'সিরাজউদ্দিন সাহেব!'

'জি স্যার!'

'প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের বৌকে বলবেন, আমি এত ভালো রান্না খুব কম খেয়েছি। দ্রৌপদী এরচে ভালো রাঁধত বলে আমার মনে হয় না।'

'জি স্যার, বলব। তবে প্রিন্সিপাল স্যারের স্ত্রীর রান্নার কাছে এ কিছুই না। আছেন তো কিছুদিন, নিজেই বুঝবেন।'

প্রিন্সিপাল সাহেবকে বেশ বিচক্ষণ বলে মনে হল। তিনি একটা টর্চলাইট পাঠিয়েছেন। ফ্লাস্কভরতি চা পাঠিয়েছেন। পান সুপারি জর্দাও আছে কৌটায়।

খাওয়া-দাওয়ার পরও সিরাজউদ্দিন সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন। চা খেলেন, পান খেলেন, দীর্ঘ একটা সাপের গল্প বললেন। বিদায় নিলেন রাত এগারোটার পর। যে-লোকটি ক্রমাগতই সাপের কথা বলেছে তার দেখলাম তেমন ভয়টয় নেই। টর্চ বা লাঠি ছাড়াই দিব্যি হনহন করে চলেছে।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। নতুন জায়গায় চট করে ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে হালকা ধরনের কিছু বই পড়া যায়। হ্যারিকেনের এই আলোয় সেটা সম্ভব হবে না। আমি সিগারেট ধরিয়ে সুটকেস খুললাম বই বের করব। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হল। প্রচণ্ড ভয় লাগল। অথচ ভয়ের কোনোই কারণ ঘটে নি। তবু আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। যেন বন্ধ দরজার ওপাশেই অশরীরী কিছু দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক্ষুনি সেই অশরীরী অতিথি ভয়ংকর কিছু করবে। নিজের অজান্তেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—কে, কে? আর তখন শুনলাম থপথপ শব্দে একজন কেউ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা কাশির শব্দও শুনলাম।

ভয়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল। আমি খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় চারদিক থৈ থৈ করছে। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ এই অস্বাভাবিক ভয় আমাকে অভিভূত করল কেন? এখনও গা ঘামে ভেজা। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। হালকা বাতাস দিচ্ছে, বেশ লাগছে দাঁড়িয়ে থাকতে। লুঙি-পরা খালি-গায়ের একটি লোক বিড়ি টানতে টানতে আসছে। আমাকে দেখেই বিড়ি লুকিয়ে ফেলে বলল, আদাব স্যার।

'আদাব। তুমি কে?'

'আমার নাম কালিপদ। আমি কলেজের দারোয়ান।'

'তুমি কিছুক্ষণ আগে কি এইখানেই ছিলে?'

'জি স্যার। লাইব্রেরি ঘরের সামনে বসে-ছিলাম।'

'কাউকে যেতে দেখেছ?'

'আজ্ঞে না। কেন স্যার? কী হইছে।'

'না, এমনি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইলেকট্রিসিটি চলে এল। আমি নিশ্চিন্ত-মনে বই নিয়ে শুতে গেলাম। স্টিফান কিংএর লেখা ভৌতিক উপন্যাস। দারুণ রগরগে ব্যাপার। একবার পড়তে শুরু

BanglaBook.org

করলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ভয়ভয় লাগে আবার পড়তেও ইচ্ছা করে। পুরোপুরি ঘুমুতে গেলাম একটার দিকে। বারবার মনে হতে লাগল কিছুক্ষণ আগে এই অস্বাভাবিক ভয়টা কেন পেলাম? রহস্যটা কী?

আমি খুব একটা সাহসী মানুষ এ-রকম দাবি করি না। কিন্তু অকারণে এত ভয় পাবার মতো মানুষও আমি নই। একা একা বহু রাত কাটিয়েছি।

সে-রাতে আমার ভালো ঘুম হল না।

দিনের বেলাটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। একুশজন ছেলে পরীক্ষা দেবে। জোগাড়যন্ত্র কিছুই নেই। ল্যাবরেটরির অবস্থা শোচনীয়। একটামাত্র 'ব্যালেন্স' তাও ঠিকমতো কাজ করছে না। প্রয়োজনীয় কেমিক্যালসও নেই। সে নিয়ে কারও মাথাব্যথাও নেই। কেমিস্ট্রির দুজন টিচার। ওঁরা নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছেন। একজন আমাকে বলে গেলেন, কলেজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ক্লাসট্রাসও তেমন হয় নি। একটু দেখেশুনে নিবেন স্যার। পাসমার্কটা দিয়ে দিবেন।

আমি হেসে বললাম, কী করে দেব বলুন। দেবার তো একটা পথ লাগবে। এরা তো মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কিছুই করে নি।

'কী করে করবে বলেন। স্ট্রাইক-ফ্রাইক লেগেই আছে। জিনিসপত্রও কিছু নেই।'

একমাত্র সিরাজউদ্দিন সাহেবকে দেখলাম ব্যবস্থা করার জন্য ছুটাছুটি করছেন। চেষ্টা করছেন কীভাবে ছাত্রদের খানিকটা সাহায্য করা যায়। একুশজন ছাত্রছাত্রীর কেউ তাঁকে একমুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করতে রাজি নয়। একটি মেয়ে সল্ট অ্যানালিসিসে কিছুই না পেয়ে তাদের স্বভাব-মতো কাঁদতে শুরু করেছে। সিরাজউদ্দিন সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন, খবরদার কাঁদবি না। কাঁদলে চড় খাবি। গোড়া থেকে কর। ড্রাই টেস্টগুলি আগে কর। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবি।

এগজামিনারদের একটা দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ রাখা যেন ছাত্ররা তাদের নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করে। কিন্তু সবসময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। দেখেও না-দেখার ভান করতে হয়। এখন যেমন করছি। ছাত্রদের জন্যে আমার খানিকটা মমতাও লাগছে। যন্ত্রপাতি নেই, কেমিক্যালস নেই, স্যারদের কোনো আগ্রহ নেই, ছেলেরা করবে কী?

দুপুরবেলা প্রিন্সিপাল স্যার দেখতে এলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। ভদ্রলোককে মনে হল বিপর্যস্ত। কিছুক্ষণ মুখ কুঁচকে রেখে বললেন—দেন, সবকটিকে ফেল করিয়ে দেন। ঝামেলা চুকে যাক।

কোনো প্রিন্সিপালকে এ-রকম কথা বলতে শুনি নি। আমি হেসে ফেললাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, রাতে অসুবিধা হয়নি তো?

'জি না, হয় নি।'

'সিরাজউদ্দিনকে আপনার খোঁজখবর রাখতে বলেছি। কোনোকিছুর দরকার হলেই তাকে বলবেন। সংকোচ করবেন না।'

'না, করব না।'

'সাপের গল্প বলে মাথা খারাপ করিয়ে দেবে। পাত্তা দেবেন না। এখানে সাপের উপদ্রব একেবারেই নেই।'

'তাই নাকি?'

'আপনাকে ভয় খাইয়ে দিয়েছে বোধহয়? আমাকেও দিয়েছিল। প্রথম যখন আসি, এমন অবস্থা, ঘর থেকে বেরুবার আগে হারিকেন, লাঠি এইসব নিয়ে বের হতাম। হা হা

BanglaBook.org

হ্য।'

প্রিন্সিপাল সাহেব বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না। আগামীকাল সন্ধ্যায় চা খাবার দাওয়াত দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হবার কথা। শেষ হল রাত নটায়। সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিধ্বস্ত অবস্থা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, পরীক্ষা তো আপনার ছাত্ররা দেয় নি, দিয়েছেন আপনি। মনে হচ্ছে ভালোই দিয়েছেন।

আমার সঙ্গেই তিনি ঘরে ফিরলেন। খাওয়া-দাওয়া করে নিজের জায়গায় ফিরে যাবেন। অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্যেই বোধহয় আর সাপের গল্প শুরু হল না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে পড়লেন।

'স্যার যাই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। রাতবিরাতে বেরুবার সময় একটু খেয়াল রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন। সাপেরই এখন সিজন।'

'খুব খেয়াল রাখব।'

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসামাত্র ঠিক আগের মতো হল। তীব্র একটা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। থরথর করে হাত-পা কাঁপছে। নিশ্বাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক্ষুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব। দরজার কড়ায় টন করে একটা শব্দ হল। যেন কেউ কড়া নাড়তে গিয়েও কড়া নাড়ল না। ঠিক তখন ভয়টা চলে গেল। আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক। জগ থেকে ঢেলে একগ্লাস পানি খেলাম। গলা উঁচিয়ে ডাকলাম—কালিপদ, কালিপদ! কেউ সাড়া দিল না। আজ বোধহয় ডিউটি দিচ্ছে না।

বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম। সিগারেট ধরালাম। আকাশে অল্প মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। অপূর্ব আলো-আঁধারি। ঢাকা শহরে বসে এই দৃশ্য ভাবাই যায় না। তবে বড় বেশি নির্জন। ঝিঁঝি ডাকছে। কিন্তু সেই ঝিঁঝির ডাকও ম্যাজিকের মতো হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছে। সেই সময়টা বেশ অদ্ভুত মনে হয়। সবাই যেন বিরাট কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বইপত্র পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল শিয়াল বোধহয় প্রহরে প্রহরে ডাকে। এই ধারণাও দেখলাম সত্যি না। সারাক্ষণই শিয়াল ডাকছে। সেই ডাকের মধ্যে একটা করুণ ব্যাপার আছে। শুনতে ভালো লাগে।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসলাম বারান্দায়। আর তখন দেখলাম কালিপদ আসছে। তার হাতে একগাদা এঁটো বাসনকোসন। সম্ভবত পুকুরে ধোবে।

'এই কালিপদ!'

'আদাব স্যার।'

'একটু শুনে যাও তো!'

কালিপদ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। হিন্দুদের প্রণামের এই ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর।

'রাতদুপুরে ধুতে যাচ্ছ নাকি?'

'হুঁ স্যার।'

'আচ্ছা, তুমি কি সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসা চেন?'

'আজ্ঞে চিনি।'

'কতদূর।'

'দুই মাইলের উপরে হইব।'

BanglaBook.org

'কালিপদ, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারব স্যার, বলেন।'

'তুমি কি আমাকে ওর বাসায় নিয়ে যেতে পারবে?'

কালিপদ অবাক হয়ে বলল, এখন?

'হ্যাঁ, এখন। তুমি তোমার কাজ সেরে আসো, তারপর যাব।'

'আমি উনারে ডাইকা নিয়া আসি?'

'না, ডেকে আনতে হবে না। আমিই যাব। তোমার কোনো অসুবিধা আছে?'

'আজ্ঞে না, অসুবিধা নাই। আমি আসতাছি।'

সিরাজউদ্দিনের বাসায় যাবার ব্যাপারটা যে আমি ঝোঁকের মাথায় করলাম তা না। আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে আমার হঠাৎ-ভয়-পাবার একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটা বের করতে না পারলে আজ রাতেও আমার ঘুম হবে না। আদিভৌতিক কোনো ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া এ পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তুকেই নিউটনের গতিসূত্র মানতে হয়।

ডালভাঙা ক্রোশ বলে একটা কথা বইপত্রে পড়েছি। আজ রাতে সেটা বাস্তবে জানা গেল। হাঁটছি তো হাঁটছিই। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি, কালিপদ আর কতদূর? সে তার উত্তরে ফোঁৎ-জাতীয় একটা শব্দ করছে। লোকটি কথা কম বলে। কথাবার্তা হ্যাঁ না-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা কে জানে গ্রামট্রামের দিকে হয়তো চলতি অবস্থায় কথা কম বলার নিয়ম। তার উপর লক্ষ করলাম লোকটি একটু ভিতু টাইপের, কোনো শব্দ হতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি যখন বলছি—কী হল কালিপদ? তখন আবার হাঁটা শুরু করছে। আমি আগেও দেখেছি দারোয়ানরা সবসময় ভিতু ধরনের হয়।

একসময় আমরা ছোটখাটো একটা নদীর ধারে চলে এলাম। বর্ষাকালে এর চেহারা রমরমা থাকলেও থাকতে পারে; এখন দেখাচ্ছে সরু ফিতার মতো। পায়ের পাতাও হয়তো ভিজবে না।

'কালিপদ—নদীর নাম কী?'

'বিরুই নদী।'

'বিরুই চালের কথা শুনেছি, এই নামে নদীও আছে কে জানত। নদী পার হতে হবে?'

'আজ্ঞে না।'

'এসে পড়েছি নাকি?'

'হ।'

সে হ বলেও থামছে না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না কোথাও থামাবে। মনে হচ্ছে এটা আমাদের অনন্ত যাত্রা। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা কী বলব কিছুই ঠিক করি নি। আগে থেকে ঠিকঠাক করে গেলে কোনো লাভ হয় না। আসল কথা বলবার সময় ঠিক-করে-রাখা কথা একটাও মনে আসে না। কতবার এ-রকম হয়েছে। যৌবনে জরি নামের একজন কিশোরীর সঙ্গে বেশি ভালো পরিচয় ছিল। খুব সাহসী মেয়ে। সে নিজ থেকেই একবার আমাকে খবর পাঠাল আমি যেন সন্ধ্যাবেলায় তাদের ছাদে অপেক্ষা করি। সারাদিন ভাবলাম ছাদের নির্জনতায় কীসব কথা বলব। কতটুকু আবেগ থাকবে। কোন্ পর্যায়ে হাতে হাত রাখব। বাস্তবে তার কিছুই হল না। প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল। জরি কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, ছোটলোক। আমি কড়া গলায় বললাম, আমি ছোটলোক না, ছোটলোক হচ্ছ তুমি। শুধু তুমি একা না, তোমাদের বাড়ির সবাই ছোটলোক এবং তোমার বড় মামা একটা ইতর।

BanglaBook.org

আবেগ ভালোবাসার একটি কথাও দুজনের কেউ বললাম না।

'স্যার, এই বাড়ি।'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ছোট্ট একটা টিনের ঘর। কলাগাছ দিয়ে ঘেরা। খড়-পোড়ানো গন্ধ আসছে। পরিষ্কার ঝকঝকে উঠোন। উঠোনে দাঁড়াতেই কুকুর ডাকতে লাগল। চোর ভেবেছে বোধহয়। ভেতর থেকে সিরাজউদ্দিন চেঁচালেন—কে , কে? কালিপদ বলল, দরজাটা খুলেন। আমি কালিপদ।

দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলল না। হারিকেন জ্বালানো হল। তাতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। সিরাজউদ্দিন একটি লুঙি পরে খালিগায়ে বের হয়ে এলো। চোখ কপালে তুলে বললেন, স্যার আপনি?

'দেখতে এলাম আপনাকে।'

'কেন?'

'কোনো কারণ নেই। ঘুম আসছিল না, ভাবলাম দেখি রাতের বেলা গ্রাম কেমন দেখা যায়। আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছিলেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'জি।'

'খুব লজ্জিত, কিছু মনে করবেন না।'

'আসেন, ভিতরে এসে বসেন।'

সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিস্ময় এখনও কাটে নি। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, কোনো ঝামেলা হয়েছে স্যার?

'না না, ঝামেলা কী হবে? বেড়াতে এসেছি। একটু অসময়ে চলে এলাম এই আর কি।'

'স্যার একটু চা করি?'

'অসুবিধা না হলে করেন।'

'না না, কোনো অসুবিধা নাই। কোনো অসুবিধা নাই।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব ছুটাছুটি শুরু করলেন। উঠোনে চুলা জ্বালানো হল। কালিপদ দেখলাম টাকা নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয় চা বা চিনি নেই, আনতে গেছে। এই রাতদুপুরে কোথায় এসব পাবে কে জানে!

'সিরাজউদ্দিন সাহেব!'

'জি স্যার?'

'লোকজন দেখছি না যে! আপনি একাই থাকেন নাকি?'

'বিয়েশাদি তো করি নাই।'

'করেননি কেন?'

'ভাগ্যে ছিল না। কষ্টের সংসার ছিল। নিজেই খেতে পেতাম না।'

'এখন তো বোধহয় অবস্থা সে-রকম না।'

'জি, এখন মাশাআল্লাহ সামলে উঠেছি। কিছু জমিজমাও করেছি।'

'তাই নাকি?'

'অতি অল্প। ধানী জামি।'

'একা একা থাকেন, ভয় লাগে না?'

'ভয় লাগবে কেন?'

সিরাজউদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভয়ের ব্যাপারটা নিয়েই আমি আলাপ করতে চাই। কিন্তু কীভাবে সেটা করা

BanglaBook.org

যায়? আমি ইতস্তত করে বললাম, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

জি না। এইসব হচ্ছে কুসংস্কার। এই গ্রামেই একটা রেন্ট্রি গাছ আছে। লোকে নানান কথা বলে। কী কী নাকি দেখে। আমি কোনোদিন দেখি নাই। রাতবিরাতে কত যাওয়া-আসা করেছি!

চা তৈরি হয়েছে। চিনি ছিল না। খেজুর রসের চা। চমৎকার পায়েশ-পায়েশ গন্ধ। কাপে চুমুক দিতে দিতে সিরাজউদ্দিন বললেন, তবে জিন বলে একটা জিনিস আছে।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, আপনি বিশ্বাস করেন?

'করব না কেন? কোরান শরিফে পরিষ্কার লেখা জিন এবং ইনসান। হাশরের দিন মানুষের যেমন বিচার হবে, জিনেরও হবে।'

'আপনি জিন দেখেছেন কখনো?'

'জি না। সাধারণ লোকে দেখে না।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। সিরাজউদ্দিন লোকটি আসলেই সাধারণ। কোনোরকম বিশেষত্ব নেই। আমার হঠাৎ ভয়ের সঙ্গে এই লোকটিকে কিছুতেই জড়ানো যাচ্ছে না। সরাসরি এই প্রসঙ্গটা আনাও মুশকিল। তবু একবার বললাম, আপনি চলে আসার পর ঐ রাতে কেমন যেন হঠাৎ করে ভয় পাই।

সিরাজউদ্দিন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, সাপ জিনিসটা তো ভয়েরই। ভয় পাওয়াটা ভালো। তা হলে সাবধানে চলাফেরা করবেন। অসাবধান হলেই সর্বনাশ। রাতে বের হলে টর্চলাইটটা সঙ্গে রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন।

বিদায় নিতে রাত একটা বেজে গেল। সিরাজউদ্দিন আমার সমস্ত আপত্তি আগ্রাহ্য করে এগিয়ে দিতে এলেন। তিনি এলেন বিরুই নদী পর্যন্ত। চাঁদের আলো আছে। চারদিক স্পষ্ট দেখা যায়। তবু তিনি জোর করে কালিপদের হাতে একটা হারিকেন ধরিয়ে দিয়ে উলটা দিকে রওনা হলেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেই মুহূর্তে তিনি বাঁশবনের আড়ালে পড়লেন ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সেইরকম হল। অন্ধ যুক্তিহীন ভয়। যেন ভয়ংকর অশুভ একটা কিছু আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটে আসছে। সেই অশুভ জিনিসটাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমি রক্তের প্রতি কণিকায় তাকে অনুভব করছি। এর ক্ষমতা অসাধারণ। এ অন্য জগতের কেউ। এ জগতে তাকে কেউ জানে না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কাঁপিয়ে দিয়ে ভয়টা চলে গেল। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে লক্ষ করলাম আমি মাটিতে বসে আছি। কালিপদ আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলছে, 'কী হইল স্যার? কী হইল?'

'কিছু হয় নি। মাথাটা কেমন যেন করল।'

'মাথা ধুইবেন স্যার? নদীর পানি দিয়া..।'

'মাথা ধুতে হবে না। চল রওনা দিই।'

বলেও রওনা দিতে পারলাম না। ভয় একেবারেই নেই, কিন্তু শরীর অবসন্ন। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।

'কালিপদ!'

'জে আজ্ঞে।'

'একটু আগে তোমার কি কোনো ভয়টয় লেগেছে?'

'জে না।'

'ও আচ্ছা। চল আস্তে আস্তে হাঁটি।'

BanglaBook.org

কালিপদ বারবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। পাগল ভাবছে কি না কে জানে! ভাবলেও তাকে দোষ দেয়া যায় না। যে-লোক মাঝরাত্রিতে বেড়াতে বের হয়, অকারণে ভয় পেয়ে আধমরা হয়ে যায়, সে আর যা-ই হোক খুব সুস্থ নয়।

পরের দিনটা আমার খুব খারাপ কাটল। কিছুতেই মন বসাতে পারি না। ভাইভা শুরু হয়েছে। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাবগুলিও ঠিকমতো শুনছি না। বি. এস-সি পরীক্ষা দিতে এসে একজন দেখি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফরমুলাতে দুটি ক্লোরিন অ্যাটম দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ হবার কথা। রাগও হচ্ছে না। পাস নাম্বার দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছি। কেমিস্ট্রির হেড বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ?

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, হ্যাঁ, কিছুতেই মন বসছে না। খুব টায়ার্ড লাগছে।

'রাতে ঘুম কেমন হয়েছে?'

'ঘুম ভালোই হয়েছে।'

'যদি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন তা হলে এক ডোজ ওষুধ দিতে পারি।'

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, আপনি কি হোমিওপ্যাথিও করেন?

'জি, ছোটখাটো একটা ডিসপেনসারি আছে। রুগিটুগি ভালোই হয়।'

মফস্বল কলেজের টিচারদের এই এক জিনিস। একটিমাত্র পেশায় তাঁরা খুশি নন। প্রত্যেকের দ্বিতীয় কোনো পেশা আছে। কোন্ পেশাটি প্রধান বোঝা মুশকিল।

'কী স্যার, হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে?'

'জি না, ভূত প্রেত এবং হোমিওপ্যাথি—এই তিন জিনিস আমি বিশ্বাস করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

ভদ্রলোক মুখ কালো করে বললেন, হোমিওপ্যাথিকে বিশ্বাস করেন না কেন? এটা তো হাইলি সাইন্টিফিক ব্যাপার। হ্যানিম্যান সাহেবের কথাই ধরেন। উনি নিজে একজন পাস-করা ডাক্তার ছিলেন।

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আমি একগাদা কথা বলতে পারতাম। টু হানড্রেড পাওয়ারের একটি ওষুধে যে আসলে কোনো ওষুধই থাকে না, সেটা মোলার কনসাইট্রেশন এবং অ্যাভাগেড্রো নাম্বার দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যেত। তর্কের ক্ষেত্রে সবসময় তা-ই করি। আজ ইচ্ছে করছে না। পাঁচটা বাজতেই উঠে পড়লাম। পরীক্ষা তখনও চলছে—চলতে থাকুক। আমি বললাম, আপনারা ভাইভা শেষ করে দিন, আমি ঘরে চলে যাব।

'প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় আপনার না চা খাওয়ার কথা?'

ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ায় মেজাজ আরও খারাপ হল। কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু যেতে হবে।

প্রিন্সিপাল সাহেবও দাওয়াতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে অনেকক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, ও আচ্ছা আচ্ছা। আসুন আসুন। চা খেতে বলেছিলাম, তাই না? কিচ্ছু মনে নেই। আসুন বারান্দায় বসি। নানান ঝামেলায় আছি ভাই।

তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দরজা ধরে পাঁচ-ছ'বছর বয়সের মিষ্টি চেহারার মেয়ে কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছে। এর সঙ্গে দু একটা কথা বলা উচিত—কিন্তু ইচ্ছা করছে না। বাড়ির ভেতর থেকে হিংস্র পশুর গর্জনের মতো গর্জন কানে আসছে। একটি মেয়েও কাঁদছে। কখনো কখনো কান্না থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। এইরকম অবস্থায় চায়ের জন্যে অপেক্ষা করাটাও অপরাধ।

BanglaBook.org

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। ছেলেটা বড় ঝামেলা করছে। শুনেছেন বোধহয়?'

'জি শুনেছি।'

'ভালো খবর কেউ কখনো শোনে না, কিন্তু এইসব খবর সবাই শুনে ফেলে। নিতান্ত অপরিচিত লোকও এসে গায়ে পড়ে বিচিত্র সব চিকিৎসার কথা বলে।'

আমি চুপ করে রইলাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, সেই জাতীয় চিকিৎসা এখন হচ্ছে। সাত নদীর পানিতে গোসল। ঠাণ্ডায় গোসল দিয়ে নিউমোনিয়া বাধাবে।

'ডাক্তারি চিকিৎসা করাচ্ছেন না?'

'তাও আছে। বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সবরকম চিকিৎসাই চলছে। কোনোটাই লাগছে না।'

'অসুখটা শুরু হল কীভাবে?'

প্রিন্সিপাল সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে হয়তো তাঁর ইচ্ছা করছে না। চা চলে এল। শুধু চা নয়—মিষ্টি, শিঙাড়া, কচুরি।

'নিন, চা নিন। খিদে না থাকলে এই খাবারগুলি খাবেন না। সবই দোকানের কেনা। এদিকে আবার খুব ডাইরিয়া হচ্ছে।'

চা-টা চমৎকার। এক চুমুক দিয়েই মাথাধরাটা অনেকখানি সেরে গেল। প্রিন্সিপাল সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, কী করে অসুখটা শুরু হল সত্যি জানতে চান?

'বলতে ইচ্ছে না করলে থাক।'

'না না, শুনুন। গত বৎসর গরমের সময় আমার এই ছেলে তার বউকে নিয়ে এখানে আসে। আমি অনেক দিন থেকেই আসতে বলছিলাম, ছুটি পায় না, আসতে পারে না। ব্যাংকের চাকরি, ছুটিছাটা কম। সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। আমি এখানে এসেছি দুবছর আগে। ছেলে প্রথম এল। আমরাও খুব খুশি। রাত্রিবেলা বেশ গল্পগুজব করছি। সিরাজউদ্দিন এসেছে। সাপের গল্পটল্প করছে। রাত দশটার দিকে সিরাজউদ্দিন চলে যেতেই ছেলে যেন কেমন হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপছে, মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কোনোমতে বলল—তার নাকি অসম্ভব ভয় লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসিতামাশা করতে লাগল। তখন কিছু বুঝতে পারি নি, এখন বুঝছি ঐ রাতেই তার পাগলামির প্রথম শুরু।'

প্রিন্সিপাল সাহেব চুপ করলেন। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছি। আমার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, কয়েকদিন পর আবার এ-রকম হল। সেও রাতের বেলা। কলেজের কিছু প্রফেসরকে খেতে বলেছিলাম। তারা খাওয়াদাওয়া করে চলে যাবার পর আবার ছেলে ঐরকম করতে লাগল।

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, সিরাজউদ্দিন সাহেবেরও দাওয়াত ছিল?

'হ্যাঁ ছিল। কলেজ স্টাফের সবাইকে বলেছিলাম।'

'তারপর কী হল বুলন?'

'আর বলার কিছু নেই। রোজই ও-রকম হতে লাগল।'

'কখন হত?'

'রাত দশটা সাড়ে দশটা।'

আমি কোনো কথা না বলে পরপর দুটা সিগারেট শেষ করলাম। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে পারছি না। আমি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে

BanglaBook.org

বললাম, সিরাজউদ্দিন সাহেব কি প্রায়ই আসে নাকি এখানে?

'আসে আমার ছোট ছেলেটাকে প্রাইভেট পড়ায়। সিনসিয়ার লোক। রোজ সাতটার সময় আসে, রাত দশটা-সাড়ে দশটার আগে যায় না।'

'আমি কি আপনার ছেলেটাকে একটু দেখতে পারি?'

তিনি বেশ অবাক হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। না গেলেই ভালো করতাম। সাতাশ-আটাশ বছরের একটা ছেলে। দড়ি দিয়ে বাঁধা। কী যে অসহায় লাগছে! ছেলেটি আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, একে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করান।

'ঢাকাতেই তো ছিল। কোনোরকম উন্নতি হয় না। টাকার শ্রাদ্ধ। এখানে বরঞ্চ ভালো আছে। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে বেশ খাতির। সে এলে শান্ত থাকে। প্রায় স্বাভাবিক আচরণ করে।'

'তাই নাকি?'

'জি। কয়েকদিন ধরে সিরাজ আসছে না। আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই ছেলেটার উগ্র স্বভাব হয়ে গেছে। গত পরশু বঁটি নিয়ে তার মাকে কাটতে গিয়েছিল।'

'সিরাজউদ্দিন সাহেবের কথাটথা বলে?'

'না, কথাটথা কিছু না। চুপচাপ থাকে, ও এলে খুশি হয় এইটা বুঝি। মুচকি মুচকি হাসে। সিরাজউদ্দিন গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে একেবারে শান্ত হয়ে যায়।'

আমি তাকিয়ে আছি ছেলেটির দিকে। সে গোঙানির মতো একটা চাপা শব্দ করছে। মুখ থেকে অনবরত লালা বেরুচ্ছে। মুখ ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে। একটু আগেই তাকে অসহায় লাগছিল, এখন সে-রকম লাগছে না। বরং কেমন যেন ভয়ংকর লাগছে।

আমি ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললাম, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, আমাকে আজ রাতেই ঢাকা চলে যেতে হচ্ছে।

'কী বললেন?'

'আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। কেন পারছি না সেই কারণও আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কোনোদিন পারব বলেও মনে হয় না।'

'আমি আপনার কথা কিছুতে বুঝতে পারছি না।'

'আপনি পরীক্ষা কয়েকদিন পিছিয়ে দিন। নতুন এগজামিনার এসে বাকিটা শেষ করবে।'

'অসম্ভব কথা আপনি বলছেন।'

'তা বলছি। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।'

সেই রাতেই আমি ঢাকা চলে আসি। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটি স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলি। নিজেকে বোঝাই যে, সমস্তটাই ছিল উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। গ্রামে নির্জনতা কোনো-না-কোনোভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ঘটনার প্রায় চার বছর পর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাঁকে চিনতে পারি নি। তিনি বায়তুল মোকাররমের ফুটপাত থেকে উলেন সোয়েটার কিনছিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

'স্যার, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি সিরাজ।'

'চিনতে পেরেছি।'

'ঐবার স্যার কাউকে কিছু না বলে হুট করে চলে এলেন। পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে

BanglaBook.org

গেল। কী দুর্দশা ছাত্রদের। গরিবের ছেলেপুলে।'

আমি কঠিন স্বরে বললাম, আপনারা সবাই ভালো তো?

'জি ভালো।'

'প্রিন্সিপাল সাহেব, উনি ভালো আছেন?'

'উনার খবরটা জানি না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে জামালপুর চলে গেলেন।'

'ছেলেটা মারা গেছে বুঝি?'

'জি, বড়ই দুঃখের কথা। পাগল মানুষ বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় চলে গেল! নানান জায়গায় খোঁজাখুঁজি। তিনদিন পর নদীতে লাশ ভেসে উঠেছে। আমিই খুঁজে পাই। আমার বাড়ির পাশের ঘাটে গিয়ে লেগেছিল।'

'তাই বুঝি?'

'জি স্যার। খুবই আফসোসের কথা।'

'এখন কি নতুন প্রিন্সিপাল এসেছেন?'

'জি খুবই ভালো লোক। প্রায়ই যাই উনার বাসায়। আমাকে খুব আদর করেন। উনার সঙ্গে গল্পগুজব করি।

'খুবই ভালো কথা।'

'তবে স্যার অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন? প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী মাঝে মাঝে বিনা কারণে ভয় পেয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করেন। অবিকল আগের প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের মতো অবস্থা। মনে হয় বাড়িটার একটা দোষ আছে।'

আমি কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রাইলাম। সিরাজউদ্দিন বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভালো লাগছে স্যার। আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।

সিরাজউদ্দিন হাসল। তার হাসিতে শিশুর সারল্য। চোখ দুটি মমতায় আর্দ্র।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নিশাচরের বাড়ি

শাহরিয়ার কবির

ভয় পেতে যে মজা লাগে, রাঙাদাদুর গল্প না-শুনলে শামুরা কোনো দিন বুঝতে পারত না। নিশির গল্প শোনার পরদিন সকালে ওরা জানতে পারল মাঝরাতে ছোটন নিশির ডাক শুনেছে। রাতের আসরে এ-কথা রাঙাদাদুর কানে যেতেই তিনি দোয়া পড়ে ওর বুকে ফুঁ দিলেন। বললেন, খবরদার রাতে কেউ চার বার ডাক না-ডাকলে দরজা খুলবি না।

শামু বলল, তুমি যে বল, আমাদের পীরের বংশ, ওরা কেউ আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না?

রাঙাদাদু কাষ্ঠ হাসলেন, পীর ছিলেন আমাদের দাদা পরদাদারা। ওঁদের দোয়া আছে বলেই এই আমি এখনও এতকিছুর পাল্লায় পড়েও বেঁচে আছি। তোরাও যেমন যখের বাড়িতে দিব্যি আছিস। মুরুব্বির দোয়া না থাকলে এমন হয় না। তবে দিন যত যাবে দোয়ার জোর তত কমবে। তোরা তো আর সে-সব আমল করিস না। বুঝি না তোদের বাপ-চাচারা কী শিক্ষা দিয়েছে তোদের!

ছোটনকে নিশি ডেকেছিলে বলে সারাদিন ভারি ডাঁট নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। বলল, আর কিসের পাল্লায় পড়েছিলে রাঙাদাদু তাই বল না?

আলাবোলার নল ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে গুড়র গুড়র শব্দ করতে করতে রাঙাদাদু বললেন, কতকিছুর পাল্লায় পড়েছিলাম, বলে শেষ করা যাবে!

কেন যাবে না?

একটা একটা করে বলই না।

সবটুকু বলতে হবে। ছোটরা সবাই আবার হইচই শুরু করে দিল।

শোন তাহলে। একটু নড়েচড়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম করে বসলেন রাঙাদাদু।

আমি তখন বড়দার খড়মপেটা খেয়ে বাড়ির পাট মিটিয়ে দিয়েছি। কয়েক বছর বন বিভাগে চাকরি করে সেটাও ছেড়ে দিলাম। কিছু একটা তো করে খেতে হবে, ঢুকলাম এক ওষুধ

শাহরিয়ার কবির

১৯৫০—

জন্মস্থান ঢাকায়। পৈত্রিক নিবাস ফেনী। সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক, জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে সাংবাদিকতা করেছেন। প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রধানত শিশু সাহিত্যের লেখক। ইতিহাস-রাজনীতি বিষয়ের প্রাবন্ধিক। *নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়, হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা, হানাবাড়ির রহস্য, নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা, পাখারিয়ার খনিরহস্য* উল্লেখযোগ্য ছোটদের উপন্যাস, *একাত্তরের যীশু, আবুদের অ্যাডভেঞ্চার, নিশির ডাক* উল্লেখযোগ্য ছোটদের গল্পগ্রন্থ, *কমরেড মাও সে-তুঙ, কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার* তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ।

কোম্পানিতে। ওদেরই কাছে সেবার আমাকে সুন্দরবনের কাছাকাছি এক জায়গায় যেতে হয়েছিল। জায়গাটা খুলনা থেকে ছাব্বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। কোনোরকমে চলার মতো রাস্তা রয়েছে। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে সে-রাস্তায় কোনো মেরামতের ছাপ পড়ে নি, এটা যে-কেউ দেখে বলে দিতে পারবে।

ভাগ্যিস জিপে যাচ্ছিলাম। অন্য কোনো গাড়ি হলে সামলানো কষ্ট হত। নিজেই চালাচ্ছিলাম। সঙ্গে আর কেউ ছিল না। ঝাঁকুনির ভয়ে খুব আস্তে আস্তে চালাতে হচ্ছিল।

ভাঙা রাস্তার জন্যে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে দায়ী করলে একটু অবিচার হবে। রাস্তার দুপাশে জনমানুষের বিশেষ সাড়াশব্দ নেই। তখন পৌষের শেষ বিকেল। কদাচিৎ পথে খড়ের বোঝা মাথায় দু-একটা লোক চোখে পড়ছিল। ঘর-বাড়িও দূরে দূরে। পুরো অঞ্চলটাকে কেমন পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছিল। দেখে মনে হল বহুদিন আগে হয়তো এখানে লোকজনের আনাগোনা ছিল, বসতি ছিল। হয়তো কোনো কারণে জায়গা এমন বিরান হয়ে গেছে।

যাচ্ছিলাম এক হাটে। সেখানে একজন ডাক্তারকে কিছু ওষুধের প্যাকেট দিয়ে আসতে হবে। রাতটা তাঁর ওখানে কাটিয়ে সকালের দিকে ফিরে আসব—আমার ওপর মোটামুটি এ-রকম নির্দেশ দেয়া ছিল। ভাবলাম ডাক্তারের কাছেই শোনা যাবে জায়গাটার এ দৈন্যদশা কেন।

বাইরে কোথাও খাবার অভ্যেস আমার তখনও হয় নি। সেজন্যে ছোট্ট একটা টিফিন-ক্যারিয়ারে রাতের জন্য কিছু খাবার নিয়েছিলাম।

কতটুকু পথ পেরিয়েছি ঠিক বলতে পারব না। মাইল-মিটার দেখে উঠলেও কোনো লাভ হল না। আমার নড়বড়ে জিপটির স্পিডের কাঁটা, মাইলের ঘর, সবকিছু যেন পৌষের কনকনে হাওয়ায় জমে গিয়েছিল। কোনোটাই কোনো কাজ করছিল না। তাতে মাথাব্যাথার কোনো কারণ ছিল না। ব্রেকও ভালো কাজ করছিল না। তাতেও ভয় পাবার কোনো কারণ ছিল না। কারণ আমি যথেষ্ট আস্তে আস্তে চালাচ্ছিলাম তো বটেই, তাছাড়া পথে মানুষ দূরে থাক কুকুর-বেড়ালও চোখে পড়ছিল না। মোদ্দা কথা, কোনোরকম বিপদেরই সম্ভাবনা ছিল না। আপন মনে 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো' গাইতে গাইতে দিব্যি খোশমেজাজেই যাচ্ছিলাম। অবশ্য আকাশ থেকে সূর্য তখনও বিদায় নেয় নি। তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু বিপদ বাধল তখনই যখন ঘং ঘং ঘোয়াং একটা বিদঘুটে শব্দ করে ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেল। বার বার স্টার্ট নিতে গিয়েও কোনো ফল হল না। ফুয়েল ঠিকই আছে। নেমে বনেট খুলে দেখলাম ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে। যার সাধারণ অর্থ হল ধাক্কা না-লাগালে ইঞ্জিন আর কথা কইবে না।

অন্ধকার না হতেই চোখে অন্ধকার দেখলাম। রাস্তার যে অবস্থা—নিজে সুইচ অন করে ধাক্কা দেয়া যে একেবারেই অসম্ভব—এ-কথা ভাবতে আমার গা হিম হয়ে গেল। আমি কেন, আমার তিনগুণ বেশি জোরালো কেউ যদি থাকত, সেও যে কিছু করতে পারত না, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

ডিটেকটিভ বইয়ে পড়েছি মরিয়া হয়ে মানুষ নাকি অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। কয়েকবার চেষ্টা চালালাম। গাড়ি একচুলও নড়ল না বরং আমিই পা হড়কে মাটির সাথে বুক মেলালাম। মনে হল বইয়ে এমন মিছে কথাও লেখে! সেই লেখকগুলোকে পেলে তখন আমার গাড়ি ঠেলতে লাগিয়ে দিয়ে বাহাদুরি দেখতাম। অবশ্য সবাইকে একসঙ্গে নয়। এক-এক করে।

আগেই বলেছি জায়গাটার গা ঘেঁষে রয়েছে সুন্দরবন। রাতের বেলায় একটা রয়েল বেঙ্গলের সাথে যে মোলাকাত হবে না, এ-কথা জোর গলায় কেউ বলতে পারবে না। যারা সুন্দরবনের কাছাকাছি থাকে তারা জানে পৌষের এক প্রহর রাতেই বাঘেরা বন থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোকের মতো ঘোরাঘুরি করে! আর সুযোগমতো একজনকে পেলেই দিব্যি ঘাড় মটকে বনের ভেতর

BanglaBook.org

সটকে পড়ে।

পাশের ক্ষেতে ধান কাটা হয়ে গেছে। পোড়ো জমি খাঁ-খাঁ করছিল। সে মুহূর্তে আমার মনে হলো শূন্য জমিটায় যেন প্রচুর সরষে ফুল ফুটে আছে। কেমন যেন সবুজ, হলুদ। ভয়ে আমি দিশেহারা হয়ে উঠলাম।

আন্দাজের ওপর হিসেব করলাম আমাকে আরো মাইল ছয়েক পথ পার হতে হবে—যদি হাটে যাবার কোনো ইচ্ছে থাকে। অবশ্য বাঘের পেটে যাবার ইচ্ছে হলে এক গজ হাঁটার কষ্ট স্বীকার করারও কোনো মানে হয় না। গন্ধে গন্ধে তারা ঠিকই খুঁজে বের করে নেবে। মানুষ চিনতে মানুষের ভুল হয় শুনেছি, কিন্তু বাঘের ভুল হয়েছে এ-রকম কথা আমি কখনো শুনি নি।

বাঘের পেটে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না। তবু হেঁটে যেতে পথেই ভুল করে বাঘের পেটে যে যাব না এ নিরাপত্তা মানুষ দূরে থাক খোদ বাঘও দিতে পারত না। এ-নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানোও নিরাপদ নয়। পৌষের সন্ধ্যার নরম সূর্যটা ডুবতে ডুবতে আমার অবস্থার কথা ভেবে হয়তো আফসোস করছিল। তবে রসিকতা করার জন্যে অন্যান্য দিনের চেয়ে সেদিন যে বেশি তাড়াতাড়ি ডুবছিল এতে কোনো সন্দেহ রইল না।

আসন্ন রাতের সম্ভাব্য কিছু ঘটনার কথা মনে হতেই আমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলাম। বাঘ ছাড়া চোর-ডাকাতের কথাও মনে হল। সুন্দরবন অঞ্চলটায় চোর-ডাকাতের খ্যাতি যথেষ্ট। কেউ কম ভয়াবহ নয়। রাতের আগেই আমাকে একটা আস্তানা খুঁজে বের করতেই হবে।

চারপাশে তাকালাম। চিৎকার করলাম। চমৎকার প্রতিধ্বনি হল। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। অবাক হলাম। সন্ধের সময় অথচ একটা পাখির ডাকও শুনতে পেলাম না!

চারপাশে তাকিয়ে আবার চিৎকার করলাম, 'কেউ আছ এখানে?'

প্রতিধ্বনি হল : এখানে...এখানে....এখানে!

সঙ্গে সঙ্গে আমি ভীষণ রকম চমকে উঠলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যটা হারিয়ে গেল। পাগলের মতো ওখানে-সেখানে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। কোথাও যদি মানুষের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। পশ্চিমে বেশ দূরে একটা টিলার মতো দেখতে পেলাম। হঠাৎ দেখি সেখানে একজন মানুষ বসে আছে। চমকানোর কারণ এখানে এ টিলা আর মানুষটিকে আগে লক্ষ্য করি নি।

মানুষটি কে, আগে কোথায় ছিল, এ-সব কথা না-ভেবেই ছুটলাম টিলার দিকে। মানুষের সঙ্গ লাভই ছিল তখন আমার কাছে সবচেয়ে বেশি জরুরি। সূর্য নেই। টিলার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে আলোর শেষ রেশটুকুও আকাশ থেকে মুছে গেল। একটা ফিকে কুয়াশা-ভেজা অন্ধকার নামতে লাগল চারপাশে।

আমি হাঁপাচ্ছিলাম। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মানুষটির কাছে এসে দাঁড়ালাম। অবাক হয়ে দেখি একজন মহিলা। ভদ্রমহিলাই বলা উচিত। মাথায় কাপড় দেয়া। তখন তিনি আমার দিকে তাকান নি। হয়তো লক্ষ্য করেন নি। পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে ছিলেন পাথরের মূর্তির মতো।

দম নিয়ে বললাম, আপনার বাড়িতে রাত কাটানোর একটু আশ্রয় পাব কি? আমি হাটে—

'না।' আমাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে কর্কশ স্বরে বললেন ভদ্রমহিলা। যেন তিনি এ-কথা বলার জন্য তৈরি হয়ে ছিলেন।—আমার বাড়িতে অসুবিধা আছে। বলেই ঘুরে তাকালেন। আমি একটু চমকে উঠলাম। ভদ্রমহিলার মুখটা আগুনে পুড়ে বিচ্ছিরিভাবে ঝলসে গেছে। একটা চোখ নেই। অপর চোখটি—সেই সন্ধে আলোতে দেখলাম ভয়ানক রক্তাক্ত আর বীভৎস রকম

BanglaBook.org

বাইরে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

আমি একটু ইতস্তত করলাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। আশ্রয় যেভাবেই হোক পেতে হবে। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বললাম, বড় বিপদে পড়েছি মা! হাটে যাবার কোনো পথই দেখছি না। গাড়িটা হঠাৎ বিকল হয়ে গেছে। দয়া করে আমাকে আপনার ছেলের মতো ভাবুন।

ভদ্রমহিলা ফিশফিশ করে বললেন, ছেলে!

ভয়ে আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম—ছেলেই মনে করুন মা। আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি আপনারই মতো হতেন। তিনি বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন, মা! মা!

কী যেন ভাবলেন তিনি। আবার ঘুরে পশ্চিমের আকাশে তাকালেন। খুব আস্তে করে বললেন, বাড়িতে আমি একা থাকি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমার জন্য আপনাকে কিছুই করতে হবে না মা।

তিনি তেমনি আস্তে বললেন, আমার সে ক্ষমতাও নেই। তারপর ঘুরে বললেন, এসো আমার সঙ্গে।

কথা না বলে তাকে অনুসরণ করলাম। প্রচুর গাছ। অনেক বছরের পুরনো শাল আর দেবদারু। রীতিমতো ঠাস বুনোট। এরই জন্যে গাছের ভেতরের মস্ত দোতলা বাড়িটা আগে চোখে পড়ে নি।

বহু বছরের ঝড়-ঝাপটা এ বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, চেহারা দেখেই বোঝা যায়। দরজা-জানালা ভাঙা, কোথাও একেবারেই নেই। পলেস্তারা খসে ইঁট বেরিয়ে এসেছে। সারা দেয়ালে অশত্থ আর বটের চারা স্বচ্ছন্দে শেকড় মেলে দিয়েছে। অনেকটা পোড়োবাড়ির মতো মনে হল।

অনেকগুলো প্রশ্ন মনে ভিড় জমাল। এই বিরান জায়গায় কেন বাড়িটা? ভদ্রমহিলা কেন একা থাকেন? একা তাঁর চলে কী করে? এমনিতরো অনেক প্রশ্ন। কিন্তু সব আমাকে চেপে যেতে হল।

ভদ্রমহিলা বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই চৌকাঠ ধরে থমকে দাঁড়ালেন। বিস্মিত হয়ে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। তিনি পেছনে না তাকিয়েই বললেন, দেখ তোমাকে একটা কথা বলব। তোমার ভালোর জন্যই বলছি। আমার বাড়িতে অনেক কিছুই তুমি দেখতে পাবে, যাতে তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। আমি চাই না তুমি কোনো প্রশ্ন করে আমাকে বিরক্ত কর। সবকিছু সহজভাবে নিতে চেষ্টা কোরো। বলেই তিনি ভেতরে ঢুকলেন। আমি আবার তাঁকে অনুসরণ করলাম।

তখন আমার ভয় হল। চোর-ডাকাতের হাতে পড়ি নি তো? বলা যায় না। হয়তো এসে আড্ডা চিনে গেছি বলে আমাকে এভাবে এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু তাও হচ্ছে কোথায়? আমি নিজেই যে জোর করে এসেছি! হতেও পারে। হয়তো ভদ্রমহিলা ভালো বলেই আমাকে বারণ করেছিলেন। তাহলে আমি যেচেই ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছি! ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলাম না।

জীবনে বহুবার বিপদে পড়েছি। বহু অভিজ্ঞতাও হয়েছে। যার জন্যে বহু বিপদের হাত থেকে অভাবনীয় উপায়ে রক্ষাও পেয়েছি। আমার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা হচ্ছে—বিপদে কখনো উত্তেজিত হয়ে মাথাগরম না-করা। যতক্ষণ তুমি ঠাণ্ডা মাথায় থাকবে, ততক্ষণ বিপদের হাতে থেকে উদ্ধার পাবার কথা ভাবতে পারবে। কিন্তু যেই তুমি উত্তেজিত হয়েছ, তখন আর রক্ষা নেই। সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে, অনেক সহজ পথও তুমি ভুলে যাবে। আর কক্ষনো হাল ছাড়তে নেই। তোমার নিশ্বাস যতক্ষণ বইছে ততক্ষণ তুমি বাঁচার আশা করতে পার। বুদ্ধিটাকে যত পার খেলাতে চেষ্টা করবে।

আমি ঠিক করে ফেললাম একেবারে বেঘোরে মরা অসম্ভব। আমাকে তৈরি থাকতে হবে।

BanglaBook.org

পালানোর চেষ্টা করা উচিত হবে না। আমার কাছে এ জায়গার কোনো ঠিকানাই জানা নেই, কিন্তু ডাকাতের সব নখদর্পণে থাকার কথা। যে-মুহূর্তে তারা খবর পাবে আমি পালিয়েছি, তখনই সতর্ক হয়ে যাবে। তখন কেন জানি না আমার মনে হচ্ছিল এ ভদ্রমহিলা আমার কোনো ক্ষতি হতে দেবে না। তাঁর কথামতো চলাটাই সবচেয়ে বেশি উচিত হবে।

অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে একটা ঘরে এসে তিনি বললেন, তুমি এ-ঘরে থাকতে পার। চাদরটা ঝেড়ে ফেল। আমি একটা কম্বল এনে দিচ্ছি।

ঘরটা প্রকাণ্ড। আসবাবপত্র খুব বেশি ঠাহর হল না। তাঁকে বললাম, আমার খাবারগুলো গাড়িতে রয়ে গেছে। আপনি যদি বলেন তাহলে নিয়ে আসি। রাত বেশি হলে অসুবিধে হতে পারে।

তিনি একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন—আগে কেন আন নি? এক্ষুনি যাও, ছুটে যাবে আর আসবে। আমি দরজায় দাঁড়াচ্ছি।

আমি ছুটলাম। এক দৌড়ে রাস্তায় গাড়িটার কাছে এলাম। টিফিন-ক্যারিয়ারটা নিলাম। একটা টর্চ নিলাম। আর কী মনে হতে হাত-দেড়েক লম্বা লোহার স্ক্রু-ড্রাইভারটাও কোমরে গুঁজে নিলাম।

ভদ্রমহিলা রাত হবার কথায় কেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শুধু মনে হল তিনি সত্যিই আমার ভালো চান।

টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে আসছিলাম। তিনি দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি আসতেই খুব শান্ত অথচ কঠিন গলায় আস্তে আস্তে বললেন, আমার এখানে টর্চ জ্বালাতে পারবে না। আমি আলো সইতে পারি না।

থতমত খেয়ে বললাম, তাই হবে মা।

তিনি এবার নরম স্বরে বললেন, ঘরের দরজা ভালোভাবে বন্ধ করবে। খাবার খেয়েই শুয়ে পড়।

মাথা নেড়ে ঘরে ঢুকলাম। তিনি চলে গেলেন। টপ করে একবার টর্চটা জ্বালালাম। উঁচু পুরনো আমলের খাট। চাদরটা টান করে বিছানো। একটা কম্বল ভাঁজ-করা। লক্ষ করলাম চাদর এবং কম্বলের দুটোরই এক কোণের কাছে বেশকিছুটা জায়গা পুড়ে গেছে। ঘরের একদিকে সেকেলে নকশা-আঁকা বিরাট ড্রেসিংটেবিল। আর একদিকে একটা সিন্দুক। প্রায় পুরো একটা দেয়াল জুড়ে সিন্দুকটা। ঘরের দেয়ালের বেশির ভাগ পলেস্তারা খসে পড়েছে। আগুনের ধোঁয়ার কালচে দাগ এখানে-সেখানে।

সিন্দুকের উপর টিফিন-ক্যারিয়ারটা রাখলাম। এক-এক করে তিনটে বাটি খুললাম। পরোটা, ভাজি, ডিম আর পুডিং। বসতেই পানির কথা মনে হল। টর্চ জ্বেলে ঘরের চারপাশে পানির কোনোরকম ব্যবস্থা দেখতে পেলাম না। অবশ্য এখানে পানি না-থাকা খুবই স্বাভাবিক বরং থাকলে সেটা অস্বাভাবিক হত। কিন্তু পানি না হলে যে একেবারেই চলবে না।

বাড়ির ধারেকাছে টিউবঅয়েল কিম্বা কুয়ো নিশ্চয়ই আছে—এই ভেবে টর্চ আর টিফিন-ক্যারিয়ারের একটা বাটি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। টর্চ বেশি জ্বালাতে সাহস হচ্ছিল না। কখন সেই ভদ্রমহিলা দেখে বিরক্ত হন। ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ সেই ভদ্রমহিলা পেছন থেকে ডাকলেন—দাঁড়াও! কোথায় যাচ্ছ?

টর্চ নিভিয়ে বললাম—পানির জন্যে যাচ্ছি।

কোথায় পানি? কর্কশ গলায় আমাকেই প্রশ্ন করলেন তিনি।

আমতা আমতা করে বললাম, এদিকে কোনো টিউবঅয়েল কি—

BanglaBook.org

কে বললে এদিকে পানি পাওয়া যাবে? ভদ্রমহিলার গলার স্বর আরো কর্কশ হয় উঠল—ঘরে যাও! রাতে ঘর থেকে কোথাও বেরুবে না।

অপরাধীর মতো ঘরের উদ্দেশে পা বাড়ালাম, ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। ঘরে ঢুকতে হঠাৎ খট করে একটা শব্দ হল। টর্চের আলো ফেললাম, কেউ কোথাও নেই। মনে হল ভুল শুনছি না তো! বুকটা একটু কেঁপে উঠল। ভুল কেন শুনব? আমার মাথা কি ঠাণ্ডা রাখতে পারছি না? কিন্তু মাথা গরম করলে একটা অঘটন ঘটবে এ-রকম একটা ধারণা আমার এ-বাড়িতে পা দেবার পরপরই জন্মেছিল। সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিলাম।

সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়া দরকার। এই ভেবে সিন্দুকটার কাছে এলাম। টর্চের অলো ফেলতেই চমকে উঠলাম।

একি! টিফিন-ক্যারিয়ারের খাবারগুলো কোথায়? একটু আগে যেখানে দুটো পরোটা, দুটো ডিমের মামলেট, ফুলকপি আর আলু ভাজি ছিল—কিছুই নেই, শুধু পুডিংটুকু অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

কে এল ঘরে? ভদ্রমহিলা ছাড়া এ-বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। তবে কি তিনি? ... তাঁর সঙ্গে তো দেখাই হল। এত কম সময়ে তাঁর পক্ষে খাবারগুলো সরানো সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি এ রসিকতা কেন করবেন? আবার মনে হল হয়তো বাড়িতে লোকজন নেই। খাবার কিছু নেই। বাইরের লোকের কাছে চাওয়াটা লজ্জার কাজ মনে করে, তার চেয়েও বেশি লজ্জার কাজ আমার অগোচরে তাঁকে করতে হয়েছে।

প্রত্যেকটা প্রশ্নের একটা জবাব খুঁজে নিচ্ছিলাম। পুডিংটুকু খেয়ে এ নিয়ে হয়তো আর মাথাও ঘামাতাম না। কিন্তু পুডিং খেয়ে সিন্দুকটার উপর থেকে যখন উঠেছি তখনও একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। যার কথা মনে হলে আজও বুক কেঁপে ওঠে।

টর্চটা খাবার সময় জ্বেলেই রেখেছিলাম। বসেছিলাম সিন্দুকের উপরে। খাবার শেষ হলে মনে হল সিন্দুকের ভেতর থেকে কে যেন উপরের দিকে চাপ দিচ্ছে। নামতেই সিন্দুকের ডালাটা সামান্য ফাঁক হল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে এল। টর্চের আলোতে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমার টিফিন-ক্যারিয়ারের পরোটা যার কিছুটা অংশ তখন সিন্দুকের ভেতরে আর বাকিটা বাইরে—ধীরে ধীরে সিন্দুকের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভারী ডালাটা পড়ে গেল।

পাগলের মতো সিন্দুকের ডালাটা প্রাণপণে ওঠাতে চেষ্টা করলাম। হাত লাগানোর পরমুহূর্তেই মনে হল এ অসাধ্য সাধন আমার মতো দশজনের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক আর ভৌতিক বলে মনে হল। এ-বাড়িটা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে—অন্য কোনো অশুভ শক্তির প্রভাবে রয়েছে। সমস্ত কিছু অশরীরী কোনো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মানুষের কোনো ক্ষমতা এখানে কাজে লাগবে না। আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল—পালাও! আর একমুহূর্ত এখানে থাকা উচিত হবে না।

টর্চ জ্বালব না। মহিলাটি টের পেয়ে যেতে পারেন। আস্তে আস্তে পা টিপে দরজার কাছে এলাম। খুট করে ছিটকানিটা নামিয়ে দরজাটা ফাঁক করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। দরজার সামনে সেই মহিলাটা দাঁড়িয়ে। বারান্দায় ওপাশ থেকে আসা চাঁদের আলোয় মহিলাকে ভয়ানক মনে হল। চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম—চলে যাব। এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি আমাকে যেতে দিন।

আমার গলার স্বর কাঁপছিল। পুরো শরীরটা কাঁপছিল।

মহিলার পেছন থেকে ভারী ফ্যাসফেঁসে গলায় কে যেন বলল, এখান থেকে কেউ জীবিত

BanglaBook.org

ফিরে যেতে পারে না।

লম্বায় সাড়ে ছফুটের মতো, গায়ে ভারি আলখেল্লা, একজন পুরুষ সামনে এগিয়ে এল।

মহিলাটি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। পুরুষটিকে হাত দিয়ে সরিয়ে কঠিন স্বরে বললেন—না। এর কোনো ক্ষতি তুমি করতে পারবে না।

পুরুষটি ধাক্কা মেরে মহিলাকে মাটিতে ফেলে দিল—সরো। পথ ছাড়। ওদের জন্য অনেক রক্ত লাগবে। মানুষের তাজা রক্ত। এভাবে একে ছেড়ে দিতে পারি না।

আমি শুধু অনুভব করছি, এখনও জ্ঞান হারাই নি। একপা দুপা পিছিয়ে গেলাম। লোকটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। আমি আরো পিছিয়ে গেলাম। ছুটে যাবার শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি। লোকটি আমার অক্ষমতার কথা জেনেই আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। আমি আরো পিছিয়ে গেলাম। পা-দুটো অসম্ভব ভারী হয়ে এসেছে। পেছনে দেয়ালের সঙ্গে আমার পিঠ ঠেকল। আর যাবার পথ নেই। লোকটা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে, হাতদুটো সামনে মেলে ধরে।

আর দু-পা এগিয়ে এসে লোকটা আমার গলা টিপে ধরবে। দেখেই মনে হয় অসুরের শক্তি রয়েছে ওর গায়। তখনই আমার মনে হল, আমি এখনও বেঁচে আছি। আমাকে বাঁচতে হবে। শরীরে শক্তি ফিরে পেলাম। কোমরের বেল্টে গোঁজা স্ক্রু-ড্রাইভারটার কথা মনে হল।

আর এক পা!

বাঁ হাতে টর্চটা লোকটার ঠিক মুখের উপর জ্বেলে ধরে ডান হাতে বিদ্যুৎবেগে স্ক্রু-ড্রাইভারটা ওর চোখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম।

একটা মরণ চিৎকার করে লোকটা দুহাতে মুখ ঢাকল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম।

আমি ছুটছিলাম। পেছনে ভারী পায়ের শব্দ। টর্চটা জ্বেলে আমি প্রাণপণে ছুটছি। পায়ের শব্দ ক্রমশ কাছে আসছে। আমি দিগবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছি। যে-ভাবেই হোক এ পিশাচপুরী থেকে আমাকে পালাতে হবে। রাস্তায় উঠে ছুটছি সামনের দিকে।

সে রাতে একরকম ছুটতে ছুটতেই ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওখানে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারাই।

পরে আমার মুখে সব কথা শুনে ডাক্তার এক মিনিট থ মেরে বসে রইলেন। তারপর বললেন—আপনি বেঁচে আছেন তাহলে!

আমি বললাম, বেঁচে আছি, দেখতেই পাচ্ছেন। ও-বাড়িতে ওরা কারা?

ডাক্তার একটু ইতস্তত করে বললেন, ওরা কোনো জীবিত মানুষ নয়, আবার মৃতও নয়। বহুকাল আগে ওটা ছিল এক অত্যাচারী জমিদারের বাড়ি। ভয়ানক অত্যাচারী ছিল জমিদার। অনেকে মারবার চেষ্টা করেছিল, পারে নি। জমিদার ছিল পিশাচসিদ্ধ। একদিন গ্রামের সমস্ত প্রজা খেপে গিয়ে জমিদারের বাড়ি আগুন ধরিয়ে দেয়। বাড়ির সবাই পুড়ে মরে। পরে লোকেরা দেখল পিশাচরা মরে নি। মানুষের রক্ত খেয়ে ওরা বেঁচে রয়েছে। শেষে আস্তে আস্তে একসময় পুরো গ্রামটাই বিরান হয়ে গেল।

রাঙাদাদুর গল্প শেষ হতেই বড় বিবিদাদু এসে তাড়া লাগালেন, তোদের খাবার নিয়ে বৌমারা কতক্ষণ বসে থাকবে? শিগগির নিচে গিয়ে খেয়ে আয়।

রামু ফিসফিস করে শামুর কাছে জানতে চাইল, পিশাচরা কি ডিম পরোটা খায় দাদা?

শামু চাপা গলায় ধমক দিল, চুপ কর হাঁদা, রাঙাদাদুর কানে গেলে আর গল্প শুনতে হবে না।

BanglaBook.org

রহমত চাচার এক রাত

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমরা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেই রহমত চাচা আমাদের দেখতে আসতেন। লম্বা-চওড়া মানুষ, এই বয়সেও শরীর পাথরের মতো শক্ত। আমরা তখন ছোট, আমাদের দু-তিনজনকে এক হাতে টেনে তুলে ফেলতেন ঘাড়ের উপর। খাওয়ার সময় আমরা সবিস্ময়ে তাঁর খাওয়া দেখতাম— একজন মানুষ যে এত খেতে পারে, না-দেখলে বিশ্বাস হয় না। খাওয়া শেষ হবার পর হাত ধুয়ে উঠে পড়ছেন, তখন তার থালায় কেউ প্রায় এক গামলা ভাত ঢেলে দিত, সাথে সমান পরিমাণ মাছ,মাংস বা শুধু ডাল ! খানিকক্ষণ চেঁচামেচি করে আবার খেতে শুরু করতেন, দেখতে দেখতে সব শেষ হয়ে যেত। তাঁর পেটে কোথায় যে এত জায়গা কে জানে ! আমাদের খাওয়া দেখতেন আর মাথা নেড়ে বলতেন, এত কম খেয়ে থাকিস কেমন করে? কোনোদিন তো বাতাসে উড়ে যাবি !

রহমত চাচার সবচেয়ে যেটা মজার সেটা হচ্ছে তাঁর গল্প বলার ঢং। পড়াশোনা জানেন না, জীবনে কোনো বই পড়েন নি, তাই তাঁর সব গল্পই নিজের জীবনের সত্যি গল্প। এমন স্বাভাবিক গলার স্বরে এমন একটা অস্বাভাবিক গল্প বলে যেতেন যে শুনে আমরা হতবাক হয়ে যেতাম। যেমন : অমুক গ্রামের সব মানুষ চোর ছিল, মানুষেরা তাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশে খবর দিল। তখন ব্রিটিশের রাজত্ব, তারা এসে সবাইকে ধরে নিয়ে গেল, নেওয়ার সময় যদি কেউ পালিয়ে যায় তাই সবার হাতে তালু ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে দড়ি ঢুকিয়ে সবাইকে একসাথে বেঁধে রেখেছিল। আমরা অবিশ্বাস করি কেমন করে, তাঁর নিজের চোখে দেখা ! আরেকবার নারকেল নিয়ে কথা হচ্ছে, রহমত চাচা বললেন, কবে নাকি নারকেল গাছ থেকে নারকেল নামানো হয়েছে, নারকেল কেটে পানি গ্লাসে ঢালা হল, দেখা গেল পানির ভেতর কুচো চিংড়ি, পানির সাথে মিশে আছে, ভালো করে না-দেখলে দেখা যায় না। তাঁর নিজের চোখে দেখা ঘটনা —

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১৯৫২—

জন্ম সিলেটে। পৈত্রিক নিবাস নেত্রকোণায়। এস এস সি বগুড়া জিলা স্কুল থেকে এবং এইচ এস সি ঢাকা কলেজ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি এস সি, তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানে এম এ এবং ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে পিএইচ ডি লাভ করেন। শাহজালাল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রধানত ছোটদের জন্য লেখেন। সায়েন্স-ফিকশন লেখক হিসাবে খ্যাতিমান। *দীপু নাম্বার টু, দুষ্ট ছেলের দল, কপোট্রনিক সুখ দুঃখ, মহাকাশে মহাত্রাস, বিজ্ঞানী সফদার আলীর মহামহা আবিষ্কার, ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম, টুকুন জিল* ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য বই।

আমরা কী বলব?

সবচেয়ে মজার ছিল তাঁর ভূতের গল্পগুলি। যখন শুনেছি তখন অবশ্যি মজার মনে হয় নি, ভয়ে হাত-পা শরীরের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়েছিল। এজন্যে কখনো আমাদের সামনে ভূতের গল্প করতে চাইতেন না, ভূতের গল্প শুনে ভয় পেয়ে আমরা নাকি ভিতু হয়ে যাব। তাকে কিছুতেই বোঝানো যেত না যে ভয় পাওয়ার জন্যেই তো ভূতের গল্প শোনা, তা ছাড়া আমরা তো এমনিতেই ভিতু, নূতন করে ভিতু হবার প্রশ্ন কোথায়? যখন বড়রা বসে গল্প করত, কথায় কথায় ভূতের গল্প উঠে যেত, তখন রহমত চাচা একটা-দুটো ভূতের গল্প বলতেন। ভয়ংকর সব গল্প শুনে হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে চায়। তাঁর কাছ থেকে শোনা সবচেয়ে যেটা ভয়ের গল্প সেটা এ-রকম : তার নিজের ভাষাতেই বলি—

সে অনেকদিন আগের কথা, আমার বয়স তখন মাত্র পঁচিশ কি ছাব্বিশ। সে সময়ে আমাদের পাশের গাঁয়ে রশিদ মিয়া নামে একজন লোক থাকত। এ-রকম বদমায়েশ লোক আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি। এমনিতে তার সুদের কারবার ছিল, কিন্তু এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যেটা সে করে নি। লোকজনকে ফাঁকি দিয়ে তাদের জমি লিখে নেয়া থেকে শুরু করে কমবয়েসী মেয়েদের জোর করে বিয়ে করে ফেলা, কিছুতেই তার আপত্তি নেই। শুকনো দড়ির মতো চেহারা, থুতনিতে অল্প কিছু দাড়ি, মাথায় টুপি, মুখে সবসময় পান, কশ বেয়ে পানের পিক পড়ছে, দাঁতগুলি লাল। সেই রশিদ মিয়াকে এক রাতে কারা এসে খুন করে গেল। বাজার থেকে ফিরে আসছিল, বাড়ির কাছে বাঁশঝাড়, তার কাছে আসতেই লাঠির এক আঘাতে মাথা দু-ফাঁক। ধড়ফড় করতে করতে কিছুক্ষণের মাঝেই সে শেষ। মানুষ মারা গেলে খুশি হতে নেই, কিন্তু রশীদ মিয়া মারা গেলে তিন-চার গ্রামের অনেক মানুষ খুশি হয়েছিল।

পরদিন অনেক থানা-পুলিশ হল। সদর থেকে দারোগা নিজে এলেন, লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাগজপত্রে সবকিছু লিখে নিলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন রশিদ মিয়ার লাশ শহরে নিয়ে যেতে। খুনের মামলা—লাশ নাকি কেটে দেখতে হবে।

কে যাবে রশিদ মিয়ার লাশ নিয়ে? দুচোখের বিষ ছিল এলাকার সব লোকের, কারো এতটুকু গরজ নেই। গ্রামের মাতব্বরেরা তখন অনেক কষ্ট করে আমাদের কয়েকজনকে রাজি করালেন। জোয়ান বয়স তখন, ভাবলাম, কী আছে, নিয়ে যাই লাশটাকে। মরে যখন গেছে, রাগ পুষে আর কী হবে? দুজন বলল, তারা যেতে পারে কিন্তু লাশ পৌঁছেই তাদের ফিরে আসতে হবে, বাড়িতে জরুরি কাজ। মাতব্বরেরা তাতেই রাজি, গরমের দিন লাশ বেশিক্ষণ ফেলে রাখা যায় না।

আমরা চারজন আর গ্রামের মাতব্বর, মোট পাঁচজন রওনা দিলাম শহরে। শুকনো টিংটিঙে রশিদ মিয়ার শরীর, কিন্তু কী ওজন, জান বের হয়ে গেল চারজন জোয়ান মানুষের! আমাদের মাঝে আফজালের বয়স কম, ভয় বেশি, একটু পরে-পরে বলল, লাশ এত ভারী কেন? তেনারা ভর করেছেন নাকি? 'তেনারা' কিনা জানি না, কিন্তু চাটাই দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁশের সাঁথে বেঁধে লাশ আনতে আনতে আমাদের কাল ঘাম ছুটে গেল!

নদীর একদিকে শহর, অন্যদিকে লাশকাটা ঘর। আশেপাশে ধানী জমি, মাঝখানে ছোট একটা লাল রঙের ঘর। চারপাশে বুনো জঙ্গল ঘরটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। দরজায় তালা মারা ছিল, কিন্তু পুরনো জং-ধরা তালা ধাক্কা দিতেই নিজে থেকে খুলে গেল। ভিতরে উঁচু টেবিল, কংক্রিট দিয়ে লাশকাটা ঘরের সাথে পাকাপাকিভাবে তৈরি করা হয়েছে। টেবিলের উপর রশিদ মিয়াকে রেখে আমরা বের হয়ে এলাম, ভিতরে কী বোটকা গন্ধ।

BanglaBook.org

বাইরে এসে দেখি কিছু কুকুর। অদ্ভুত কুকুর সেগুলি, লাশকাটা ঘরের আশেপাশে থাকে, মানুষকে ভয় পায় না। বেওয়ারিশ লাশ নিশ্চয়ই জানাজা না পড়িয়েই আশেপাশে পুঁতে ফেলে। দেখলাম, কুকুরগুলি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে হাড়গোড় বের করছে, আমাদের দেখে সরে গেল না, উল্টো আমাদের চোখের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে রইল, ভাবখানা এই —লাশগুলি হেঁটে বেড়াচ্ছে কেমন করে? দেখে কেমন জানি ভয় লাগে।

যে দুজনের ফিরে যাবার কথা তারা একটু বিশ্রাম নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দিয়ে দিল, বেশি রাত হবার আগেই তারা গ্রামে পৌঁছাতে চায়। আমরা বাকি তিনজন অপেক্ষা করছি, কিন্তু লাশ কাটার জন্যে ডাক্তার বা অন্য কেউই আসে না। আবার রাত হয়ে গেলে মুশকিল, তাই আমাদের মাতব্বর ঠিক করলেন থানায় গিয়ে খোঁজ নেবেন। একা যেতে ভরসা পান না, গ্রামের মানুষ শহরে গেলে মানুষের ভিড়ে তাল হারিয়ে ফেলেন, সাথে আরেকজনকে নিয়ে যেতে হয়। আফজাল কখনো শহর দেখে নি, আমি তাকে বললাম সাথে যেতে, শহরটা দেখে আসুক। মরা একটা লাশ তো পালিয়ে যাবে না, একজন থাকলেই হয়। ঐ বাজে কুকুরগুলি না থাকলে পাহারা দেবারও দরকার ছিল না। আফজাল আমাকে একা রেখে যেতে ইতস্তত করছিল, জায়গাটা নাকি ভালো নয়। আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম, পরিষ্কার দিনের বেলা, চারপাশে ধানের ক্ষেতে চাষীরা কাজ করছে— ভয়ের কী আছে?

ওরা চলে গেলে আমি একা একটু দূরে বসে রইলাম, মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে লাশকাটা ঘরটাকে দেখি। কুকুরগুলি ঘুরঘুর করছে, গোঁ গোঁ করে চাপাস্বরে নিজেদের ভিতরে ঝগড়া ক'রে, মাঝে মাঝে মাটি থেকে খুঁড়ে তুলে কী যেন কচমচ করে খায়, ভারি অস্বস্তি লাগে মনে। কথা ছিল ওরা ঘণ্টাখানেকের মাঝে ফিরে আসবে, কিন্তু বেলা পড়ে এল, তবু তো কেউ আসে না! আমি পড়েছি মুশকিলে; না পারি যেতে, না পারি থাকতে। চাষীরা সবাই বাড়ি ফিরে যেতে শুরু করে। দু-একজন কৌতূহলী মানুষ আমার সাথে কথাবার্তা বলল। রশিদ মিয়া কে, বাড়ি কোথায়, কীভাবে খুন হল সব বৃত্তান্ত খুলে বলতে হল। লাশটাকে দেখতে চাইলে আমি ভিতরে নিয়ে চাটাই খুলে দেখালাম। মানুষের এই একটা জিনিস বড় আশ্চর্য, একটা মরা মানুষ না-দেখে কিছুতেই যাবে না। মরে যাবার পর রশিদ মিয়ার চোখ কেউ বন্ধ করে দেয় নি, তাই চোখ খোলা, উপরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। মুখটা অল্প হাঁ-করা, ময়লা হলুদ দাঁত বের হয়ে আছে, দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। চাষীরা আমাকে বলল লাশকাটা ঘরের দরজাটা দড়ি দিয়ে বেঁধে চলে যেতে। সন্ধে হয়ে আসছে, আজ আর কেউ আসবে না। আর এই জায়গাটা নাকি বাড়াবাড়ি রকমের খারাপ, মানুষজন নাকি দিনদুপুরেই ভয় পায়। রাতে নাকি বিরাট বিরাট শাদা রঙের কুকুর ঘোরাঘুরি করে এখানে, কোথা থেকে আসে কোথায় যায় কেউ জানে না। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের গ্রামের মাতব্বর খুব দায়িত্বশীল মানুষ, আমি জানি তিনি আফজালকে নিয়ে ফিরে আসবেনই। একা আমাকে এখানে রেখে গেছেন সেটা তাদের খুব ভালো মনে আছে, ফিরে এসে আমাকে না-দেখলে আবার উল্টো ঝামেলা হয়ে যাবে। ভূতের ভয় আমার নেই, আমি ঠিক করলাম আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, এর মাঝে তারা যদি না আসে কিছু একটা করা যাবে।

আমি একা বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছি আর রশিদ মিয়াকে গালি দিচ্ছি, শালা বেঁচে থাকতে তো জ্বালিয়েছেই, মরেও জ্বালিয়ে গেল। কতক্ষণ বসে ছিলাম মনে নেই, হঠাৎ শুনি শোঁ-শোঁ বাতাসের শব্দ। অন্ধকারে বুঝতে পারিনি কখন আকাশ মেঘে ঢেকে ফেলেছে, প্রচণ্ড বাতাস দিচ্ছে। দেখতে দেখতে ভীষণ ঝড় শুরু হল, পারলে আমাকে প্রায় উড়িয়েই নেয় বাতাসে। একটু পর বাতাসের সাথে শুরু হল বৃষ্টি, দেখতে দেখতে আমি ভিজে একেবারে

BanglaBook.org

চুপসে গেলাম, ঠাণ্ডাও লাগছে প্রচণ্ড। ভাবলাম অনেক হয়েছে আর নয়, এখন পালাই। ঝড়ের মাঝে যাব কোথায় তাও জানি না। যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি তখন হঠাৎ শুনি গলার আওয়াজ। ঝড়ের মাঝে বোঝা যায় না, কিন্তু মনে হল মাতব্বরের গলার স্বর। আমিও চেঁচিয়ে ডাকলাম তাদের, তারাও উত্তর দিল আমি স্পষ্ট শুনলাম। আমার বুকে তখন সাহস ফিরে এল, সবাই ফিরে আসছে তাহলে! প্রচণ্ড বৃষ্টি তখন, ভাবলাম বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজে কী লাভ, লাশকাটা ঘরের ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করি, মাথার উপর অন্তত একটা ছাদ তো আছে!

আমি লাশকাটা ঘরে ঢুকছি, হঠাৎ কেন জানি মনে হল কাজটা ভালো হচ্ছে না, কে জানি মনের ভিতরে বলে উঠল, খবরদার! যাসনে, ভিতরে বিপদ হবে। কেমন জানি শিরশির করে উঠল আমার শরীর। কিন্তু তখন জোয়ান বয়স, বুদ্ধি কম, সাহস বেশি। ভাবলাম, আরে ধুর! আমার ভয়টা কিসের, ঐতো সবাই এক্ষুনি এসে যাবে। আমি ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, ভীষণ বৃষ্টি আসছিল। আড়চোখে তাকিয়ে রশিদ মিয়ার লাশটাকে একবার দেখলাম। এমনিতে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, বিদ্যুৎ চমকালে দেখা যায় রশীদ মিয়ার লাশ একই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে পড়ে আছে।

ভিজে কাপড় খুলে নিংড়িয়ে মাথাটা মুছে একটু আরাম হল, বাইরে তখনো বৃষ্টি। লাশটার দিকে পিছন দিয়ে দরজার কাছে বসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি, কিন্তু ওরা তো আর আসে না! একটু একটু করে অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল, কিন্তু ওদের তো আর দেখা নেই। আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম, ওটা নিশির ডাক ছিল, সাথে সাথে ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

মানুষ বেশি ভয় পেলে কিছু করতে পারে না, চিন্তা-ভাবনা গুলিয়ে যায়, বুদ্ধি-বিবেচনা কমে আসে। আমি নড়তে সাহস পাই না, দরজা খুলে বাইরে যাবার শক্তি নেই, মনে হয় দাঁড়ালেই পিছন থেকে রশিদ মিয়া লাফিয়ে পড়বে আমার উপর। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম, বোঝালাম, কিছু নয়, রশিদ মিয়া মরে গেছে, মরা মানুষ কী করবে? বৃষ্টিটা একটু কমলে বের হয়ে শহরের দিকে যাব, আজ অনেক হয়েছে। আর নয়। চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ মনে হল পিছনে কী একটা শব্দ হল, চাটাইয়ে শুয়ে থাকা রশিদ মিয়া নড়ে উঠলে যে-রকম শব্দ হবে সে-রকম। বুকটা ছাঁৎ করে উঠল ভয়ে, কিন্তু নিজেকে বোঝালাম। ইঁদুর হবে নিশ্চয়ই। বৃষ্টিটা তখন কমে আসছে, আরেকটু কমলেই বের হয়ে যাব।

আমি এখন বুঝতে পারি আমার ওপর কিছু-একটা ভর করেছিল সে রাতে, বিচারবুদ্ধি কমে গিয়েছিল কোনো কারণে। প্রথমে এভাবে একা ও-রকম একটা জায়গায় ঢোকা আমার মোটেও উচিত হয় নি। তা ছাড়া যখন বুঝতে পেরেছিলাম ওদের গলার স্বর আসলে ভুল শুনেছি, তখনই আমার বের হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, আমি ভিতরে বসে আছি। হঠাৎ মনে হল বাইরে কী একটা যেন ছুটে গেল। আমি চমকে উঠি, কিন্তু চমকে উঠে বসেই থাকি, আর কিছু করি না। বাইরে তাকাতে ভয় হয়— তাই দরজাও আর খুলি না। কাঠ হয়ে বসে আছি, হঠাৎ আবার স্পষ্ট শুনলাম টেবিলে চাটাইয়ের উপর রশিদ মিয়ার শরীর বেশ ভালোভাবে নড়েচড়ে উঠল। ভয়ে আমার শরীরের সব লোম খাড়া হয়ে যায়। ইঁদুরের শব্দ এটা নয়, ইঁদুর এত জোরে শব্দ করতে পারে না। পিছনে তাকানোর সাহস নেই, যদি কিছু একটা দেখি!

বৃষ্টি কমে এসে তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আকাশে বেশ বড় একটা চাঁদ, লাশকাটা ঘরের উপরে ঘুলঘুলি দিয়ে ভিতরে আলো এসে পড়েছে। মাঝে মাঝেই চাঁদ মেঘে ঢেকে যায় আবার মেঘ থেকে বের হয়ে আসে, আমি বসে বসে তাই দেখছি। কতক্ষণ এভাবে

BanglaBook.org

বসে ছিলাম জানি না, মনে হয় কয়েক যুগ। বাইরে তখন ছোটাছুটির শব্দটা ভীষণ বেড়েছে। কুকুর শেয়াল কিছু-একটা এদিক থেকে সেদিক, সেদিক থেকে এদিক ক্রমাগত ছোটাছুটি করছে। আমি দেখি আর পারি না, নড়তে চড়তে ভয় হয়, শুধু মনে হয় পিছন থেকে কিছু-একটা আমার উপর লাফিয়ে পড়বে। তবু খুব সাহস করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম আর সাথে সাথে আমার স্পষ্ট মনে হল চাটাই থেকে রশিদ মিয়া উঠে বসল। অসম্ভব ভয় পেলাম আমি, চ-ন-ন-ন করে মাথায় রক্ত উঠে গিয়ে শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা কী একটা বয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দরজা খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দরজা কে যেন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে, যতই ধাক্কা দিই দরজা আর খোলে না। পাগলের মতো লাথি দিচ্ছি দরজায়। আর তখন হঠাৎ মনে পড়ল যে, দরজাটা ভিতর দিয়ে খোলে। ভয়ে তখন ঘেমে গেছি। আমি একটানে দরজা খুলে ফেললাম, এক দৌড় দেব, কিন্তু সামনে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

এইটুকু বলে রহমত চাচা একটু থামলেন, তাঁর নিশ্চয়ই পুরো দৃশ্যটা মনে পড়ে গেছে। মাথা ঝাঁকিয়ে খানিকক্ষণ একপাশে তাকিয়ে থেকে আবার শুরু করলেন—

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি লাশকাটা ঘর ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে কুকুরের মতো কতগুলো প্রাণী। দেখতে কুকুরের মতো হলেও কুকুর থেকে অনেক বড়, চোখগুলি জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে, গায়ের রং ধবধবে শাদা। আমাকে দেখে সবগুলি নড়েচড়ে বসে, চাপাস্বরে ডাকে, কেমন যেন হিংস্র ভাবভঙ্গি, যেন সবগুলি একসাথে লাফিয়ে পড়বে আমার উপর। আমি আতঙ্কে পাগলের মতো হয়ে আবার ভিতরে ঢুকব, তখন তাকিয়ে দেখি রশিদ মিয়া দুহাতে টেবিলটা ধরে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। মুখে কেমন জানি একটা ধূর্ত হাসি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি স্থির, পাথরের মতো। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমার দিকে তাকিয়ে আমার ভিতর দিয়ে যেন দেখছে।

মানুষ বেশি ভয় পেলে সব বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। আমার শুধু মনে হতে লাগল এক্ষুনি গিয়ে রশিদ মিয়াকে চেপে শুইয়ে দিতে হবে। কেন আমার সে-রকম মনে হচ্ছিল এখনো আমি জানি না। শুধু মনে হচ্ছিল ও মরা মানুষ, ওর বসে থাকার কথা না, ওর বসে থাকা সাংঘাতিক একটা সর্বনাশের ব্যাপার। নিশ্চয়ই পাগল টাগল হয়ে গিয়েছিলাম, সত্যি সত্যি যখন ভিতরে ঢুকছি তখন হঠাৎ শুনি প্রচণ্ড এক ধমক, কে? কে ওখানে?

মুহূর্তে আমার জ্ঞান ফিরে এল! ভাবলাম, সর্বনাশ, আমি এ কী করতে যাচ্ছি! তাড়াতাড়ি ঘুরে বাইরে তাকিয়ে দেখি একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। মনে হল বয়স্ক, লম্বা-চওড়া, গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি। আমাকে তাকাতে দেখে আবার প্রচণ্ড জোরে একটা ধমক দিল, কী করছ ওখানে? বের হয়ে এস এক্ষুনি, এক্ষুনি বের হয়ে এস।

ভয়ে তখন আমার সারা শরীর কুলকুল করে ঘামছে, আমি কোনোমতে টলতে টলতে বের হয়ে এলাম। রশিদ মিয়ার লাশ দেখিয়ে কিছু একটা বলতে যাব, লোকটা আবার ধমকে উঠল, খবরদার, পিছনে তাকাবে না, সোজা বের হয়ে এস।

আমি লাশকাটা ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। কুকুরের মতো জন্তুগুলি কেন জানি অনেক পিছনে সরে গেছে, সেখান থেকেই চাপাস্বরে গোঁ গোঁ করছে। আমি লোকটার দিকে ছুটে যাচ্ছিলাম, লোকটা আবার ধমকে উঠল, এদিকে না, তুমি সোজা সামনের দিকে হাঁটো।

আমার নিজের ওপর তখন কোনো জোর নেই, লোকটার কথামতো টলতে টলতে হাঁটতে থাকি। পিছন থেকে লোকটা বলল, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটো, খবরদার পিছনে তাকাবে না।

আমি আচ্ছন্নের মতো হাঁটতে থাকি, খানিকক্ষণ পর কী একটা বলতে যাব, লোকটা বলল,

BanglaBook.org

কোনো কথা নয়, সোজা সামনের দিকে হাঁটো।

আমার হঠাৎ খটকা লাগল, লোকটা বুঝল কেমন করে আমি কথা বলব? তা ছাড়া এত বৃষ্টি হয়ে চারদিকে কাদা-পানি হয়ে আছে, আমি ছপছপ করে হাঁটছি, লোকটার হাঁটায় কোনো শব্দ নেই কেন? ঘুরে পিছন দিকে তাকাব, লোকটা তখন আবার প্রচণ্ড একটা ধমক দিল, খবরদার, পিছনে তাকাবে না।

আমার কী হল জানি না, তবু আমি পিছনে তাকালাম। তাকিয়েই বুঝলাম কেন সে পিছনে তাকাতে নিষেধ করেছে। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় পিছনের লোকটা আসলে মানুষ নয়, চেষ্টা করছে মানুষের মতো রূপ নিতে। অন্তত দশ ফুট উঁচু, কালো, নাক-মুখ-চোখ আছে, কিন্তু যে-রকমভাবে থাকার কথা সে-রকমভাবে নেই, অন্যভাবে আছে। আমি তাকাতেই জিনিসটা অদ্ভুত একটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল। দেখলাম ওর চোখ-নাক-মুখ নড়তে থাকে, যেন প্রাণপণ চেষ্টা করছে সেগুলিকে আটকে রাখতে, যেন খুলে আসবে হঠাৎ করে...

এরপর আমার আর কিছু মনে নেই।

পরে আফজালদের কাছে শুনেছি আমাকে ওরা যখন পেয়েছে তখন আমি নাকি পাগলের মতো ছুটছি, ওরা যেদিক দিয়ে আসছিল সেদিকেই। ওরা দুজন মিলে নাকি ধরে রাখতে পারে না, সারা শরীর থেকে নাকি তেলতেলে পিছল কী একটা জিনিস বের হচ্ছে। যখন জোর করে ধরে কিল ঘুসি মেরে আমাকে ধাতস্থ করল, আমি নাকি বিড়বিড় করে কী একটা কথা বলে জ্ঞান হারালাম। ওরা শুধু রশিদ মিয়ার লাশ কথাটা বুঝতে পারল। থানার লোকজনের ঝামখেয়ালিপনার জন্যে ওদের দেরি হয়েছিল, তাড়াহুড়ো করে যখন নদীর ঘাটে এসেছে, তখন ঝড়ের জন্যে খেয়া বন্ধ। ঝড় কমে যাওয়ার পরেও কাউকে পাওয়া যায় না, অনেক কষ্ট করে একজনকে রাজি করিয়ে ওরা নদী পার হয়েছে। আমাকে ধরাধরি করে ওরা পাশের গ্রামে নিয়ে গেল, সেখান থেকে পরের দিন বাড়িতে।

রহমত চাচা থামতেই কে একজন জিজ্ঞেস করল, রশিদ মিয়ার লাশের কী হল?

লাশকাটা ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল, কুকুর-শেয়াল টেনে নামিয়েছে হয়তো। কে জানে। রহমত চাচা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমাকে আসলে সে রাতেই মেরে ফেলত, লোকজন ঠিকই বলেছিল, জায়গাটার দোষ আছে। আমি মরেই যেতাম, জিনটা বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, জিন? আপনি বুঝতে পারলেন কেমন করে সেটা জিন?

রহমত চাচা বললেন, তখন বয়স কম ছিল, অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই বুঝতে পারি নি, এখন বুঝি।

কীভাবে বোঝেন? আর কখনো জিন দেখেছেন?

রহমত চাচা হঠাৎ উঠে পড়েন, ধমক দিয়ে বলেন, যাও যাও, ঘুমাও গিয়ে। বাচ্চা-ছেলেরা কেন জিন-ভূতের গল্প শুনতে চাও?

আমরা তবু বসেই থাকি, ওঠার সাহস অনেক আগেই চলে গেছে। দিনের আলো দেখার আগে কোনো ওঠাউঠি নেই।

BanglaBook.org

কমলা রঙের ভূত

ইমদাদুল হক মিলন

এই ভূতটা একেবারেই গবেট টাইপের। মাথায় ঘিলু বলতে কিচ্ছু নেই। হদ্দ বোকা আর বেজায় অলস। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা মুখে পুরে সারাক্ষণই চুষছে। অতিরিক্ত চোষার ফলে আঙুলটা গেছে কাঠির মতো সরু হয়ে। তবে নখটা যেমন ছিল তেমনি আছে। চ্যাপটা, লম্বা। এজন্যে আঙুল চোষার সময় দূর থেকে দেখে যে-কেউ ভাবতে পারে বুড়ো আঙুল নয়, ভূতটা একখানা কাঠি লজেন্স চুষছে।

বোকা ভূতদের মুখে লালা খুব বেশি হয়। আঙুল চোষার সময় তাই এই ভূতটির মুখ দিয়ে গাবের আঠার মতো লালা পড়তে থাকে দেখে ভূতগাঁয়ের খবিস ভূতগুলো পর্যন্ত ছ্যাঁ ছ্যাঁ করে। ছানাপোনাগুলো এই ভূতটির ছায়া মাড়ায় না। দেখলেই পাঁই করে উধাও হয়ে যায়। সে না পারে বড়দের সঙ্গে মিশতে, না পারে ছোটদের সঙ্গে। ফলে চৌপর দিন আঙুল চোষা ছাড়া তার কোনো কাজ নেই।

ভূতদের নিয়ম মানুষের মতো নয়, উল্টো। মানুষ দিনেরবেলা কাজকর্ম করে রাতেরবেলা ঘুমোয়। ভূতেরা রাতেরবেলা কাজকর্ম করে দিনেরবেলা ঘুমোয়। মানুষ চলে দুপায়ে ভর দিয়ে, মাথা থাকে উপর দিকে আর ভূতেরা চলে মাথায় ভর দিয়ে, পা দুটো থাকে উপর দিকে। বোকা বলে, অলস বলে এই ভূতটির নিয়মকানুনের ঠিক নেই। ভারি উল্টোপাল্টা কাজ করে সে। ভূত হয়েও ভূতদের মতো নয়, মানুষের মতো আচার-আচরণ তার। দিনেরবেলা ঘুমটা তার আসেই না। সে ঘুমোয় রাতে, যখন ভূত-গাঁ উজাড় করে ভূতরা চলে যায় চাকরি-বাকরিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের যাবতীয় ভূত যখন ফিরে আসে, এসে যখন ঢুলু ঢুলু চোখে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে তখন সে জেগে ওঠে। তারপর নাশতা-টাশতা সেরে দিনমান একাকী বসে থাকে গাঁয়ে ঢোকার মুখে যে শেওড়া গাছ সেই গাছে। বসে বসে আঙুল চোষে।

কিন্তু ছেলে বড় হয়ে যাচ্ছে, ভূত-বংশে জন্মেও ভূত

ইমদাদুল হক মিলন
১৯৫৫—
জন্ম বিক্রমপুরে। গেণ্ডারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, অর্থনীতিতে সম্মান সহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। *নিরন্নের কাল, তাহারা, বারো রকম মানুষ* ছোটগল্পের বই, *কালাকাল, ভূমিপুত্র, কালোঘোড়া, নূরজাহান, রূপনগর, মৌসুমী, বাঁকাজল* তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ছোটদের জন্য উল্লেখযোগ্য বই *চিতা রহস্য, ডাকাতরাও মানুষ, এক যে ছিল টুনি, রাত বারোটা* প্রভৃতি। জনপ্রিয় লেখক। অনেকগুলো জাতীয় পর্যায়ের সম্মানজনক পুরস্কার পেয়েছেন।

হতে পারছে না সে, এই বয়সী ভূতেরা কত কী করে, এ তো কিছুই করতে পারছে না—এসব দেখে ভূতটির মা-বাবা মহাচিন্তায় পড়ে গেল। একমাত্র ছেলে না হলে তাকে নিয়ে এত চিন্তার কিছু ছিল না। পাঁচ-দশটা ছেলে থাকলে, একটা বোকা হলে, অলস হলে কী যায়! সে ঘরে বসে থাকত, অন্য ভাইরা তাকে রোজগার করে খাওয়াত। কিন্তু এ তো তাঁদের একমাত্র পুত্র। তাছাড়া তারাও বুড়ো হতে চলল। মরে গেলে ছেলেটির উপায় হবে কী? কে খাওয়াবে তাকে? ভূতেরা তো আর ছেলেমেয়ের জন্য মানুষের মতো বিষয়-সম্পত্তি রেখে যায় না। দু-একটা বুদ্ধি-পরামর্শ রেখে যায়, দু-একটা কায়দা রেখে যায়। মাথায় ঘিলু থাকলে ওইসব বুদ্ধি-পরামর্শ আর কায়দা নেড়েচেড়ে খাওয়া-পরা চলে।

কিন্তু এই ভূতটির তো মাথায় ঘিলু বলতে কিচ্ছু নেই।

তাহলে? মা-বাবা বিষম চিন্তায় পড়ে গেল। দুজনে একত্রে বসে প্রায়ই শলাপরামর্শ করে এই ছেলেকে নিয়ে কী করবে। বোকা হলেও ভূত-কায়দা একটা-দুটো সে জানে। জানে, মানে জন্মসূত্রে পেয়েছে। যেমন—যখন ইচ্ছে রূপ বদলে ফেলা, যা ইচ্ছে তাই হওয়া, যেমন রঙ ইচ্ছে ধারণ করা ইত্যাদি। ইচ্ছে করলে এই মূলধনেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে ভূত-জীবনটা সে কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু সে কি তা করবে!

মা-বাবা হয়েও তো ছেলেকে তারা কখনও রূপ বদলাতে দেখে নি। আকৃতি কিংবা রঙ বদলাতে দেখে নি। দেখছে শুধু আঙুল চুষতে।

এই বিষয়েই কি ছেলের সঙ্গে তারা কথা বলবে?

এক ছুটির রাতে ছেলেকে নিয়ে বসল তারা। বাবা জিজ্ঞেস করল জীবন কীভাবে কাঁটাতে চাঁস?

ভূতটা আঙুল চুষতে চুষতে জবাব দিল, আঁঙুল চুঁষে।

মা বলল, আঁঙুল চুঁষে তো পেঁট ভঁরবে না।

সেঁ আঁমি জাঁনি।

তাঁহলে?

তাঁহলে আঁবার কী? যেঁমন খিদে পেঁলে বাঁড়ি এঁসে খাঁই, সঁব সঁময় তাঁই খাঁব।

সঁব সঁময় তোঁ খাঁবার থাকবে নাঁ।

কেঁন।

আঁমরা বুঁড়ো হঁয়ে যাঁচ্ছি। দুঁদিন পর মঁরে যাঁব, তঁখন ঘঁরে তোঁর জঁন্য খাঁবার এঁনে রাঁখবে কেঁ?

মরে যাওয়ার কথা শুনলে এই ভূতটি সবসময়ই রেগে একেবারে কাঁই হয়ে যায়। আজও হল। ছাগলছানার মতো তিড়িং করে একটা লাফ দিল সে। মুখে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা আছেই, চুষতে চুষতে বলল, মঁরে যাঁওয়ার কঁথা বঁললে কেঁন? তোঁমাদের সঙ্গে আঁমি আঁর থাঁকবই নাঁ। এঁই বাঁড়ি থেঁকে বেঁরিয়ে গেঁলাম। আঁর কঁখনও আঁমার মুখ তোঁমরা দেঁখবে না।

এই শুনে মা-ভূতটা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। স্বামীর হাত ধরে বলল, ওঁগো, ছেঁলেটাকে থামাও গোঁ। বোঁকাদের রাঁগ খুঁব খারাপ। এঁকবার রাঁগ কঁরে বাঁড়ি ছেঁড়ে গেঁলে আঁর কঁখনও ফিঁরবে না।

বাপ-ভূতটা বলল, আঁহার নাঁ জুঁটলে ঠিকই ফিঁরে আঁসবে। যাঁবে কোঁথায়?

এই শুনে ভূতটা গেল আরও রেগে। কোনো কথা না বলে হনহন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে। তারপর যেদিকে দুচোখ যায় সারারাত ধরে হাঁটতে লাগল। মুখে বাঁ-হাতের বুড়ো

BanglaBook.org

আঙুলটা আছেই।

ভোরবেলা অচিনপুর গাঁয়ের প্রান্তে এসে দাঁড়াল সে।

গাঁয়ের প্রান্তে ছোটখাটো একটা মাঠ। মাঠের চারদিকে নানাপ্রকারের ঝোপঝাড়। সেই মাঠে সকালবেলা খেলা করতে এসেছে খনকার বাড়ির নয়–দশ বছরের ছেলে কাবলু। হাতে কমলারঙের একটা টেনিস বল ছিল। মাঠের একপাশে ঝোপঝাড়ের সঙ্গে পড়ে ছিল অতিকায় একটি গাছের গুঁড়ি। সেই গাছের গুঁড়িতে বলটা ছুড়ে মারছিল কাবলু, যে–রকমভাবে ছুড়ে মারছিল, গুঁড়িতে লেগে বলটি ঠিক সে–রকমভাবেই ফিরে আসছিল তার কাছে। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাচ ধরছিল কাবলু। আর হি হি করে হাসছিল। ভারি মজার খেলা! তখন হল কি, বলটা একবার গাছের গুঁড়িতে না–লেগে ঝোপঝাড়ের ভেতর ঢুকে গেল। কাবলু হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। কিন্তু বলটা নেই। যেন চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল। কাবলু কাঁদো–কাঁদো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক তখুনি তার সামনে এসে পড়ল সেই ভূতটা। মুখে বাঁ–হাতের বুড়ো আঙুল। কাবলু প্রথমে বুঝতেই পারে নি এটা একটা ভূত। তার মনে হয়েছে এও বুঝি কোনো ঝোপঝাড়। বলটা হয়তো এই ঝোপেই হারিয়েছে। বল খোঁজার জন্য ভূতটার শরীরের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছিল কাবলু। ভূত হা হা করে উঠল। আঁরে কঁর কী কঁর কী।

ঝোপ কথা বলছে শুনে যারপরনাই অবাক হল কাবলু। ফ্যালফ্যাল করে ভূতের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু বুঝতে পারল না যে জিনিসটা একটা ভূত। বলল, তুমি কে?

মুখ থেকে বুড়ো আঙুল বের করে ভূত বলল, আঁমি এঁকটি ভূঁত।

এ্যাঁ।

হ্যাঁ।

কাবলু হেসে ফেলল। যাহ্।

সত্যি।

তুমি যে ভূত বুঝব কী করে?

দেঁখছ নাঁ আঁমি প্রঁতিটি শঁব্দের ওঁপর চঁন্দ্রবিন্দু লাঁগিয়ে কঁথা বঁলছি।

কাবলু বিশ্বাস করল। তাই তো!

সত্যিকার ভূত। দেখতে ঝোপঝাড়ের মতো। খোনা গলায় চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে কথা বলছে। সঙ্গে সঙ্গে বল হারানোর দুঃখটা ভুলে গেল সে। বলের চেয়েও ভূত নিয়ে খেলা করা বেশি মজার। এই ভূতটাকে বাড়ি নিয়ে গেলে হয়। তাদের বাড়ির কেউ কখনও ভূত দেখে নি। একে দেখে নিশ্চয় খুব আমোদ পাবে।

কাবলু বলল, আচ্ছা, ভূতদের কি নাম থাকে?

ভূত বলল, থাঁকবে না কেঁন?

তোমার আছে?

আঁছে।

কী নাম?

হাঁবা গঁঙ্গারাঁম।

বাহ খুব সুন্দর নাম। এই, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

কোঁথায়?

আমাদের বাড়ি! আমাদের বাড়ির কেউ কখনও ভূত দেখে নি। তোমাকে দেখলে সবাই খুব খুশি হবে।

BanglaBook.org

আমার যে খিদে পেয়েছে। তোমাদের বাড়ি গেলে খেতে দেবে?

হ্যাঁ দেব। যা চাও তাই খেতে দেব। গুড় মুড়ি নারকেল নাড়ু।

তাহলে চল।

তখুনি কাবলুর মনে পড়ল, সে শুনেছে ভূতেরা সব পারে। তাহলে এই ভূতটা মানে হাবা গঙ্গারাম তার বলটা খুঁজে দিক।

কথাটা কাবলু বলেই ফেলল। শুনে হাবা গঙ্গারাম বলল, আমি ওসব খোঁজাখোঁজির কাজ পারব না। আমি বেজায় অলস। তারচে নিজেই কমলা রঙের বল হয়ে যাচ্ছি তুমি আমাকে ড্রপ খাওয়াতে খাওয়াতে বাড়ি নিয়ে চল। ড্রপ খাওয়াতে তোমার যদি ভালো না লাগে আমি নিজেই তাহলে ড্রপ খেতে খেতে যাব। আমাকে তোমার ধরতে হবে না।

হাবা গঙ্গারামের কথা শুনে খুশিতে টেনিস বলের মতো একটা লাফ দিল কাবলু। তাহলে তাই কর।

সঙ্গে সঙ্গে ঝোপঝাড়ের মতো বিশালদেহী হাবা গঙ্গারাম কমলা রঙের একটা টেনিস বল হয়ে গেল। অবিকল কাবলুর বলটির মতো। তারপর কাবলুর আগে আগে ড্রপ খেতে খেতে কাবলুদের বাড়ির দিকে চলল। কাবলু হাত দিয়ে ধরছে না অথচ একটি বল ড্রপ খেতে খেতে এগুচ্ছে। দৃশ্যটি কী মজার, ভেবে দেখ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভূতের থাকা না-থাকা

মঈনুল আহসান সাবের

টের পাই কে যেন পা টিপে টিপে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এসব আমার একদম পছন্দ নয়। পেছন থেকে কাউকে চমকে দেয়া কিংবা আড়াল থেকে হঠাৎ সামনে লাফিয়ে পড়া— আমার এসব একদম ছেলেমানুষি মনে হয়। আমি এখন অবশ্য বুঝি কে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি পেছনে না-তাকিয়ে চুপ করে আমার কাজ করে যাই।

আমার পেছনে যে এসে দাঁড়িয়েছে সে হচ্ছে নীলি। নীলিও বোধহয় একটু পরই বুঝতে পারে, ও যে আমার পেছনে সেটা আমি জানি। আমাকে চমকে দিতে না-পেরে ও একটু হতাশই হয়। ওর গলার আওয়াজেই সেটা টের পাওয়া যায়—আমি দেখতে এলাম তোদের কাজের কদ্দূর হল।

আমি পেছনে না-ফিরে বলি—তার চেয়ে ভালো হয় তুই যদি এখন গিয়ে নিজের কাজ করিস।

তাই বলে তোরা এখানে বসে ফাঁকি মারবি আর আমরা সেটা বলতেও পারব না?

এখানে আমরা ফাঁকি মারছি না। বরং তুই-ই ফাঁকি মারার জন্যে তোর কাজ ছেড়ে উঠে এসেছিস।

তাই নাকি! নীলি এবার আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। বেশ, আমি তাহলে আমার কাজেই যাচ্ছি। তার আগে তোকে একটা কথা বলে যাই। আসলে এ-কথাটা বলার জন্যেই আমি এসেছি।

বল্, বলে ফেল্। তারপর চলে যা।

খুব বাঁচা বেঁচে গেলি।

নীলির কথা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাই। দেখি নীলি মিটিমিটি হাসছে। দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। চিবিয়ে চিবিয়ে বলি—এর মধ্যে তুই বেঁচে যাওয়ার কী দেখলি?

নীলিও খুব কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়—বেঁচে গেলি না? আরে বাবা, তুই নিজেই দ্যাখ না। এখন আর ঐ ভূতুড়ে

মঈনুল আহসান সাবের

১৯৫৮—

জন্ম ঢাকায়। পৈত্রিক নিবাস পিরোজপুরে। সরাকারি ল্যাবরেটরি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। পেশায় সাংবাদিক। বর্তমানে সাহিত্যচর্চা নিবিষ্ট। *পরাস্ত সহিস, মৃদু নীল আলো, সীমাবদ্ধ,* উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প ; *পাথর সময়, প্রেম ও প্রতিশোধ, কয়েকজন অপরাধী, দুপুরবেলা, যোগাযোগ* তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। *লালবাড়ির অদ্ভুত ভূত, মৌমাছি ও কাঠুরিয়া, তিন সাংবাদিক ভূত, লিলিপুটেরা বড় হবে* উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য। বেশ কটি জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার পেয়েছেন।

জমিদারবাড়িতে যেতে হচ্ছে না তোদের।

আমরা তো যেতেই চেয়েছিলাম।

নীলি খুব বিজ্ঞের মতো মাথা ঝাঁকায়—সেটা বাইরে-বাইরে। আমি জানি, ভেতরে-ভেতরে তোদের ইচ্ছে ছিল না-যাওয়ার। না-যাওয়ার একটা উপলক্ষ খুঁজছিলি। পেয়ে গেছিস।

আমার ইচ্ছে করে নীলির চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব না। তাই খুব ঠাণ্ডা গলায় বলি—ঠিক আছে, তোরা যদি বলিস, আমরা নাহয় এ অবস্থায়ই যাব।

নীলি ফিচকে হাসি হাসে—থাক থাক, এখন প্রাণ হারিয়ে কাজ নেই। এখন অনেক কাজ। তোরা কটা রুটি বানিয়েছিস?

গুনি নি, আড়াইশ তিনশ হবে।

শুনে নীলি ঠোঁট উল্টোয়—মাত্র! আমাদের পাঁচশ হতে চলল।

ওর বলার ভঙ্গিটাই এমন, শুনলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমি তাই ধমকে উঠি—অ্যাই, তুই ভাগ তো।

হ্যাঁ, এখন ভাগতে তো বলবিই। পাল্লা দিয়ে পারছিস না তো।

তোর মাথায় ছিটেফোঁটাও বুদ্ধি নেই, তাই বুঝতে পারছিস না। তবু একবার বোঝার চেষ্টা করে দ্যাখ না, তোরা নয়জন আমরা পাঁচজন। হিসেবমতো তাহলে কাদের বেশি রুটি বানানোর কথা?

সে যাই হোক। নীলি আমার কথাকে গুরুত্বই দিতে চায় না।—তোরা যতই বানাস, তোদের গুলো তো গোল হবে না, তোরা এবড়োখেবড়ো করে বানাস।

নীলি। আমি এবার খুব গম্ভীর গলায় বলি। রুটি গোল হয়েছে না লম্বা হয়েছে সেটা এ-মুহূর্তে বিচার না করলেও চলবে। রুটি রুটি হয়েছে কি-না, সেটা দেখলেই যথেষ্ট হবে! যারা বন্যার পানিতে আটকা পড়ে না-খেয়ে আছে, তারা গোল, লম্বা কিংবা ব্যাঁকাত্যাড়া যে-কোনো আকারের রুটি হাতে পেলেই প্রাণে বাঁচবে।

তা তো বটেই। নীলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। কতরকম যুক্তি যে তুই দ্যাখাতে পারিস। সে যাক, আমি আসলে বলতে এসেছিলাম—খুব বাঁচা বেঁচে গেলি।

শুনে পিত্তি আমার আবার জ্বলে যায়। কিন্তু এখন থাক, এখন কিছু করা যাবে না। পরে এর শোধ তুলতে হবে।

নীলি যে-বিষয়টা নিয়ে খোঁচাচ্ছে সেটার আরম্ভ এই মাস-দেড়েক দুয়েক আগে। সেই থেকে ও আমার পেছনে লেগেই আছে। অথচ বাবুন আর শামীমকে ও কিছু বলছে না। বাবুনের কথা নাহয় বাদই দিলাম। নীলি ওর আপন ভাইয়ের পেছনে আর কতই বা লাগতে পারে। আর বাবুনের স্বভাব তো ওরও জানা। হয়তো এমন পিট্টি দেবে ধরে। রাগলে আবার বাবুনের মাথা ঠিক থাকে না। সুতরাং বাবুনের কথা বাদ, কিন্তু শামীমের পেছনেও তো লাগতে পারে নীলি। আমি যেমন বাবুনের বন্ধু, শামীমও তাই। তাহলে শামীমের পেছনে না-লেগে শুধু আমার পেছনে কেন লাগা! কেন নীলির এই পার্শিয়ালটি!

আমি, বাবুন, শামীম আর আশফাক পড়ি ক্লাস নাইনে। নীলি আর শামীমের ছোট বোন বীথি পড়ে ক্লাস এইটে। কিন্তু ঐ নামেই ক্লাস এইট। স্কুলের বইয়ের বাইরে কিছু জানে না। আর মাঝে মাঝে এমন বোকার মতো কথা বলে, যেন এখনো ফিডারে দুধ খায়। আমি তাই মাঝে মাঝে নীলিকে 'খুকুমণি' বলে খ্যাপাই। আর 'খুকুমণি' শুনলে ও খেপেও যায় খুব। ওর রাগ দেখে আমিই একদিন বলেছিলাম—আরে বোকা, খুকুমণি বললে তুই এত খেপিস কেন? না খেপলেই তো আমি আর বলি না।

BanglaBook.org

আমার এই ভালো পরামর্শে নীলি যায় আরো রেগে—শোন, আমি খেপি, না-খেপি সেটা তোকে দেখতে হবে না। তুই আমাকে খুকুমণি বলতে পারবি না, ব্যস।

এটা একটা কথা হল ! খুকুমণি বললে তুই যতদিন খেপবি ততদিন আমি বলবই।

বলবিই? বেশ, আমি যদি খুকুমণি হই, তবে তুই কি? খোকা মানিক?

বাহ্! তোর দেখি বেশ বুদ্ধি। কিন্তু খুকুমণি, কেন আমি খোকা মানিক হতে যাব? আমি কি তোর মতো ন্যাকা নাকি?

আমি ন্যাকা? নীলি এবার রাগে লাল টকটকে হয়ে যায়।

সে আর বলতে। তুই হচ্ছিস ন্যাকার ন্যাকা।

ঠিক আছে রনি, আমি তোকে দেখে নেব। তোর নামটা তো মেয়েদের মতো।

আমার নাম তো আমি আর নিজে রাখি নি।

পাল্টে নিস না কেন? নাকি পাল্টে নেয়ার সাহস হয় না তোর?

আমাদের এখন লেগেছে এই 'সাহস' নিয়ে। হয়েছে কি...কয়েক মাস আগে নীলি আর বাবুনের আব্বা, মানে আমাদের চাচা শহর থেকে একটু দূরে এক জায়গায় একসঙ্গে অনেক জমি কিনেছেন। ওখানে তিনি ফুড প্রসেসিং-এর কারখানা দেবেন। কারখানার কাজও আরম্ভ হয়েছে মাস দুয়েক হল। মানে বিল্ডিংটা উঠছে এখন, এরপর যন্ত্রপাতি বসবে। আমরা জমি কেনার পরপরই একবার গিয়েছিলাম। আমি, বাবুন, শামীম, আশফাক, নীলি আর বীথি। তবে সেবার যেন কী এক ঝামেলা হয়েছিল। তাই গিয়ে আমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারি নি। আমরা দ্বিতীয়বার যখন গেলাম তখন বিল্ডিং ওঠানোর কাজ আরম্ভ হয়েছে।

জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর। অনেকটা জায়গা খোলামেলা পড়ে আছে। শহরে এমন খোলামেলা জায়গা আমরা তো দেখতেই পাই না। আমরা এসেছি মাইক্রোবাস করে। আসার পরপরই চাচা চলে গেলেন বিল্ডিং-এর কাজ দেখতে। আমরা আর ওদিকে গেলাম না। বিল্ডিং ওঠানোর কাজ আমরা কী দেখব ! তাছাড়া সঙ্গে করে আমরা প্যাকেট-লাঞ্চ নিয়ে এসেছি। লাঞ্চের সময় তো আমাদের এই বিল্ডিং-এর কাছেই আসতে হবে। তাই মাইক্রোবাস থেকে নেমে আমরা একটুপরই চলে গেলাম অন্য দিকে।

বিল্ডিং-এর কাছে কাজ হচ্ছে বলে বেশ একটু হৈ-চৈ। কিন্তু একটু অন্য দিকে সরে গেলেই আর কোনো হৈ-চৈ নেই। আমরা হাঁটতে হাঁটতে একদম নিরিবিলি জায়গায় চলে যাই। এদিকে গাছপালা অনেক। সে-সব অনেক গাছেরই নাম জানি না। কিন্তু তাতে অসুবিধা নেই কোনো। আমরা গাছপালার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে মন খুলে কথা বলি। এত ভালো লাগে আমাদের ! বারবার মনে হয় এক অদ্ভুত সুন্দর জায়গায় আমরা চলে এসেছি। খুব মজার কথা হয় আমাদের মধ্যে আর শামীমের কথায় আমরা সবাই সবচেয়ে বেশি মজা পাই। ঘুরতে ঘুরতে শামীম খুব হঠাৎ করেই বলে—আমার কী মনে হচ্ছে জানিস? আমার মনে হচ্ছে আমাদের প্রায়ই এ-রকম কোনো জায়গায় বেড়াতে আসা উচিত। নগরজীবনের কোলাহল থেকে দূরে, যন্ত্রের আর্তনাদ থেকে দূরে সবুজের মাঝখানে ...

এই পর্যন্ত বলে ওর খেয়াল হয় সবাই হাসি-হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তাই দেখে থতমত খেয়ে থেমে যায়। তারপর একটু রাগ-রাগ গলায় বলে—তোরা সব আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন?

বাবুন একটু খুকখুক করে হাসে—তুই কি ক্লাসের রচনা লিখছিলি শামীম?

নীলি বলে—তুই যে এতবড় একটা দার্শনিক আর কবি তা তো জানতাম না।

আমি বলি—তোর সবচেয়ে বড় দোষ কি জানিস? তুই সবসময় কথা কঠিন করে বলিস।

আমাদের এতসব মন্তব্য শুনে শামীম গম্ভীর হয়ে যায়—হ্যাঁ, আমি কিছু বললেই তো সেটা তাদের পছন্দ হয় না। আমার কথা শুনে তোদের শুধু হাসিই পায়।

বীথি শামীমকে লুকিয়ে একটু হেসে নেয়—তুই লোক হাসানোর মতো কথা বলতে যাস কেন?

হ্যাঁ, অনেকেরই ভালো কথা লোক হাসানোর মতো কথা মনে হয়।

আমি শামীমকে বোঝানোর চেষ্টা করি—দ্যাখ শামীম, তুই কিন্তু ভুল কিছু বলিস নি, বরং ভালো কথাই বলেছিস। কিন্তু শুধু একটু কঠিন করে বলেছিস, এই যা।

আমি এভাবেই বলি। তোদের ইচ্ছে হলে শুনিস, নাহয় শুনিস না।

বাবুন একটু যেন রেগে যায়—তুই এভাবে পরীক্ষার খাতায় লিখিস, কারো সামনে বলিস না। কারো সামনে বললে তার হাসি পাবেই। তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ না। ভালো কথাই তুই বলেছিস। সত্যিই তো আমাদের এসব জায়গায় মাঝেমাঝেই বেড়াতে আসা উচিত। শহরে সত্যিই খুব হৈ-চৈ, গোলমাল। শহর ছেড়ে এসব জায়গায় এলে সত্যিই মন ভালো হয়ে যায়। তুই তো এসব কথাই বলতে চেয়েছিস। তাই না?

শামীম কতক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলে—হুঁ, চেয়েছি।

আমরা সবাই হাসি লুকোই। আর তখনই ঠিক করে নেই, মাঝেমাঝেই আমরা এখানে বেড়াতে আসব। ইচ্ছে করলেই আসা যাবে। স্কুল তো সবারই শুক্রবার ছুটি। বুধ বা বৃহস্পতিবার চাচাকে বলে রাখলেই হবে। তিনি তো এখন প্রায় রোজই আসেন বিল্ডিং-এর কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কি-না, তা দেখতে।

তবে এর পরের বার যখন যাব-যাব ভাবছি, তার আগে নীলি কোত্থেকে অদ্ভুত এক খবর নিয়ে আসে। এক বিকেলে আমরা যখন শামীমদের ছাদে বসে গল্প করছি, ও আর বীথি আসে ছুটতে ছুটতে। ওদের হাঁপানো দেখে বোঝা যায়, এইমাত্র কোনো খবর পেয়ে দেরি না করে তড়িঘড়ি চলে এসেছে। দুজনেরই মুখ-চোখ গম্ভীর। আমি ওদের হন্তদন্ত ভাব দেখে বলি—কোনো আজব খবর নিশ্চয় দিবি। দিয়ে ফেল্, আমরা শুনছি।

নীলি খুব গম্ভীর গলায় বলে—তোর সবটাতেই ইয়ার্কি রনি, এসব আমার ভালো লাগে না।

ঠিক আছে, আমি এখন সিরিয়াস। তুই বল্।

নীলি আরো গম্ভীর গলায় বলে—ভূত।

এবার শামীম বলে—ভূত মানে?

ভূত মানে ভূত। বীথি গম্ভীর গলায় বলে।

ভূত মানে যে ভূত সে তো আমরা জানিই। এখন আসল ঘটনাটা কী সেটা বল্।

তোরা বুঝতে পারছিস না। নীলি তড়বড় করে বলে। ভূতের খবর পেয়েছি আমরা।

শুধু খবর পেয়েছিস? শামীম জিজ্ঞেস করে। ধরতে পারিস নি?

তোর সবটাতেই ইয়ার্কি। বীথি ভীষণ রেগে যায়। এসব নিয়ে ইয়ার্কি ভালো না।

আমি, বাবুন বা শামীম কিছু বলার আগেই দেখি আশফাক গম্ভীর গলায় বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, বীথি ঠিক বলেছে। এসব ভূত-টুত নিয়ে ইয়ার্কি মারার কোনো মানে হয় না বাপু।

শামীম চোখ কুঁচকে তাকায়—বীথির পক্ষে না দাঁড়ালে তোর বুঝি হচ্ছেই না?

আশফাক এবার আমতা আমতা করে—না, মানে এটা ঠিক পক্ষে বা বিপক্ষে থাকার ব্যাপার নয়। আমি ভাই আসলেই ভূত নিয়ে কোনো ইয়ার্কি মারতে চাই না।

কেন ভূত এসে তোর গলা মটকাবে?

আহা, বলছিই তো ভূত নিয়ে কোনো বাজে কথা আমি বলতেও চাই না, শুনতেও চাই না।

আশফাকের সমর্থন পেয়ে নীলি আর বীথির গলার আওয়াজ বেড়ে যায়। নীলি বেশ ভারিক্কি

চালে বলে—বেশি বেশি ফালতু কথা না বলে আসল ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর।

এতক্ষণে তুই যদি আসল ব্যাপারটা বলে ফেলতি তবে আমরাও বুঝে ফেলতাম।

বলছি, শোন্। জাহানপুর গ্রামে একটা জমিদারবাড়ি আছে।

জাহানপুর গ্রামটা কোথায়, আগে সেটা বল্।

নীলি কতক্ষণ গরম চোখে আমার দিকে তাকায়। তারপর প্রথম থেকে বলতে আরম্ভ করে। চাচা, অর্থাৎ বাবুন আর নীলির আব্বা যেখানে জমি কিনে ফুড প্রসেসিং-এর কারখানা দিচ্ছেন, তার মাইল দুয়েক দূরে একটা গ্রাম আছে। ঐ গ্রামটার নামই জাহানপুর। জাহানপুর গ্রামের এক কোণে একটা জমিদারবাড়ি আছে। অবশ্য বহুদিন আগেই ঐ জমিদারবাড়িতে লোকজন থাকা বন্ধ করে দিয়েছে। ঐ জমিদারবাড়ির লোকজন কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। বাড়িটা এখন প্রায় ভেঙে পড়েছে। দরোজা-জানালা কিছু নেই, দেয়াল ফেটে-ফেটে গেছে, বটগাছের চারা গজিয়েছে দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে। জাহানপুর গ্রামের লোকজন নাকি ভুলেও ঐ জমিদারবাড়িতে দূরের কথা, ঐ বাড়ির আশেপাশেও যায় না। কারণ ঐ জমিদারবাড়িতেই নাকি ভূত আছে। এটা গ্রামের লোকজন টের পেয়েছে অনেক আগে। কিন্তু তাই বলে তারা তো আর গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে পারে না। গ্রামেই তারা আছে, তবে খুব ভয়ে ভয়ে আর সাবধানে। মাঝে মাঝেই নাকি তাদের ভূতের অত্যাচারও সহ্য করতে হয়। তাদের গরু-ছাগল যদি কখনো ঐ জমিদারবাড়ির দিকে চলে যায় তবে নাকি আর ফিরে আসে না। একদম উধাও হয়ে যায়। একবার নাকি গ্রামের লোকজন দেখেছে, ঠিক জমিদারবাড়ির সামনেই তাদের একটা হারিয়ে যাওয়া গরু পড়ে আছে। কিন্তু গরুটার চামড়া ছাড়ানো। তাছাড়া প্রায় রাতেই নাকি জমিদারবাড়ির এ-ঘরে ও-ঘরে নীল রঙের আলো জ্বলতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে করুণ কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায় ঐ জমিদারবাড়ির থেকে। আরো নাকি অনেক আজব আজব ঘটনা ঘটে। এত ঘটনা যে একদিনে বলে শেষ করা যাবে না।

নীলির কথা শেষ হলে আমি ভদ্রছেলের মতো বলি—নীলি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি? তুই কিছু মনে করবি না তো?

না না, মনে করব কেন! তুই জিজ্ঞেস কর না। নীলি খুব উৎসাহ নিয়ে বলে।

তুই এই আজগুবি খবরটা কোত্থেকে পেলি?

নীলি এমন ভীষণ রেগে যায় যে তোতলাতে আরম্ভ করে। বারবার ও বীথির দিকে তাকায়। যেন ও চাচ্ছে এখন বীথিই কিছু বলুক। বীথিই বলে—খবরটা তোদের কাছে আজগুবি মনে হচ্ছে?

আমি, বাবুন আর শামীম একসঙ্গে বলি—জি, আমাদের কাছে খুবই আজগুবি মনে হচ্ছে।

আশফাক শুধু আমতা আমতা করে—না, মানে, এভাবে সোজাসুজি আজগুবি বলা কি উচিত? এসব তো হতেও পারে। ... আমরা কি আর সবকিছু জানি নাকি।

বাবুন গম্ভীর গলায় বলে—সবকিছু না বুঝলেও আমরা কিছু কিছু বুঝি। আশফাক, যা তুই ঐদিকে গিয়ে দাঁড়া।

নীলিও খুব গম্ভীর হয়ে যায়—এভাবে তোর বলা উচিত না। মানুষের বিশ্বাস নিয়ে মানুষকে কথা শোনাতে নেই।

তুই একটু বেশি-বেশি বুঝতে আরম্ভ করেছিস নীলি। আমি ওকে মোটেও কথা শুনাই নি। আমি শুধু ওকে তোদের দিকে ঠেলে দিয়েছি। কারণ এই বোকাটা তোদের মতোই দেখছি ভূতেও বিশ্বাস করে।

আর তোরা চালাকের রাজা একেকজন, ভূত বিশ্বাস করিস না?

না, করি না। এখন যা তুই।

নীলি যেন আমাদের অজ্ঞতায় হাসে—বিশ্বাস যখন করিস না তখন চল্ আব্বার কাছে।

BanglaBook.org

চাচার কাছে গিয়ে কী হবে? আমি জিজ্ঞেস করি। চাচা ওখানে ভূত দেখেছেন নাকি?

জি স্যার, ঘটনাটা অনেকটা সে-রকমই। আব্বা এইমাত্র জাহানপুর গ্রাম থেকে খবর নিয়ে ফিরেছেন।

কী খবর নিয়ে ফিরলেন? একটু খুলেমেলে বল্, শুনি।

নীলি আবার হাসে। যেন আমাদের বেশ জব্দ করতে পেরেছে। বলে—আব্বা আজ কারখানার ওখান থেকে কী এক জরুরি কাজে জাহানপুর গিয়েছিলেন। তখন ওখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা হয়। তারা আব্বাকে জমিদারবাড়িটা দেখিয়েছেও। আর বলেছে, জাহানপুর গ্রামের এত কাছাকাছি কারখানা বানানো নাকি উচিত হচ্ছে না। কারণ জমিদারবাড়ির একেকটা ভূতের নাকি অসীম ক্ষমতা। কোনো কারণে যদি খেপে যায়, তাহলে নাকি কারখানার ওপরও আক্রমণ চালাতে পারে। কারখানা ভেঙে একদম তছনছ করে দেবে। ... আব্বা শুনে খুব ভয় পেয়েছেন।

নীলি। আমি বলি। তুই অনেকক্ষণ কথা বললি তো। এবার একটু দম নিয়ে নে। তারপর তোকে একটা কথা বলব।

আমার দম নিতে হবে না। এখনই বল্।

চাচার কাছে কি তুই গল্প শুনতে চেয়েছিলি? ছোটবেলার মতো?

নীলি প্রথমে বোঝে না। তারপর বুঝে আমার দিকে আগুন-চোখে তাকায়। ওর তাকানো দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই। ওভাবে বেশিক্ষণ তাকালে তো ওর চোখের জ্যোতিই নষ্ট হয়ে যাবে। কিংবা যে-রকম রেগেছে, অজ্ঞান হয়ে দড়াম করে পড়েও যেতে পারে। সে-রকম অবশ্য কিছু ঘটে না। নীলি হঠাৎ করেই খুব স্বাভাবিক গলায় বলে—তুই একটা ব্যাপার জানিস রনি, তোর সঙ্গে কথা বলা আর একটা ব্যাঙের সঙ্গে কথা বলা একই কথা। তোদের দুজনেরই একই রকম বুদ্ধি, আর তোরা দুজনেই শুধু ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করিস।

নীলির কথা শুনে সবাই এমন হাসতে আরম্ভ করে যে আমার ভীষণ লজ্জা করতে আরম্ভ করে। শামীম কোনোমতে হাসি থামিয়ে বলে—নীলি, তোকে জীবনে এই প্রথম আমি দশে দশ দিলাম।

বাবুন বলে—আর আমিও জীবনে এই প্রথম টের পেলাম যে ওরও বুদ্ধি আছে।

বাবুন যে ওকে খোঁচা মারল সেটা নীলি লক্ষ্যই করে না। ও বরং আমাকে একহাত দেখে নেয়ার আনন্দে খুব হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার খুব রাগ হয়। বলি—অমন বাঁদরের মতো তাকিয়ে আছিস কেন?

বাঁদরের মতো তাকিয়ে আছি! আমি বাঁদর?

বাঁদর তো বটেই। শুধু লেজ নেই তোর, এই যা।

নীলি আবার একটু হাসে—তাহলে তোর লেজটা খুলে দে, পুরো বাঁদর হয়ে যাই।

আবার সবার মধ্যে হাসির রোল ওঠে। আশফাক পারে তো হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খায়। আজ একটা একদম নতুন জামা পরেছে বলেই বোধহয় সেটা করে না। তবে ওরা সবাই মিলে যেটুকু করে তাতেই আমার হয়ে যায়। বীথি শেষে আমাকে প্রবোধ দেয়ার মতো করে বলে—রনি, তুই একটা কাজ কর। তুই আর কখনো নীলির সঙ্গে লাগতে আসিস না। কেমন? আমি কিন্তু বন্ধু মনে করে তোকে এই পরামর্শটা দিলাম। এটাকে যেন আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে মনে করিস না।

তার আর বাকি আছে কী। আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বলি।

নীলি খুব ভালো মানুষের মতো বলে—তোর লেজটা দিবি রনি?

আমরা কিন্তু আসল আলোচনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমি চেঁচিয়ে উঠে বলি।

সবাই মুখ টিপে হেসে সবার মুখের দিকে তাকায়। তারপর যেন হাসি লুকানোর চেষ্টা করে।

আমরা যেন কী আলোচনা করছিলাম? শামীম হাসি চেপে জানতে চায়।

BanglaBook.org

নীলি আর বিথীর মাথায় ভূত চেপেছে। আমি বলি। ওদের মাথা থেকে ভূত নামানো দরকার।

বীথি হাসে—সমস্যা কি জানিস রনি? তোর মাথায় আছে অবিশ্বাসের ভূত। ওটা নামিয়ে দিলে বুঝতে পারবি।

নীলি মাথা নাড়ে—না, তাতেও হবে না। ও খুব কম বোঝে। ... রনি, তুই বরং আমার সঙ্গে আব্বার কাছে চল্। আব্বার মুখ থেকে ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবি।

আমি হাসতে আরম্ভ করি।

অমন পাগলার মতো হাসছিস কেন? তুই কি ভেবেছিস, আমি মিথ্যা বলছি?

না, খামোকা তুই কেন মিথ্যা বলতে যাবি! তবে অমন একটা গাঁজাখুরি গল্প তুই বিশ্বাস করেছিস, তাই দেখে আমার হাসি পাচ্ছে।

মানে তুই বলতে চাচ্ছিস আমার আব্বা একটা গাঁজাখুরি গল্প করেছে? আমার আব্বা গাঁজা খায়?

ঐ কথা আমি কখন বললাম! আমি অবাক হয়ে যাই। চাচার কথা আমি আবার কখন কী বললাম!

তুই বলিস নি মানে? গল্পটা আমি আব্বার মুখ থেকে শুনেছি। আর তুই সেটাকে বলছিস গাঁজাখুরি গল্প। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি—চল্, চাচার মুখ থেকেই শুনে আসি ওটা আসলে কতটা গাঁজাখুরি।

আমরা সবাই দল বেঁধে ছাদ থেকে নামি। চাচা তখন বারান্দায় বসে চা-নাস্তা খাচ্ছেন। নীলিটা এমন হারামি, সোজা চাচাকে গিয়ে বলে—আব্বা, তুমি কি জান এই রনি কী বলেছে? বলেছে ওটা নাকি একটা গাঁজাখুরি গল্প।

চাচা একটু অবাক হয়ে যান—কোন্ গল্পরে মা?

ঐ যে, জাহানপুর গ্রামের জমিদারবাড়ির গল্প।

ওটা গাঁজাখুরি কেন হবে! চাচা আরো অবাক হয়ে যান। জাহানপুর গ্রামে একটা জমিদারবাড়ি তো আছেই।

না না, বাবা। নীলি তখনই বলে। জমিদারবাড়িতে ভূত আছে না, ওটা নাকি গাঁজাখুরি।

চাচা এবার একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন। বলেন—একদম গাঁজাখুরি বলে কি এসব উড়িয়ে দেয়া যায়! গ্রামের লোকজন যেভাবে বলল, আমার তো মনে হচ্ছে ওখানে কিছু-একটা ব্যাপার আছেই।

নীলি হাসিমুখে বলে—সে-কথাই তো আমি বলছি।

তাছাড়া। চাচা বলেন। এসব পুরনো জমিদার বাড়িগুলো অনেক সময় অভিশপ্ত হয়। নানারকম ইতিহাস থাকে এসব বাড়ির। অভিশপ্ত আত্মারা নাকি ঘুরে বেড়ায় ....।

আমি মৃদু গলায় বলি—তাই বলে চাচা, আপনি ওসব বিশ্বাস করেন?

আমি ঠিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা বলছি না রনি। আমি বলছি এসব ঘটনা অনেক সময় ঘটে। পুরনো, পরিত্যক্ত বাড়িতে এমন কিছু কিছু ব্যাপার থাকে, যা আমাদের রহস্যময় মনে হয়। আমরা ওসব ব্যাখ্যা করতে পারি না।

তাই শুনে নীলি আর বীথির খুশি দ্যাখে কে! কিন্তু আমি খুব নিরাশ হয়ে যাই। আমার সঙ্গে সঙ্গে শামীম আর বাবুনও নিরাশ হয়। আমরা একে অন্যের মুখের দিকে বোকার মতো তাকাই। বাবুন বলে—আচ্ছা আব্বা, তুমি বল তো, কী করে তুমি বুঝলে ঐ জমিদারবাড়িতে ভূত আছে? কোনো প্রমাণ পেয়েছ তুমি?

আমি তো প্রমাণ পাওয়ার কথা বলি নি। চাচা মাথা নাড়েন। গ্রামের লোক যেটুকু বলেছে আমি

BanglaBook.org

সেটুকুই বলেছি।

গ্রামের লোক কী করে জানে ও বাড়িতে ভূত আছে? শামীম জিজ্ঞেস করে।

চাচা এবার হেসে ফেলেন—জমিদারবাড়িটা ও গ্রামেই। সুতরাং জানলে তো ও-গ্রামের লোকজনই জানবে।

চাচার সঙ্গে সঙ্গে নীলি আর বীথিও খুব হাসে। যেন কী মজার কথাই না শামীম বলেছে।

আমার ওদের হাসি দেখে মেজাজ গরম হয়ে যায়। কিন্তু চাচার সঙ্গে তো আর বেয়াদবি করা যায় না। আমি তাই ভদ্রছেলের মতো জিজ্ঞেস করি—চাচা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

চাচা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। একটু একটু করে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলেন—ভূত বিশ্বাস করি কি করি না, এটা বলা খুব মুশকিল। কেউ হয়তো বলবে—আমি ভূত বিশ্বাস করি। কিন্তু তার কী প্রমাণ? আবার কেউ হয়তো বলবে—আমি কখনো ভূত বিশ্বাস করি না। কিন্তু তারই বা কি প্রমাণ?

চাচা যে আমার প্রশ্নটা আসলে এড়িয়ে গেলেন সেটা আমি বুঝতে পারি। আমি বলি—তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে, চাচা? প্রমাণ ছাড়া বোঝা সম্ভব না ভূত আছে না নেই, এই তো?

চাচা মুচকি হাসেন—অনেকটা সে-রকমই দাঁড়াচ্ছে বটে।

তাহলে প্রমাণের ওপর নির্ভর করছে ভূতের থাকা না-থাকা?

অনেকটাই। কেউ যদি এখন প্রমাণ করে দিতে পারে ভূত আছে, তবে তার কথাই আমরা বিশ্বাস করব। আবার কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে ভূত নেই, তার কথাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।

নীলি আর বীথি হৈ হৈ করে ওঠে—তা হলে বোঝাই যাচ্ছে ভূত আছে।

কী করে? আমি, বাবুন আর শামীম একসঙ্গে জিজ্ঞেস করি।

কারণ কেউ প্রমাণ করতে পারে নি যে ভূত নেই।

আর ভূত যে আছে, সেটাই বা কে প্রমাণ করেছে?

নীলি আর বীথি খুব সবজান্তার মতো বলে—প্রমাণের জন্যে তো জাহানপুর গ্রামের লোকজন আছেই। তাছাড়াও আরো কত প্রমাণ আছে ভূত থাকার।

চাচা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান—আমি এখন একটু বাইরে যাব।

নীলি বলে—তার আগে আব্বা, তুমি এই গাধাগুলোকে ঠিক ঠিক করে বলে যাও তো—ভূত আছে।

বাবুন বলে—আব্বা, বাইরে যাওয়ার আগে তুমি এই দুই খুকুমণিকে বুঝিয়ে দিয়ে যাও—ওসব ভূত-ফূত কিছু নেই।

চাচা সামান্য হেসে মাথা নাড়েন—উহু, সেটি হচ্ছে না। আমি বলার কে! সেটা তোমাদের নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হবে।

চাচা বারান্দা থেকে চলে যেতেই নীলি আর বীথির হাসি দ্যাখে কে! যেন এইমাত্র দিগ্বিজয় করে ফিরেছে। ওদের হাসি দেখে মনে হয়, এমন একটা থাপ্পড় যদি মারা যেত যে থাপ্পড়ে ওদের সবগুলো দাঁত পড়ে যাবে। কিন্তু সেটা সম্ভব না, তাই ধমকে উঠি—অমন দাঁত কেলিয়ে হাসছিস কেন।

আর তুই এমন ডাস্টবিনের কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করছিস কেন?

তোদের রকম-সকম দেখে। এত দাঁত কেলানোর কী হয়েছে?

কেলাব না? হেরে তো গেলি।

হেরে গেলাম মানে? তোরা আবার কিসে জিতে গেলি!

খুব তো হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছিলি সবকিছু। সব নাকি গাঁজাখুরি। এখন?

BanglaBook.org

এখন কী? বাবুন ইচ্ছে করেই খুব সরল গলায় জানতে চায়।

এখন তোর মাথা। বাবা কী বললেন, শুনিসনি?

শুনেছি। কিন্তু বাবা এমন কিছু বলেননি যাতে প্রমাণ হয় ভূত আছে।

তোরাও এমন কিছু করতে বা বলতে পারিসনি যাতে প্রমাণ হয় ভূত আছে।

কিন্তু। বীথি বলে। চাচা তো বলেছেনই পুরনো জমিদারবাড়িতে ভূত থাকতেই পারে।

নীলি তখনই মাথা ঝাঁকায়—হ্যাঁ, আর বাবা নিজের মুখেই জাহানপুর গ্রামের লোকজনের মুখ থেকে ভূতের কথা শুনে এসেছেন।

তা শুনে আসতে পারেন। আমি গম্ভীর গলায় বলি। কিন্তু আমি ওসব বিশ্বাস করি না।

তুই আব্বার কথা অবিশ্বাস করছিস?

না, চাচার কথা কেন অবিশ্বাস করব! বললাম না, চাচা তো শুনে আসতেই পারেন। কিন্তু গ্রামের লোকজন বলে, তাই আমাকেও ভূত বিশ্বাস করতে হবে, এমন বোকা আমি নই।

ও, তুই তো আবার খুব চালাক! তাহলে এখন কী করতে হবে আমাদের?

কিছু করার নেই। তুই চুপ করে থাক, তাহলেই হবে। ভূত বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না—বুদ্ধি খাটিয়ে এটুকু একটু বোঝার চেষ্টা কর, এটুকুই।

নীলি বলে—তোর মতো অত মোটা বুদ্ধি তো আমার নেই, তাই খাটাতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি ভূত আছে।

শেষে দ্যাখা গেল আমি, বাবুন আর শামীম একদিকে। অন্য দিকে নীলি আর বীথি। ভেবেছিলাম আশফাক হয়তো আমাদের দিকেই থাকবে। কিন্তু আশফাক 'তা, ভূত থাকতেও পারে, ঠিক ঠিক তো জানি না' বলে আমতা আমতা করে নীলি আর বীথির দলে গিয়ে যোগ দেয়। আমরা বুঝি, আসলে ভূত বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করে, এ কারণে আশফাক ঐ দলে যায় নি। ও গেছে, কারণ বীথি আছে ওদিকে। আমরা আগেও দেখেছি বীথি যেদিকে থাকবে আশফাকও সেদিকে থাকবে। যদি এমন হয়, বীথি থাকত ভূতে অবিশ্বাসীদের দলে, তবে আশফাকও নিশ্চয় এদিকেই থাকত। তা, কী করা যাবে, এখন হল এ-দলে তিনজন ও-দলে তিনজন।

সে কথাই বীথি বলে—আমরা তাহলে তিনজন বনাম তিনজন হলাম।

বাবুন একটু হাসে—না, হিসেবটা ঠিক হল না। বল, তিনজন ভার্সেস আড়াইজন।

তোদের মধ্যে হাফ কে? নীলি গম্ভীর মুখে জানতে চায়।

আমাদের মধ্যে কেউ নেই। বাবুন তখনই বলে। হাফ হচ্ছে তোদের এই আশফাক।

কেন, ও হাফ হতে যাবে কেন?

কারণ ও ভূত অবিশ্বাস করে বলে তোদের দলে যায় নি। ও তোদের দলে গেছে কারণ বীথি আছে ওখানে। সুতরাং ও হাফ।

প্রতিবাদ না করে নীলি আর বীথি একটু ঠোঁট টিপে হাসে। তবে আশফাক একটু রেগে যাওয়ার ভান করে—এসব আজেবাজে কথা বলার কোনো মানে হয়! আমি সত্যি সত্যিই ভূত বিশ্বাস করি।

নীলি খুব বুঝদারের মতো হাসে—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, তোরা তিনজন ভূত বিশ্বাস করিস না, আমরা আড়াইজন, থুক্কু, তিনজন ভূত বিশ্বাস করি। ঠিক আছে?

ঠিক আছে। আমি, বাবুন আর শামীম একসঙ্গে বলি। বেশ, দেখা যাবে, কাদের কথা ঠিক হয়।

দুই

পরের দিন ছিল স্কুলের সাপ্তাহিক ছুটি। এই ছুটির দিনগুলো মাঝে মাঝে আমার কাছে খুব

BanglaBook.org

বিরক্তিকর মনে হয়। হয়তো সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর দেখি কিছুই করার নেই। অন্যান্য দিন স্কুলে যাওয়ার তাড়া থাকে। কিন্তু ছুটির দিন কোনো তাড়া নেই বলে সময় যেন আর কাটতেই চায় না। কোনো কোনো ছুটির দিন আমি বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে যাই, কিংবা বন্ধুরা আসে। বিকেলের দিকে অবশ্য সময় কেটেই যায়। আমাদের বাড়ির কাছেই খুব বড় একটা মাঠ আছে। কোনো কোনো বিকেলে আমরা বন্ধুরা ছাদে বসে গল্প করি। আবার কোনো কোনো বিকেলে আমরা ঐ মাঠে ক্রিকেট, ফুটবল কিংবা ব্যাডমিন্টন খেলি।

সবচেয়ে অসুবিধা হয় ছুটির দিন দুপুরে। ঐ সময় কারো বাসায় যাওয়াও যায় না, কেউ আসেও না। দুপুরবেলা আমি তাই গল্পের বা অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ে পার করে দেই। গল্পের বই এমনিতেও আমার খুব প্রিয়। বই পড়ার অভ্যেসটা আমার হয়েছে ভাইয়ার জন্যে। ভাইয়া মাত্র ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। কিন্তু কত বই যে এরমধ্যেই ও পড়ে ফেলেছে। ভাবলে আমার অবাকই লাগে। ক্লাসের পড়া ফেলে ওকে তো সবসময়ই বাইরের বই-ই পড়তে দেখি। তারপরও ওর রেজাল্ট সবসময়ই ভালো। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বাইরের বই কিছু কমিয়ে ও যদি ক্লাসের পড়া পড়ত তাহলে ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড হতই। সে-কথা আমি একদিন ভাইয়াকে বলেওছিলাম।

শুনে ভাইয়া কতক্ষণ কটমট করে আমার দিকে তাকিয়েছিল—আমি ফার্স্ট বা সেকেন্ড হলে তোর কী লাভ?

আমি থতমত খেয়ে বলেছিলাম—আমার আর কী লাভ! লাভ তো তোমারই।

আমার কী লাভ! বল্ তো, শুনি।

আমি এমনভাবে বলতে নেই যেন অনেক কিছু বলব, কিন্তু আসলে কিছুই বলতে পারি না। একটু বোকার মতো হেসে বলি—না, মানে, তাতে তো তোমার ভালোই হত।

আমি যে বাইরের বই পড়ছি, তাতে আমার কী কী ক্ষতি হচ্ছে?

না, না, ক্ষতি হবে কেন! আমি বলছিলাম—ফার্স্ট, সেকেন্ড হলে তো জীবনে অনেক উন্নতি করা যায়।

না। ভাইয়া খুব গম্ভীর গলায় বলেছিল। ফার্স্ট, সেকেন্ড হলেই জীবনে উন্নতি করা যাবে, এমন কোনো কথা নেই। আবার ঘুরিয়ে বললে বলা যায়—জীবনে উন্নতি করার জন্যে ফার্স্ট, সেকেন্ড হওয়াটা জরুরি নয়। তাছাড়া জীবনে যত বেশি আমি উন্নতি করতে চাই তার চেয়ে বেশি চাই জীবনকে সুন্দর করতে।

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি।

ভাইয়া একটু হেসে বলে—তুই যদি বাইরের বই পড়তে আরম্ভ করিস, ক্লাসের পড়া ফাঁকি না দিয়ে তবে নিজেই টের পাবি জীবন আসলে কত বিশাল, কত সুন্দর। আমার কাছে এই জীবনের দামই বেশি।

এখন আমারও তাই মত। এমন নয় যে আগে আমার বাইরের বই পড়ার অভ্যেস ছিল না। কিন্তু ভাইয়ার কথা শুনে আমার অবসরে সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়াল বই পড়া। অবসরে বলছি এ কারণে যে বই তো আসলে সবসময়ই পড়া যায়। কিন্তু সেটাও উচিত না। আমি যদি ক্লাসের পড়া বাদ রেখে বাইরের বই পড়ি, তবে সেটা কি ভালো কাজ হবে? উহু, আগে উচিত ক্লাসের পড়া শেষ করা। সেটা তো বেশি সময়ের ব্যাপার নয়। তাছাড়া সবসময়ই ক্লাসের বইয়ের মধ্যে নাক গুঁজে থাকতে আমার এতটুকু ভালো লাগে না। এটা মানায় ইন্তেজার, মাহমুদ এদের। ওরা আমাদের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। কিন্তু টিফিন টাইমেও ওরা খেলতে বা ঘুরতে বের হয় না। দুজন পাল্লা দিয়ে অঙ্ক বা ট্রানস্লেশন করে। আর ফাইনাল পরীক্ষায় ফার্স্ট, সেকেন্ড হয়।

BanglaBook.org

হোক, তা নিয়ে আমাদের কোনো মনঃকষ্ট নেই, কোনো মাথাব্যথাও নেই। ওরা ফার্স্ট, সেকেন্ড হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আমরা তো আর লাড্ডু মারছি না। আমরাও পরীক্ষায় ভালো করছি আবার বাইরের জীবনও উপভোগ করছি। আমি তো বাজি ধরে বলতে পারি, আমি তো বটেই, শামীম আর বাবুনও ইন্তেজার ও মাহমুদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি জানে। কারণ শুধু পাঠ্য বইয়ে জীবনের সব কথা থাকে না।

থাক এসব কথা। দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে উঠে আমি একটা গল্পের বই নিয়ে চলে যাই চিলেকোঠায়। এটা অবশ্য ঠিক গল্পের বই নয়, কিশোর উপন্যাস। রবার্ট লুই স্টিভেনসনের কিডন্যাপড্। এ বইটা আমার আগে পড়া। কিন্তু কী করব ! নতুন কোনো বই নেই শেলফে। অনেক খুঁজলাম। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শরদিন্দু, চার্লস ডিকেন্স, রবার্ট লুই স্টিভেনসন; স্যার ওয়াল্টার স্কট, জ্যাক লন্ডন, জুলে ভার্ন, আইজাক অ্যাসিমভ এবং অন্যান্য আরো অনেক লেখকের যতগুলো বই আছে তার সবগুলোই পড়া। তার মধ্যে কিডন্যাপড্ বইটা বেশি আগে পড়া, তাই ওটা নিয়েই চলে যাই চিলেকোঠায়।

চিলেকোঠায় আমার একটা ঘরের মতো আছে। রাজ্যের পুরনো জিনিসপত্র ওখানে। তবে সব সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা, একটুও ময়লা নেই কোথাও। তাই ও-ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিতে আমার এতটুকু অসুবিধা হয় না। আমি দুটো বালিশের ওপর মাথা রেখে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে বইটা পড়তে আরম্ভ করি। পুরনো দিনের বই পড়তে নিলে আমার মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায়। যেমন ট্রেজার আইল্যান্ড আমি খুব কম করে হলেও সাত-আটবার পড়েছি। যতবার পড়েছি ততবার আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। বারবার মনে হয়েছে, আমি যদি ঐ অভিযানের একজন হতে পারতাম। আবার কিং সলোমনস মাইন বা অ্যালান কোয়াটারমাইন নিয়েও একই কথা। আসলে কাহিনীর পটভূমি অনেক আগের হলেই আমার মন যেন কেমন-কেমন করে। কিডন্যাপড্ পড়তে পড়তেও আমি যেন সেই সময়ে চলে যাই।

হঠাৎ করে কানের পাশে হো হো হাসির শব্দে চমকে উঠি। পাশে তাকিয়ে দেখি নীলি আর বীথি। আমি কটমট করে ওদের দিকে তাকাতেই নীলি জিজ্ঞেস করে—তোর ওপর কি ভূতের আছর হয়েছিল?

ভূতের আছর হলে তোদের ওপর হবে। কারণ তোরা ভূত বিশ্বাস করিস। আমি বিশ্বাস করি না। ওসব আছর-ফাছরও আমার ওপর হবে না।

তাহলে মিনিট পনের হল আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তুই টের পাচ্ছিলি না কেন?

পাশে নিরেট বস্তু থাকলে টের পেতে দেরি হয়।

আমরা নিরেট বস্তু? বীথি রেগে যায়।

আরে বাদ দে। নীলি ওকে থামায়। বলুক না যা ইচ্ছে। কিন্তু রনি, তুই অমন বিড়বিড় করছিলি কেন? কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

সেটা তোদের না জানলেও চলবে।

তোর কি পোষা ভূত আছে নাকি? ঐ ভূতের সঙ্গে কথা বলছিলি?

নীলির দিকে খুব রাগ-রাগ চোখে তাকাই। কিন্তু ওকে কিছু বলতে পারি না। কারণ ওর অভিযোগ হয়তো সত্য। আমি নিজেও জানি মাঝে মাঝে আমার এ-রকম হয়। কখনো গল্প বা উপন্যাস পড়তে পড়তে আমি কোনো চরিত্রের সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করে দেই। কিংবা নিজেই হয়তো হয়ে যাই ঐ গল্প বা উপন্যাসের কোনো চরিত্র। তখন মাঝে মাঝে আমি একা একাই কথা বলি বটে। নীলি আর বীথি বোধহয় সে-রকমই কিছু দেখে ফেলেছে। কিন্তু সেটা তো স্বীকার করা যায় না। তাই একটু মেজাজ দেখিয়ে বলি—এই অসময়ে কেন আমাকে ডিস্টার্ব করতে এসেছিস !

BanglaBook.org

তোকে দেখতে আসি নি। বীথি গম্ভীর গলায় বলে। একটা জরুরি কাজে এসেছি।

তাহলে সেটা বলে জলদি জলদি বিদায় হ।

তাই হব। ভাবিস না। যে নোংরা বিছানা তোর। কে এখানে বেশিক্ষণ থাকবে। শোন্, এই যে এই বইগুলো দ্যাখ। তারপর একটা কথার উত্তর দিবি।

নীলি পাশের টেবিল থেকে তুলে কতগুলো বই আমার সামনে রাখে। আমি বইগুলোর শুধু কভার দেখি। কী যে সব বই একেকটা—ভূতের রাজ্যে ছত্রিশ ঘণ্টা, প্রেত-সাধনা, দি স্পাইন চিলিং বুক অব মোনস্টারস্, ড্রাকুলা, ট্রু ঘোস্ট স্টোরিজ—এসব।

আমার বইগুলো খুলে দেখতেও ইচ্ছে করে না। বলি—হ্যাঁ, দেখলাম। এখন কী করতে হবে?

বীথি বলে—এসব অনেক বই-ই বিদেশ থেকে বেরিয়েছে, জানিস?

সে তো দ্যাখাই যাচ্ছে। বিদেশি লেখক, বিদেশে ছাপা।

তাহলে বল্, আমেরিকা, ইংল্যান্ড এসব দেশ থেকে মিথ্যা মিথ্যা বই বের হয় নাকি।

ওদের কথায় আমি হাসব না কাঁদব, বুঝতে পারি না। বলি—হবে না কেন হতেও পারে। এই তো, এসব বই দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

ইশ, তুই কি ওদের চেয়েও বেশি জানিস?

এসব কম-জানা বেশি-জানার ব্যাপার নয়। আমি ওদের বোঝানোর চেষ্টা করি। তোদের মতো অশিক্ষিত লোক সব দেশেই আছে। তারাই এসব বই লেখে, তাদের মতো লোকরাই পড়ে।

তাই নাকি, এত জানিস তুই!

জানি। আমি গম্ভীর গলায় বলি। কেউ কেউ আবার ভূত বিশ্বাস না করেও ভূতের গল্প লেখে। কারণ এসব বই বেশি বিক্রি হয়। অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা সবসময়ই বেশি। কেউ কেউ অবশ্য মজা পাওয়ার জন্যেও ওসব বই পড়ে।

আচ্ছা! তাহলে এই এগুলো কী, ড্রাকুলা।

এগুলো সবই বানানো গল্প নীলি।

নীলি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—নাহ্, ভেবেছিলাম সহজেই তোকে বোঝাতে পারব। কিন্তু এখন দেখছি তোর মতো গোঁয়ার-গোবিন্দকে বোঝানো আমার কাজ নয়। শোন্, তুই ভূত বিশ্বাস করিস না, তাই না?

গাঁজাখুরি, আজগুবি, অলৌকিক কিছুই আমি বিশ্বাস করি না।

আহা, আপাতত শুধু বল্ ভূত বিশ্বাস করিস কি করিস না।

কতবার বলব যে আমি ভূত বিশ্বাস করি না।

এবার নীলি আর বীথি হাসে—কিন্তু শুধু মুখে বললে তো হবে না রনি বাবু।

মুখে বললে হবে না মানে? কী করতে হবে?

কিছু তো একটা করতেই হবে। এতই যখন জোর গলায় আপনি ফটফট করে বলছেন—ভূত নেই ভূত নেই—তখন প্রমাণ করে দিন না স্যার, যে ভূত সত্যিই নেই।

সেটা কীভাবে করব! আমি একটু বোকা বনে যাই। ভূত তো সত্যিই নেই। যেটা নেই সেটা তো নেই। যা নেই তা তো আর প্রমাণ করে দ্যাখানো যায় না যে সত্যি নেই। থাকলে নাহয় প্রমাণ করে দ্যাখানো যেত।

নীলি আর বীথি মিটমিট করে হাসে—এ-কথা বললে তো হবে না। তুই বলেছিস নেই, নেই যে প্রমাণ করে দ্যাখা।

আহা, তোরা একটু বোঝার চেষ্টা কর। যেটা নেই সেটা কী করে প্রমাণ করে দ্যাখাব?

তাহলে স্বীকার কর যে ভূত আছে। তাহলে তোর আর প্রমাণ করতে হবে না।

BanglaBook.org

আশ্চর্য! তোরা এমন বোকার মতো কথা বলছিস কেন?

নিজে যখন পারছিস না তখন আমাদের কথা তো বোকার মতো মনে হবেই।

আবার একটা ছোটখাটো ঝগড়াই বেধে যায় ওদের সঙ্গে। ওরা কোনো যুক্তির কথাই শুনতে রাজি নয়। ওদের এক কথা—আমি যখন বলেছি ভূত নেই, তখন সেটা আমাকে প্রমাণ করে দিতে হবে।

আমাদের এই ঝগড়ার মতো ব্যাপারটা প্রায় সন্ধে পর্যন্ত থাকে। বিকেলে দেখি ওদের আরো দুই বান্ধবী হাজির। লাবণি আর নীতু। এ দু জন নীলি আর বীথিকেও হার মানায়। ভূত যে আছে তার পেছনে ওদের একেকজনের কী সব যুক্তি, শুনে বোকার মতো তাকিয়ে থাকতে হয়। ওরা আমাদের ভূতের নানারকম গল্পও শোনায়। আমাদের আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কাকে কাকে ভূত ধরেছিল বা তাড়া করেছিল, তাও দেখি ওদের মুখস্থ। আর সে-সব ঘটনার কী বর্ণনা। নির্ঘাৎ যে-কোনো বিখ্যাত লেখক ফেল মেরে যাবে। আমি শেষে থাকতে না পেরে বলি—নীলি, তোরা একটা কাজ করতে পারবি?

বল্, শুনে দেখি করার মতো কি-না।

তোরা চারজন—মানে তুই, বীথি, নীতু আর লাবণি একসঙ্গে একটা বই লিখে ফেল্। বইটা অবশ্যই ভূত-বিষয়ক হতে হবে। আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে বইটা বের করব। তোদের খুব নাম হবে।

এ বুদ্ধি তোর কাছ থেকে আমাদের নিতে হবে না।

হ্যাঁ, নিতে হবে কেন! বুদ্ধিটা তো পেয়েই গেছিস।

কথা ঘুরাস না রনি। নীলি বিরক্ত গলায় বলে। তুই বড় বেশি আজেবাজে কথা বলিস। আর আমাদেরও তোর সঙ্গে এত বকবক করার ইচ্ছে নেই। তোরা স্বীকার করে নে—ভূত আছে। আমরাও চলে যাচ্ছি।

তোরা যদি এখানে সারাজীবন দাঁড়িয়ে থাকিস, তাহলেও ভূত নেই। আবার তোরা যদি এই এখনই এখান থেকে চলে যাস, তাহলেও ভূত নেই।

ঠিক আছে। শুধু একটা প্রমাণ চাচ্ছি আমরা।

এই নিয়ে আরো কতক্ষণ কথা কাটাকাটি হয় আমাদের। নীলিরা একসময় চলে যায়। যাওয়ার আগে অবশ্য বলে যায়, যতদিন ভূতের না-থাকার কোনো প্রমাণ দিতে পারব, ততদিন নাকি ওদের কথা শুনেই যেতে হবে আমাদের। এটা অবশ্য বলার প্রয়োজন ছিল না। কারণ ওদের স্বভাব তো আমাদের হাড়ে হাড়ে জানা আছে। ওরা লেগেই থাকবে আমাদের পেছনে। সুতরাং কিছু-একটা করা দরকার আমাদের। আশফাককে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমার, শামীম আর বাবুনের ছোটখাটো এক বৈঠকই হয়ে যায়। নানারকম বুদ্ধি খেলে যায় আমাদের মাথায়। কিন্তু আসল বুদ্ধিটাই খেলে না। আমরা বুঝতে পারি না, কী করে ভূত না-থাকার প্রমাণ দেব।

এভাবে দুটো দিন পার হয়ে যায়। এ দু-দিনে নীলি আর বীথি আমাদের কান ঝালাপালা করে ফেলে। সে কত রকম খ্যাপানো ওদের। মাঝে মাঝে শরীর একদম জ্বলে যায়। কিন্তু কিছু করার নেই। একটা বুদ্ধি বের না হওয়া পর্যন্ত এসব সহ্য করেই যেতে হবে। বুদ্ধি অবশ্য শেষ পর্যন্ত একটা বেরিয়েই যায়। এতে কাজ হবে বলেও আমাদের মনে হয়। পরদিন বিকেলে নীলিকে বলি—মাঝখানে বাগড়া না দিয়ে একটা কথা মন দিয়ে শোন্। ভাইয়াকে কি তোদের যথেষ্ট বুদ্ধিমান মনে হয়?

নীলি আর বীথি একটু যেন ভাবে। এখন যদি ওরা বলে ভাইয়াকে ওদের যথেষ্ট বুদ্ধিমান মনে হয় না, তবে সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, এটা ওরা নিজেরাও বুঝতে পারে। কারণ ওদেরও ঠিক

BanglaBook.org

ঠিক জানা আছে ভাইয়ার বুদ্ধি কতটা। শেষে তাই নীলি বলে—ভাইয়া যে তোদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

তাহলে চল্ ভাইয়ার কাছে যাই। ভাইয়া যেটা বলবে সেটাই আমরা মেনে নেব।

মানে? নীলি আর বীথির ভ্রূ কুঁচকে যায়। ভাইয়া যদি বলে ভূত নেই, তবে কি সেটাও আমাদের মেনে নিতে হবে?

ভাইয়াকে যদি সত্যিই বুদ্ধিমান মনে করিস, তবে তো মেনে নেয়াই উচিত।

নীলি আর বীথি একসঙ্গে মাথা নাড়ে—না বাপু, ভাইয়া বুদ্ধিমান হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান হলেই যে সব জানবে এমন কোনো কথা নেই। তবে ভাইয়া যদি প্রমাণ করে দিতে পারে যে ভূত নেই, তবে সেটা আমরা অবশ্যই মেনে নেব।

আমরা একটু ভেবে নেই। তারপর বলি—ঠিক আছে, তাহলে তাই চল্। ভাইয়া একটা-না-একটা বুদ্ধি ঠিক বাতলে দেবে।

আমরা তখনই দল বেঁধে যাই ভাইয়ার ঘরে। ভাইয়া বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইংরেজি এক মোটা বই পড়ছিল আর পা নাচাচ্ছিল। এই ওর এক বাজে স্বভাব। বিছানায় শুয়ে বই পড়তে নিলেই পা নাচাবে। যাকগে, পা নাচাক, আর নাই নাচাক, আমার কী। ভাইয়া আমাদের অমন দল বেঁধে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়। বলে—কিরে, তোরা কি কোনো অভিযানে বের হচ্ছিস? তার আগে আমার সঙ্গে দ্যাখা করতে এসেছিস?

নীলি খুব গম্ভীর গলায় বলে—ব্যাপারটা সে-রকমই সিরিয়াস। আমরা তোমার কাছে এসেছি। আশা করছি তুমি আমাদের নিরাশ করবে না।

বাপরে, আমাকে ভড়কে দিলি। বল্ দেখি কী ব্যাপার।

তুমি খুব মন দিয়ে শুনবে, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দেবে। ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দেয়ার কথা এজন্যে বলছি যে, এমনও হতে পারে তোমাকে তোমার বক্তব্য প্রমাণ করতে হবে।

ভাইয়া তখনই মাথা নাড়ে—না না, তাহলে শুনছি না। আমার এখনই বেরোতে হবে।

অত সময় লাগবে না। নীলি বলে, প্রমাণ তোমার পরে করলেও হবে।

তাহলে বলছিস না কেন! এতক্ষণে তো বলে ফেলতে পারতি।

তুমি সত্যি করে বল—ভূত আছে?

নীলির প্রশ্ন শুনে ভাইয়া প্রথমটায় যেন কিছু বুঝতে পারে না। এক-এক করে আমাদের সবার মুখের দিকে তাকায়। যেন আমাদের মুখ দেখে আন্দাজ করতে চায়—ব্যাপারটা কী!

আমি বলি—ভাইয়া, তুমি বলে দাও তো ভূত বলে কিছু নেই।

বীথি তখনই চেঁচিয়ে ওঠে—কেন কেন, ভাইয়া তো, ভূত আছে—এ-কথাও বলতে পারে।

ভাইয়া এবার ঠোঁট উল্টোয়—তোরা মনে হচ্ছে দু-দল হয়ে গেছিস। একদল ভূতের পক্ষে, আরেক দল ভূতের বিপক্ষে, এই তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। নীলি খুব খুশি। এখন তুমি বল ভূত আছে কি নেই। আবার বলছি, ভেবেচিন্তে বলবে কিন্তু। যদি বল ভূত নেই তাহলে কিন্তু তোমাকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে ভূত সত্যিই নেই।

এভাবে কেন বলছিস! আমি ধমকে উঠি। এভাবে জিজ্ঞেস করার কথা ছিল না।

ভাইয়া হাত তুলে আমাকে থামায়। একটু হাসে। বলে—কে বলে ভূত নেই? ভূত অবশ্যই আছে।

শুনে নীলি, বীথি আর আশফাক হৈ হৈ করে ওঠে। আর আমাদের মুখ যায় শুকিয়ে। ভাইয়া এ কী বলছে! নীলি উল্লসিত হয়ে বলে—ভূত যে আছে, সেটাই তুমি এই হাঁদারামদের ভালো করে

BanglaBook.org

বুঝিয়ে দাও তো ভাইয়া।

আমি মিনমিনে গলায় বলি—এসব তুমি কী বলছ ভাইয়া। ভূত কোথায় আছে?

কোথায় নেই, তাই জিজ্ঞেস কর। বীথি এবার বলে।

হ্যাঁ। ভাইয়াও বলে। কোথায় নেই তাই বল্। ভূত আছে বইয়ের পাতায়, ভূত আছে মানুষের মনে, ভূত আছে মানুষের প্রয়োজনে—সে যে কতরকম থাকা ওদের। কথা শেষ করে ভাইয়া একটু মুচকি হাসে।

সে হাসির অর্থ আমি বুঝতে পারি। তাই আমার মুখেও একটু হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু নীলি আর বীথি কিছুই বোঝে না। ওরা বরং আমাদের দিকে ফিরে বলে—দেখেছিস দেখেছিস, বলিনি আমরা?

আমি হাসি লুকিয়ে বলি—হ্যাঁ, বলেছিস বটে। কিন্তু বুঝতে পারছিস না ...।

আমি কথা শেষ করার আগেই ভাইয়া বলে—কিন্তু তোদের আসল ব্যাপারটা কী?

সেটা এক দারুণ ব্যাপার ভাইয়া। নীলি খুব আগ্রহ নিয়ে বলতে আরম্ভ করে। হয়েছে কি, আব্বা তো ফুড প্রসেসিং-এর কারখানা করবে বলে জমি কিনেছে, তুমি জানই। যেখানে কারখানা আছে, সেখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা গ্রাম আছে জাহানপুরে নামে। ঐ গ্রামে আছে অনেক পুরনো দিনের এক জমিদারবাড়ি। ঐ বাড়িতে কেউ থাকে না ....।

কিন্তু ভূত থাকে, তাই না? ভাইয়া একটু হেসে জিজ্ঞেস করে।

এই তো তুমি বুঝতে পেরেছে। নীলির মুখ হাসিতে ভরে যায়।

আর জমিদারবাড়িতে যে ভূত আছে, সে-কথা তো ঐ গ্রামের লোকজনই বলেছে, তাই না?

নীলি আবার হাসে—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই।

ভাইয়া আমার আর বাবুনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। তারপর নীলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে—ওরা কী কী বলেছে, বল্ তো আমাকে।

এমন আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে নীলির উৎসাহ দ্যাখে কে! ও একদম হাউমাউ করে ঐ জমিদার-বাড়ি সম্পর্কে কী কী বলে জাহানপুর গ্রামের লোকজন, তা এক-এক করে ভাইয়াকে বলে।

ভাইয়া আবার একটু মুচকি হাসে—বেশ। কিন্তু এখন তোদের সমস্যাটা কী?

সমস্যা আর কি, এই বোকাদের বোঝাতে পারছি না। নীলি হতাশ গলায় বলে। এরা বলছে ভূত বলে নাকি কিছুই নেই। সুতরাং জাহানপুর জমিদারবাড়িতে ভূত থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

সে-কথা আমরা আবার বলছি। আমি বলি। আমরা কখনো বিশ্বাস করি না ভূত বলে কিছু আছে। ঐ জাহানপুর জমিদারবাড়ি কেন, কোথাও কোনো ভূত নেই।

সে-কথা বললে হবে না, সে-কথা বললে হবে না। নীলি তখনই মাথা ঝাঁকায়। তোদের প্রমাণ দিতে হবে যে ভূত নেই।

ভাইয়া হাত তোলে—তাহলে তোরা এখন দু-দল, তাই না? একদল বলছিস ভূত আছে, আরেক দল বলছিস ভূত নেই। এখন যারা বলছে ভূত নেই তাদের সেটা প্রমাণ করে দিতে হবে, এই তো?

হ্যাঁ। নীলি বলে। রনিরা প্রমাণ করে দিক ভূত নেই।

ভাইয়া আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, সেটা অবশ্য আর কেউ লক্ষ্য করে না। তবে আমি বুঝি ঐ হাসির কী অর্থ। ভাইয়া এবার গম্ভীর মুখে বলে—এক কাজ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। শোন্, তোরা যারা ভূত বিশ্বাস করিস না, তারা ঐ জমিদারবাড়ির ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আয় না। যদি তোদের কিছু না হয়, তাহলেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে ভূত আছে কি নেই।

কি নীলি, রাজি?

রাজি মানে! নীলি সোল্লাসে বলে। আমি একদম একশ ভাগ রাজি। ... তবে আমি জানি এই

BanglaBook.org

বীরপুরুষদের এখন আর সাহস হবে না।

আমি এই এখনই ঐ জমিদারবাড়ির ভেতরে ঢুকতে রাজি আছি। আমি বলি। আমার মনে হয় শামীম আর বাবুনও রাজি।

নীলি বোধহয় এতটা আশা করে নি। ও মুখ বাঁকিয়ে বলে—অ্যাঁ।

অ্যাঁ কিরে। চল্, এখনই যাই। বাবুন বলে।

বুঝতে পারছিস না, ভূত তোদের ঘাড় মটকাবে। বীথি বলে।

সে চিন্তা আমাদের। আমি বলি। আমরা তিনজন একসঙ্গে ঢুকব। অবশ্য তোরা চাইলে আমি একাই ঢুকতে রাজি।

নীলি হাসে—সময় হলে দেখব এই সাহস কোথায় যায়। ... শোন্, তিনজন কেন, ইচ্ছে করলে তোরা একশ জনও ঢুকতে পারিস। আমরা আপত্তি করব না। ঐ জমিদারবাড়ির যে-সব গল্প আমি শুনেছি, তাতে এক হাজার মানুষও কিছু না। গাধা কোথাকার, বুঝতে পারছিস না, ভূতের ভয় না থাকলে গ্রামের লোকজনই তো ঐ বাড়িতে গিয়ে থাকত।

আমি নীলির দিকে তাকিয়ে একটু হাসি—তুই অনেক লম্বা একটা কথা বলেছিস। এখন একটু দম নিয়ে নে।

হুঁ, তোর মতো কত বাহাদুর দেখলাম। নীলি মুখ ব্যাঁকায়।

আমি বলি—আমরা তাহলে সামনের শুক্রবার যাব ঐ জমিদারবাড়িতে। তবে শর্ত আছে একটা। আমাদের তিনজনের হাতে তিনটা লাঠি থাকবে।

লাঠি দিয়ে ভূত ঠেকাবি? নীলি আর বীথি কপালে তোলে চোখ।

ভূত সম্পর্কে তোদের যে-ধারণা, তাতে নিশ্চয় বুঝতে পারছিস লাঠি দিয়ে ভূত ঠেকানো যায় না। আমরা সঙ্গে লাঠি নেব, কারণ ঐ বাড়ির মধ্যে সাপটাপ থাকতে পারে। তোরা রাজি?

রাজি মানে। নীলি আর বীথি হাসে। এক বাক্যে রাজি।

ওরা রাজি হয় বটে কিন্তু মাঝখানের কয়েকটা দিন আমাদের কান ঝালাপালা করে দ্যায়। কত কী যে ওরা বলে। ভূত আমাদের ঘাড় মটকাবে, ভূত আমাদের রক্ত চুষে খাবে, ভূত আমাদের চোখ খুবলে নেবে। নিদেনপক্ষে ভূত আমাদের ওপর ভর করবে আর আমরা পাগল হয়ে যাব। এসব শুনে মেজাজ ঠিক থাকে? তবে বহু কষ্টে আমরা নিজেদের শান্ত রাখি। কারণ কয়েকটা দিনেরই তো ব্যাপার, তারপর ওদের সব চাপাবাজি চুপসে যাবে।

তবে ওরা একটা বড় ভুল করে। বাড়ির মুরুব্বিদের জানিয়ে দ্যায় আমরা ঐ জমিদারবাড়ির ভেতর ঢুকব। হয়তো ওরা সরাসরি কিছু বলে না, কিন্তু ওদের চ্যাঁচামেচি আর বাড়াবাড়ির কারণেই বাড়ির মুরুব্বিরা জেনে যায়। জেনে সব বাড়ির মুরুব্বিরা হা হা করে ওঠে। কী ব্যাপার? না, আমাদের ঐ বাড়ির ভেতরে ঢোকা হবে না। কেন? মুরুব্বিদের কেউ কেউ বলে, ঐ বাড়িতে ভূত থাকলেও থাকতে পারে। কারণ গ্রামের লোকজন নিশ্চয় এসব বানিয়ে বলছে না। তাছাড়া আরো কত আপদ-বিপদ ঘটতে পারে। সুতরাং কোনোমতেই আমাদের ঐ বাড়ির ভেতরে ঢোকা হবে না। নীলি ব্যাপার-স্যাপার দেখে খুব গম্ভীর হয়ে বলে—তোদের কপাল ভালোই মনে হচ্ছে। তা, তোরাই কি মুরুব্বিদের কানে কথাটা তুলেছিস?

শুনে আমাদের এত রাগ হয়। আমি খুব রেগে গিয়ে বলি—খবরদার, মিথ্যা কথা বলবি না। তোরাই ঐ কাজটা করেছিস। আমরা ঐ জমিদারবাড়িতে ঠিকই ঢুকব। কিন্তু মুরুব্বিদের কিছু জানানো চলবে না। সুতরাং তোরা একদম চুপচাপ থাক।

BanglaBook.org

তিন

ওরা এই ধমকের পর চুপচাপ থাকার চেষ্টা করে। আমরা পরের শুক্রবার রওনা দেই জাহানপুর। এটা অবশ্য ঠিক বলা হল না। কারণ আমরা যাচ্ছি চাচার সঙ্গে। চাচা যাবেন তার কারখানায়। সুতরাং আমাদের বলা উচিত, আমরাও ঐ কারখানায় যাচ্ছি। তারপর ওখান থেকে একসময় চলে যাব জাহানপুর। এ-কথা অবশ্য মুরব্বিদের কাউকে জানানো হয় নি। তবু মুরুব্বিরা রওনা দেওয়ার আগে বারবার বলে দেয়, আমরা যেন ভুলেও জাহানপুর গ্রাম বা জমিদারবাড়ির দিকে না যাই। আমরাও খুব সুবোধ ছেলের মতো মাথা নাড়ি, না না, কক্ষনো ওদিকে যাব না।

কারখানার কাছে পৌছে আমরা কতক্ষণ ওখানেই থাকি। ঘুরেফিরে দেখি কীভাবে তৈরি হচ্ছে কারখানাটা। তারপর চাচা যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তখন নীলিকে বলি—যা, তুই আর বাবুন মিলে মাইক্রোবাসটা ম্যানেজ করে নিয়ে আয়। জাহানপুর গ্রাম নাকি দু-মাইল দূরে। অত দূরে হেঁটে যেতে পারব না।

ওরা দুজন ঠিকই মাইক্রোবাস ম্যানেজ করে আনে। আমরা তখনই উঠে বসি। বাবুন চালাতে আরম্ভ করে দেয়। রাস্তা ভালো না। সুতরাং বাবুন খুব বেশি স্পিড তুলতে পারে না। তবু আমরা অল্পসময়ের মধ্যে পৌছে যাই। আসলে দু-মাইল হবে না।

এই একটু আগেও নীলি আর বীথি মিলে খুব টিটকারি মেরেছে আমাদের। কিন্তু আমরা যখন সত্যিই জাহানপুর গ্রামে পোঁছে যাই, মাইক্রোবাস একপাশে রেখে লোকজনের কাছ থেকে জেনে নিয়ে জমিদারবাড়ির দিকে এগোতে আরম্ভ করি, তখন ওদের মুখ একটু একটু করে শুকিয়ে যায়। নীলি একসময় বলেই বসে—কিরে, তোরা সত্যিই ঢুকবি নাকি?

ঢুকব না মানে। সেজন্যেই তো এসেছি।

হুঁ। নীলির গলা গম্ভীর। খামোকা ভূতের হাতে প্রাণটা দিতে চাস?

তাহলে তো ভালোই হবে। তোকে জ্বালানোর কেউ থাকবে না।

বাজে কথা বলিস না। নীলি হঠাৎ করেই রেগে যায়। তোদের ভেতরে ঢুকতে হবে না।

বেশ, তাহলে স্বীকার কর ভূত নেই।

কিন্তু 'ভূত নেই' এটা স্বীকার করতে ওদের ইচ্ছে নেই। নীলি বলে—ভূত আছে বলেই তোদের ঐ বাড়িতে ঢুকতে বারণ করা হচ্ছে।

ঠিক আছে, আমরাও তাহলে ও-বাড়ির ভেতরে ঢুকে প্রমাণ করে দেই ভূত নেই। আমরা সত্যিই ভেতরে ঢোকার প্রস্তুতি নিলে নীলি কাঁদো-কাঁদো হয়ে যায়—দ্যাখ, ভূত আছে, এটা আমরা বিশ্বাস করি। ভূত নেই, এটা তোরা বিশ্বাস করিস। ঠিক আছে, এভাবেই থাক ব্যাপারটা, তোদের ভেতরে ঢোকার দরকার নেই।

আমরা মাথা নাড়ি—উহুঁ, সেটা হচ্ছে না। তোকে কি আমরা চিনি না। আমরা যদি ভেতরে না ঢুকে ফিরে যাই তবে একটু পরই তুই খ্যাপাতে আরম্ভ করে দিবি। আর তাছাড়া, তোরা খামোকা একটা কুসংস্কার নিয়ে আছিস। সেটাও আমরা ভেঙে দেব।

ইশ। নীলি একটু রেগে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ওর মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়েই থাকে।

আমি, বাবুন আর শামীম। আমাদের তিনজনের হাতে তিনটা শক্ত লাঠি। আমার কাঁধে একটা ক্যামেরা। জমিদারবাড়ির ভেতরের ছবি তুলব। এখান থেকেই জমিদারবাড়িটা দেখতে পাচ্ছি। খুব যে বেশিদিনের পুরনো তা নয়। তবে পরিত্যক্ত বৈকি। আমরা নীলি, বীথি আর আশফাকের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে জমিদারবাড়ির দিকে এগোতে নিলে গ্রামের লোকজন বাধা দ্যায়।

এর মধ্যে আমাদের ঘিরে গ্রামের উৎসাহী মানুষের ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। তারা প্রথমে বুঝতে পারছিল না আমরা কী করব। কিন্তু আমরা জমিদারবাড়ির দিকে এগোতে নিলে ওরা

BanglaBook.org

একদম হা হা করে ওঠে। কী ব্যাপার? না, আমাদের ঐ জমিদারবাড়িতে কখনো ঢোকা হবে না।

আমরা যতই ওদের বোঝাই ততই দেখি ওরা নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ে। আর ভিড়ও একটু একটু করে বেড়ে যায়। গ্রামের লোকজন বলে—শোনেন ভাই, ঐ কাজ আপনাদের করতে হবে না। বুঝলাম আপনাদের সঙ্গে মন্ত্র আছে। তাই অত সাহস দ্যাখাচ্ছেন। কিন্তু পরে ভূত যদি খেপে গিয়ে আমাদের ওপর হামলা করে তবে কী হবে?

তখন আমরা ওদের বোঝানোর চেষ্টা করি আসলে ভূত বলেই কিছু নেই। সবার চোখের সামনেই আমরা ঐ বাড়িতে ঢুকব আর নিরাপদে বেরিয়ে আসব। তখন সবাই বুঝতে পারবে ওসব ভূত-টুত সব মিথ্যা।

এ-কথা শুনে গ্রামের লোকজন দেখি আমাদের ওপর আরো খেপে যায়। শহর থেকে দু-পাতা লেখাপড়া শিখে আমরা নাকি বড় বড় কথা বলতে শিখেছি। কে বলেছে ভূত নেই! তারা এত বছর ধরে চোখের সামনেই কত কী দেখতে পাচ্ছে, ভূতের কতরকম কেরামতি, আর আমরা ভূত নেই বললেই হবে?

আমরা তবু ওদের বোঝানোর চেষ্টা করি। ওরা দেখি ততই খেপে যায়। ওরা বলে—মন্ত্র নিয়ে এসেছি বলে আমাদের হয়তো কিছু হবে না, কিন্তু পরে ভূত খেপে গিয়ে ঠিকই গ্রামের ক্ষতি করবে।

শেষে অবস্থা এমন হয় যে, আমরা যদি আর একটা কথাও বলি তবে গ্রামের লোকজন আমাদের মেরে বসবে। খুব খেপে যায় ওরা। আমাদের তাই বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হবে।

ফেরার পথে নীলিরা কিছু বলে না। বরং আমরা সবাই একটু গম্ভীর হয়ে থাকি। তবে ঢাকা ফেরার পর নীলি আবার যেইকে সেই। আমি যতই বলি 'তুইই তো কাঁদো-কাঁদো হয়ে গিয়েছিলি, গ্রামের লোকজনই তো ঢুকতে দিল না' ততই ও ঠোঁট উল্টোয়। বলে—ওসব কিছু না, তোদের আসলে সাহস হয় নি, সেটাই বল্। শেষে নীলি আর বীথির সঙ্গে আমাদের একটা ঝগড়ার মতো হয়ে যায়। আমরা ওদের জানিয়ে দেই—ঠিক আছে, সামনের শুক্রবার আমরা নাহয় আবার যাব। গ্রামের লোকজন যতই আপত্তি করুক, আমরা ভেতরে ঢুকবই। ঐ জমিদারবাড়ির তো নয়, আসলে তোদের মাথার ভূত তাড়াতে হবে আমাদের।

ওরা মুখ বাঁকিয়ে, পিত্তি-জ্বালানো হাসি হেসে বলে—ঠিক আছে, তোদের আরেকটা সুযোগ দেয়া গেল।

কিন্তু ঐ জমিদারবাড়ির ভেতরে ঢোকার সুযোগ আমরা আর পেলাম না। তার আগেই সারা দেশে আরম্ভ হয়ে গেল বন্যা। সে যে কী বন্যা! সারা দেশ যেন কয়েকদিনের মধ্যেই তলিয়ে গেল। আমরা তো আমরা, মুরুব্বিরা পর্যন্ত বললেন, তারাও নাকি কখনো এমন বন্যা দ্যাখেন নি। মানুষজনের সে যে কী কষ্ট তখন। গ্রামের দিকে প্রায় সব লোকেরই বাড়িঘর ডুবে গেছে, তাদের খাবার কিছু নেই। গ্রামের এই খবরগুলো যখন পত্রিকার পাতায় পড়তাম তখন আমাদের কান্না পেয়ে যেত।

তবে এই মহাদুর্যোগের পাশাপাশি একটা ভালো দিকও দেখলাম আমরা। যাদের বন্যায় ক্ষতি হয়েছে, তাদের সাহায্য করার জন্যে সাধ্যমতো সবাই এগিয়ে এসেছে। যে যেভাবে পারছে সাহায্য করছে। আমরা তো ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ দেখি নি। বড়দের মুখে এই বন্যার সময় শুনলাম ৭১ সালের পর এই প্রথম নাকি মানুষ একে অন্যের বিপদে সাহায্য করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমরাও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলাম না। আমরা সব বন্ধুরা মিলে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রুটি বানাতে আরম্ভ করে দিলাম। তারপর বিকেলবেলা নৌকায় করে গিয়ে সেই রুটি আর গুড় বিলি করে আসতাম। কয়েকদিন এভাবে চালানোর পর হঠাৎ বাবুন একদিন বলল—আমাদের বোধহয় জাহানপুর একদিন যাওয়া উচিত। ওখানকার লোকজনের সঙ্গে একটু চেনা-জানা

BanglaBook.org

হয়েছিল। বাবার মুখে শুনলাম পুরো এলাকা নাকি ডুবে গেছে। চল্, ওদের কাছে একদিন রুটি, গুড়, চিঁড়া নিয়ে যাই। বাবুনের কথায় আমরা সবাই তখনই রাজি হয়ে গেলাম। সত্যিই তো, আমাদের আরো আগেই যাওয়া উচিত ছিল।

শেষে ঠিক হয়, ঐ বিকেলেই আমরা যাব। এই ফাঁকে একটা কথা বলে নেই। বন্যা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে নীলি আর বীথিও খুব পরিশ্রম করছে। কিন্তু নীলি এর পাশাপাশি আমাকে খোঁচাতেও ভুলছে না। ওর বক্তব্য, এই বন্যার জন্যেই আমাদের নাকি ঐ জমিদারবাড়িতে ঢুকতে হল না, আমরা নাকি প্রাণে বেঁচে গেলাম। এই যেমন একটু আগে এসে টিটকারি মেরে গেল, 'খুব বাঁচা বেঁচে গেলি' বলে।

সে যাক। বিকেলের আগেই সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে আমরা জাহানপুরের দিকে রওনা দিলাম। অনেক বড় নৌকা জোগাড় করে দিয়েছেন চাচা। আমাদের সঙ্গে ভাইয়া ছাড়াও আরো কয়েকজন মুরুব্বি আছেন।

বাবুনদের কারখানায় পৌঁছে দেখি ওটার প্রায় অর্ধেকটা ডুবে গেছে। তারপর আরো একটু এগোলে জাহানপুর গ্রাম। এদিকটা বেশ উঁচু। তবু প্রায় প্রতিটি বাড়িই কোমর সমান পানির নিচে। অনেকে বাধ্য হয়ে ঘরের চালে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু বাকি মানুষ কই? আমাদের নৌকা আরেকটু এগোতেই চোখ চলে যায় জমিদারবাড়ির দিকে। দেখি গ্রামের অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে ঐ ভূতুড়ে(!) জমিদারবাড়িতে। নৌকায় আমাদের দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডাকছে। বুঝতে পেরেছে আমরা রিলিফ নিয়ে এসেছি।

নীলির দিকে তাকিয়ে দেখি ওর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। আমি খুব নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করি—আমাদের ঘাড় মটকে দেবে, তোর সেই অসীম ক্ষমতাশালী ভূতগুলো গেল কোথায় রে নীলি? বন্যার পানিতে ভেসে গেছে বুঝি?

নীলি কটমট করে আমাদের দিকে তাকায় বটে কিন্তু বলার মতো কিছু খুঁজে পায় না।

নৌকা আস্তে আস্তে জমিদারবাড়ির গায়ে গিয়ে ভেড়ে। ভাইয়া একটু হেসে নীলির দিকে তাকায়—নীলি, এটাই বুঝি তোর সেই জমিদারবাড়ি? তা, ভূতগুলো কই?

নীলি ভাইয়ার দিকে কটমট করে তাকাতে পারে না। মুখ নিচু করে চুপ করে থাকে।

ভাইয়া একটু হেসে বলে—এখন বুঝতেই পারছিস ভূত আছে কি নেই। হাতেনাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। শোন্, আমি সেদিনই বলেছিলাম ভূত থাকে বইয়ের পাতায়, ভূত থাকে মানুষের মনে ...। একটা কথা সবসময় মনে রাখিস নীলি, ভূত মানুষেরই তৈরি। তাই তার থাকা না-থাকাও মানুষের প্রয়োজনের ওপরই নির্ভর করে। কেউ বা কারা হয়তো নিজের প্রয়োজনেই রটিয়েছিল এ-বাড়িতে ভূত আছে। কিংবা কুসংস্কারের কারণে মানুষজন বোধহয় ও-রকম ভাবত। কিন্তু মানুষের যখন আশ্রয় দরকার হল, তখন ওসব ভূত-ফূত আর থাকল না, দেখতেই পাচ্ছিস ...।

নীলি মাথা নিচু করেই থাকে।

তারপর আমরা যখন ফিরে আসছি, নীলি হঠাৎ আমার পাশে এসে ফিসফিস করে বলে—শোন, না থাকুক ভূত, কিন্তু ভালোই হয়েছে তুই ভেতরে ঢুকিস নি। না থাকুক ভূত, কিন্তু তুই-ই তো বলেছিলি, সাপ-টাপ তো থাকতে পারত।

- সমাপ্ত -